গল্প-সমগ্র

(দ্বিতীয় খণ্ড)

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

করুণা প্রকাশনী কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ পৌষ ১৩৬৬

প্রকাশক

বামাচরণ মুখোপাধ্যায়

করুণা প্রকাশনী

১৮এ টেমার লেন

কলকাতা-৯

মুদ্রাকর

এইচ. পি. রায় এ্যাণ্ড কোং

১২নং যতীন্দ্র মোহন এভিনিউ

কলকাতা-৬

প্রচ্ছদশিল্পী

গৌতম রায়

শ্রীসরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু

সূচীপত্র

গাজনতলা

চৈত্র-সংক্রান্তির দিন অবেলায় বাবা ন্যাংটেশ্বরের মন্দিরতলায় গাজনের ধুম লেগেছে। মন্দিরের উঁচু বারান্দায় একটার পর একটা কাটা পাঁঠার ধড় আর মুণ্ডু এসে পড়ছে। মন্দিরের ঘুপচি কোটরে বসে দেবতা যা নেবার নিচ্ছেন, মানে স্রেফ ওই মুণ্ডুটা, এবং ধড়টা ছুড়ে ফেলে ঠাকুমশাইয়ের মুখ দিয়ে বলছেন—যা, নিয়ে যা। এরপর ঠাকুমশাই আর তাঁর বাড়ির লোকগুলোর মুখ দিয়েই তিনি কচমচিয়ে মড়মড়িয়ে মুণ্ডুগুলো খাবেন। ঝোলেঝালে হাপুস হুপুস কাণ্ড। নাকে ও চোখে জল বেরিয়ে যাবে।

আগে পাঁঠা পড়ত বিশ তিরিশটে। আজকাল ছ-সাতটাও পড়ে তো বিরাট ধুম! ঠাকুমশাইয়ের কত্তাবাবার আমলে নাকি শয়ে-শয়ে পড়ত। রক্তে ভেসে যেত গাজনতলা। গাসুদ্ধু ছড়িয়ে ছিটিয়েও বাসি থেকে যেত। আজকাল ভক্তি কমেছে নয়, পাঁঠার দাম বড্ড চড়া। ওসমান পাইকার সপ্তায় একদঙ্গল করে সোজা চালান দিচ্ছে টাউনে। টাউনে প্রচুর পয়সা। ঠাকুমশাইয়ের ট্যারা মেয়েটা কঞ্চি হাতে বারান্দায় পা ঝুলিয়ে বসে আছে। বলল—ও বাবা, চারটে মোটে! আর পড়বে না? সে মুণ্ডু গুনছে আর গুনছে। গুনে-গুনে আনমনা। আর মুণ্ডুগুলো নীল চোখে আকাশ দেখছে। ঘুপচি মন্দিরের চৌকাঠের কাছে বসে ঠাকুমশাই ওসমান পাইকার আর টাউনের নিন্দামন্দ করছেন। শুনছে ভকা বাউরি। তাড়ির নেশায় ঝিমধরা ভাবটা একটু করে কেটে যাচ্ছে। সন্ধেবেলা মুণ্ডুগুলো ধামায় ভরে তাকেই পৌঁছে দিতে হবে। মজুরি একমুণ্ডু। ভকা সেই আশায় বলছে—সবই আজ্ঞে টাউনে খাচ্ছে। বাবা আর খাবেন কী বলুন?

কাল ছিল হোম। স্রেফ নিরিমিষ আহার। বাবুপাড়া কুড়িয়ে বাড়িয়ে ঘটি-টাক সরপচানো ঘি জুটেছিল। যজ্ঞে পুড়ে সবটাই নাকি বাবার পেটে চলে গেছে। এক কলসী সিদ্ধির শরবতও ছিল। আতপচাল ফলমূলও ছিল অল্প-স্বল্প। বাবুবাড়ির মা-লক্ষ্মীরা এসে বাবাকে প্রণাম করে গেছেন। কিন্তু আজ বাবা পুজো খাবেন কুচুনীপাড়ার। মানে ছোটলোক-টোটলোকদের। তারা বাগ্দী-কুড়ুর কুনাই বাউরি ডোম মানুষ। মাঠেঘাটে জলাজঙ্গলে জন্তুর মতো চরে ফিরে খায়, আর জন্তুর মতোই রক্তমাংস চেনে। হোমের ছাই রক্তে ভাসিয়ে কাদা করে

ফেলল। আজ তাদের দিন! তালের তাড়ি আর পচুই গিলে টলতে-ঢুলতে দলে দলে গাজনতলায় এসে জুটেছে। নাচছে কুঁদছে। ঢাক বাজাচ্ছে তোলমাতোল। তাদের লোকেরাই বরাবর বাবার নিজের লোক। তিনদিনের উপোসে চোখের তলায় গর্ত, মুখের রঙ কালিঝুলি। পরনে লাল কাপড়, মাথায় লাল ফেট্টি, হাতে বেত। তারা এখন ভক্ত সন্নেসী। জ্বলজ্বল করছে দৃষ্টি। চত্বরের হাড়িকাঠ কেন্দ্র করে গোল হয়ে বসে আছে। হাতের বেত শূন্যে তুলে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে হাঁক দিচ্ছে: 'শিবো নামে পুইণ্য করে বোল শিবো বো-ও-ল!' এবং বেতগুলো একসঙ্গে আছড়ে পড়ছে সামনের মাটিতে: 'বো-ও-ও-ল!' সঙ্গে সঙ্গে ঢাকের বাদ্যি বাজছে দ্বিগুণ চৌগুণ। ন্যাংটেশ্বরো দিগম্বরো···ন্যাংটেশ্বরো দিগম্বরো! তার সঙ্গে কাঁসি বাজছে ন্যাং ন্যাং ন্যাংটেশ্বর! খগা জগা দুভাই বায়েনের ঢাকদুটি রঙবেরঙের পালকে সাজানো। ছিটের কাপড়ে প্রযত্নে মুড়েছে কাঠের খোল। সরু কাঠির মতো পাগুলো এগোচ্ছে পিছোচ্ছে। তার মধ্যে হঠাৎ এসে জুটে গেল হেরম্ব চৌকিদার। গায়ে নীল উর্দি, মাথায় নীল পাগুড়ি, কোমরে চওড়া বেলটিতে আঁটা প্রকাণ্ড পেতলের তকমা। তার হাতে লাঠি আছে। এবং এই তার রাজবেশ! কারণ সে এক রাজপ্রতিনিধি, রাজার লোক। তার বউ আমোদিনী বিলে গিয়ে ইজারাদারের গাল শুনে বলেছিল—জানো আমার মরদ আজার নোক? সেই রাজার লোকটির চোখ এখন ভাঙের নেশায় ঢুলুঢুলু। কোমর দুলিয়ে নাচতে নাচতে বোল শেখাচ্ছে খগাকে: বাজাদিকিনি! ডিগম্বরো···ডিগ ডিগ ডিগম্বরো! ল্যাং ল্যাং ল্যাটেশ্বরো! খগা বায়েন এক ঠ্যাং পেছনে তুলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সামনে। ডিগম্বরো বাজিয়ে হেরম্বকে যেন তাড়া করে। হেরম্ব বলে—এ্যাই বাপ, এ শালা যে টিমের উলগাড়ি! ষ্টিমরোলার। ওদিকে বুড়ো নিমতলায় তার বউ আমোদিনী বসেছে পা ছড়িয়ে। তাড়ি গিলে হি-হি করে হাসছে। একরাশ চুল এলিয়ে দিনকে দিচ্ছে অন্ধকার করে। দুলছে। চোখে ঝিলিক তুলছে। থলথলে স্তন পড়েছে বেরিয়ে। পড়ুক না! এই এসে পড়ল তার শরীলে বাবারই এক ভূতিনী। কেশ দুলিয়ে ভরের খেলা জুড়ে দেবে গাজনতলায়। আর তার মেয়ের নাম সৈরভী। বাপের বাড়ি এসেছে গাজনের ধুম দেখতে। দুবাটি তালরস খেয়ে তার হৃদয় এখন আর্দ্র। মুখে লাস্য, চোখে রঙ। দূর থেকে মাকে দেখে বাঁকা ঠোঁটে বলে—ঢঙ মাগীর। তারপর এসে ঢোকে ভক্তসন্নেসী আর বলির আসরে। বাবার নাচ দেখে বলে—ও বাবা! তোমার পাগুড়ি কই? পাগুড়ি পায়ের

তলায় রক্ত আর হোমের ছাইয়ে মাখা-মাখি। উদাসীন চৌকিদার একবার শুধু হেঁটমুণ্ড হয়। পাঁঠার গলা তখন হাড়িকাঠে। রাখু কামার রাঙা চোখে তাকিয়ে দেখে। তার মধ্যে এখন বাবার এক পিশেচ এসে ঢুকে আছে। সেই পিশেচ তার মুখ দিয়ে বিড়ির সুখটান টেনে নিচ্ছে। এবং ঠোঁটে হাসে। স্ফীত নাসারন্ধ্র। কুঞ্চিত ভুরু। কেন বলে 'মরণ', কেউ জানে না। নিজেও না।

ওপাশে বাঁজা রুক্ষু চটানে বসেছে ছোট্ট একটা মেলা। দুপুর থেকে সন্ধ্যা কিছুক্ষণের বিকিকিনির আসর। এগাঁ-ওগাঁ থেকে এসে জুটেছে আদেখলা মেয়ে-মরদ কাচ্চাবাচ্চার দঙ্গল। এসেছে প্রেমিক-প্রেমিকা, মাতাল এবং ভাঁড়েরা। শেষ বেলার রোদ্দুরে বুড়ো গাজনতলা আপনমনে হাসছে। পাঁপর ভাজার গন্ধে ম ম করছে চারদিক। বেলুনবাঁশি বাজছে। তালপাতার চিল চ্যাচাচ্ছে ফেরিওলার মাথার ওপর। মোটা বাঁশে সারবন্দী বসিয়ে রেখেছে চিলগুলোকে। আরও কতরকম শব্দ! কতরকম রঙ। বাবা ন্যাংটেশ্বরের কুচুনীপাড়ায় আজ দিনশেষে গাজনের ধুম। পাড়াগাঁর হৃৎপিণ্ডে রক্ত উঠছে ছলকে।

এ ধুম পাগলা ভোলানাথের। ভূত-ভূতিনী প্রেত-প্রেতিনী ডাক-ডাকিনী তাঁর চেলা। কে কার শরীলে ঢুকে গাজনতলায় এসে জুটে গেছে চেনা কঠিন। সোনাই খেপার মতো নিরিবিলি ছেলেটাও সাধুর মতো হাঁটু দুমড়ে আসন করে গাঁজা টানছে সবার সামনে, গাল ফুলিয়ে ববম্ বম্ গালবাদ্যও বাজায়। তার বাবা যুধিষ্ঠিরের ধানভানা ময়দাপেষা কল আছে। কয়লার আড়ত আছে। একটা লরি আছে। আজ সোনাই স্বরূপ দেখাচ্ছে। যুধিষ্ঠিরের ঘরের শিবরাত্রির সলতে। তার হাতে নির্ভীক ছিলিম। শেষ চৈত্রের অবেলায় রহস্যময় নীল ধোঁয়া দিয়ে সোনাই ঈশ্বরের ধূসর দাসখতে সই করে ফেলল। 'আর তাকে পাবে না যুধিষ্ঠির।' উদ্বিগ্ন কোনও গাঁওবুড়ো এ কথা বলেই মিশে গেল ভিড়ে।

আরেক ভিড় আসছে হই-হই করে। তোরাপ গুণিনের সাঙ্গপাঙ্গরা। লাঠির ডগায় মড়ার মাথা। দিনের আলো আবছা হলেই সেই মাথা নাচবে। খিটখিট করে হাসবে। তোরাপ সারা চোতমাস রাতের পর রাত তন্তরমন্তর দিয়ে জাগিয়েছে মুণ্ডুটাকে। কাল থেকে আবার ঘুমিয়ে পড়বে গুণিনের থানে। ঘরের মধ্যে সেই থান। মাটির বেদী লাল কাপড়ে ঢাকা। তার ওপর পেঁচার ঠোঁট, বাদুড়ের নখ, ভাল্লুকের রোঁয়া, একটা কালো চামর। রুদ্রাক্ষ, পাথরের মালা—হেঁদু-মোছলমানের তীর্থস্থান ঘুরে সারাজীবন ধরে সংগ্রহ করে এনেছে তোরাপ। এখন তোরাপের জটাচুলের ভিরকুটি দেখে ভয় করে। কপালে

দগদগে সিঁদুর তেড়ে মারতে আসে। হাড় জিরজিরে বুকে ঝোলে রুদ্রাক্ষ, পাথরের মালাটা। বাহুতে অষ্টধাতুর বালা। বগলে ফকিরের চিমটে। দলবল নিয়ে এসে বসে পড়ল বুড়ো নিমের তলায়। লাঠির ডগায় মুণ্ডুটার এখনও ঘুমঘুম ভাব। ম্রিয়মাণ দাঁতগুলো। রোদ্দুর চলে যাক। ঝুঝকি অন্ধকার আসুক না! ওই বিস্ফারিত দাঁতে জলজল করে উঠবে গভীরতর উৎসের কী এক আলো। সেই উৎস জীবনমৃত্যুময়।···

তোরাপের মড়ানাচানোর ক্ষণ গুনছে এবার গাজনতলা। এই অবেলাটা ঘাসফড়িঙের মতো ছটফট করছে আকাশের ঠোঁটে। দণ্ডপল আস্তেসুস্থে হাঁটছে কি? বাঁজা ডাঙার ওপারে দেবতা পাটে বসতে বড় দেরি করছেন। ন্যাড়া শিমুলের সিল্যুট মূর্তি সাঁতু ডোমের মতো শ্মশানবৈরাগ্যে বিষাদগ্রস্ত। ওখানে বিশাল স্তব্ধতা। এখানে তুমুল কোলাহল। ডিগ ডিগ ডিগম্বরো···কাপড় পরো। ডিগম্বরো বসন পরো। থগাজগার ঢাক বাঘের গলায় ডাকে। ভক্ত সন্নেসীরা চেঁচিয়ে ওঠে—শিবো নামে পুইণ্য করে বোল্ শিবো বো-ও-ও-ও-ল্! গাজনতলার আকাশের পথে উত্তরের দেশে ফেরার সময় চমক খেয়ে বালিহাঁসের ঝাঁক দিক বদলায়। আমোদিনীর গলায় কোন ভূতিনী এসে স্বর ধরে কাঁদে। এলোকেশের প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকার নড়েচড়ে। ছাইরক্তকাদায় মাখামাখি নীল পাগুড়ি উদ্ধার করে হেরম্ব চৌকিদার যায় সোনাই খেপার কাছে ছিলিম টানতে। মন্দিরের বারান্দায় ঠাকুমশাইয়ের ট্যারা মেয়েটা পাঁঠার মুণ্ডু গুণে শেষ করতেই পারে না। আর সৈরভী এখন চলেছে অভিসারে। কলকেফুলের জঙ্গলে বসে আছে তার প্রেমিক হারাধন সদ্গোপ। ঠোঙায় রসগোল্লা ভরা। রস পড়ছে চুঁইয়ে। শুকনো ঘাস আর হলদে কলকেপাতায় দিনশেষে এখন পিঁপড়েদের মচ্ছব।······

গাঁয়ের শেষে এই গাজনতলার চটান। সারাবছর নিঃঝুম পড়ে থাকে এক একর রুক্ষ কাঁকুরে ন্যাড়া মাটি। তার কপালে আবের মতো ভাঙাচোরা ঘুপচি ওই মন্দির। তার ওপাশে হাজামজা দীঘি। দীঘির পাড়ে তালগাছ, কেয়া ফণিমনসা কোঙাঝোপ কাঁটামাদারের ক্ষয়াখর্বুটে জঙ্গল। মধ্যিখানে গাঁয়ের আঁতুড়ের নোংরা ফেলার 'ধুলগাড়ি'। হাঁড়িকুড়ি খোলামকুচি ন্যাকড়াকানি কুলকাঠপোড়া ছাই ভূতপেরেতের হরেকরকম খাদ্য। মাঝরাতে এসে খেয়ে

যায়। অজাতক কাচ্চাবাচ্চারা ওঁয়া ওঁয়া করে কাঁদে। ঠিক শেষ রাতে বিলের দিক থেকে আসে একটা হাওয়া—'বাওর' যার নাম, সেই হাওয়া কস্কেফুল পেড়ে চুলে গুঁজে তালগাছে ওঠে। শুকনো বাগড়া ধরে টানাটানি করে। তারপর যায় উত্তরপাড়ে একানড়ে চিনাথ বাউরির বাড়ি। মস্করা করতেই যায়। খড়ের চাল মচমচিয়ে উঠলেই চিনাথ ঘুম ভেঙে বলে—যা, যা! চঙ করিসনে। তখন 'বাওর'টা চলে যায়। মানিক ঘোষের বাঁশবনে ঢোকে। শুকনো পাতা ওড়ায় মুঠোমুঠো। তারপর ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে বসে। পুবের আকাশে তখন 'ঝুঝকো তারা'। পশ্চিমে দৌড়ে যায়। কান্না থামিয়ে মাই দেয়। তখন চিনাথ জেগে আছে।

এই চিনাথের কত্তাবাবা মড়িরাম বাউরির ডাকে দীঘির তলা থেকে ভেসে উঠতেন চড়ককাঠ। চোত-সংক্রান্তির দিন সুমসাম নিঝুম ভোরে ভক্তসন্ন্যেসীর দল নিয়ে মড়িরাম দাঁড়াত ঘাটে। চড়ককাঠ ভেসে তরতর করে চলে আসতেন কাছে। সেই 'বিরিঞ্চি'কে তুলে নিয়ে গিয়ে গাজনতলায় বাবার মন্দিরের সামনে পুঁতে দিত ওরা। পুজো-আচ্চা হত। এখনকার চেয়ে হাজারগুণ ধুম লাগত। সন্ধ্যার পর একপ্রহর রাতে সেই কাঠ তুলে আবার দীঘিতে ভাসিয়ে দিত ওরা। তরতর করে ভেসে তলিয়ে যেতেন মধ্যিখানে। আর 'বিরিঞ্চি' আসেন না। আর চড়কপুজোও হয় না। আজকাল লোকে বলে গাজন 'বাণফোঁড়', 'ঘুরনচড়কি', কিংবা 'পিঠে তক্তার, তাকলাগানো মানুষে কাণ্ডও দেখা যায় না এই গাজনতলায়। এখন সার করেছে শুধু বাবা ন্যাংটেশ্বরকে।

তবে একটা ব্যাপার আছে টিকে। চিনাথের কাকা ফেলু বাউরি গাজনতলা হাসিতে হুলস্থুলুস করে ফেলত। চিনাথ কত্তাবাবা বাবার সেই গুহ্য ব্যাপারটা পায়নি বটে, কাকারটা পেয়েছে। গাজনের বিকেলে চিনাথ সঙ সাজতে বসে। রঙচঙ মাখে। শণের গোছা হাঁড়ির কালিতে ঘষে দাড়ি বানায়। কতরকম সাজে সে। ছেলেঠ্যাঙানো মাস্টের, পুলিসের দারোগা, পুজুরী বামুন, ব্যাংকের নেসপেটর, এমনকি এসডু সায়েবও সাজতে ছাড়ে না। গত গাজনে সেজেছিল ভোটকুড়ুনি বাবু। জোরালো 'বক্তিমে' দিয়ে ভিড় বাড়িয়েছিল চিনাথ। সঙাল সাজলে 'তলপেটে' বা চেলা লাগে। চেলারা মিছিলের মোক সেজেছিল! যা দাবি করে, ভোটের বাবু বলে—দোব। লোক হেসে খুন।

এবার চিনাথ গাজনে কী সঙ দেবে, তাই নিয়ে সারামাস চিন্তাভাবনা করেছে। তার ভুঁইক্ষেত নেই। ফসলের মরশুমের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মাঠে

পাহারাদারি কাজটা নেয়। তখন সে 'আগল'। দিনরাত মাঠে টো টো ঘুরতে হয়। ঘোরাঘুরির সময় তার ভাবুক ভাবটা জমে ভাল। এতোলবেতোল সব ভাবনা তার। বাঁজা বউ ছিল ঘরে। বিয়োতে পারেনি বলে নাথি মেরেছিল মনের দুঃখে। বউটার মনে বড্ড বেজেছিল। হেরম্বের ভাগ্নে থাকে টাউনে। তার সঙ্গে চলে গেল। চিনাথ ভাবে রাগ পড়লেই ফিরে আসবে। আসে না। মাস যায় বছর যায়। চিনাথের কেশ পাকে দাঁত নড়ে। নাড়ু ডাক্তার চিমটেয় টেনে তুলে দেন। রক্তারক্তি হয়। আর চিনাথ ভাবে মেয়েমানুষ তো! বুদ্ধিসুদ্ধি কম। রাগ পড়লেই আসবে। আসে না। চিনাথ স্যাঙা করতে গিয়ে আবার ভাবে, যদি হঠাৎ এসেই পড়ে—সতীনে চুলোচুলি থামাবে কে? আমি নিরীও নোক। যাক্ গে বাবা! এবং এই করে মাস, বছর, গাজনতলায় ধুমের পর ধুম, কতগুলো কেটে গেল। পটেশ্বরী বাউরান আর ফিরল না। এখন চিনাথ ভাবে, আসুক না। সেবার মেরেছিলাম এক নাথি। এবার মারব জোড়ানাথি।

এবং রাগের চোটে শেষঅব্দি চিনাথ করেছে কী, পটেশ্বরী আর হেরম্বের টাউনবাজ ভাগ্নে ষষ্ঠির নামে সঙের গান বেঁধেছে। এমন কী, একখানা সঙও বানিয়েছে। তার মানে জোড়া লাথি। চেলা গোবরা কুনাই বয়সে নবীন যুবোপুরুষ। চেহারাও দেখনশোভা। তাকেই সাজাবে পটেশ্বরী। নিজে সাজবে ষষ্ঠীচরণ। বাবুপাড়া থেকে পাতলুন জামা চেয়ে এনেছে। সইদ মনোহারিওলার কাছে দশ পয়সায় একটা হাতঘড়িও কিনে এনেছে।

গত রাতে হঠাৎ গোবরা বলেছিল—ও মামা! এ কি ভাল হচ্ছে?

—ক্যানে? ভালমন্দর কথা ক্যানে?

—নিজের ঘরের খিটকেল নিজেই গাইবে?

—গাইব।

—লোকে বলবে কী মামা?

—লোকে হাসবে! বুঝলি বাপ গোবর্ধন?……চিনাথ ঢোলে চাঁটি দিয়ে বলেছিল—নে, লাগাদিকিনি এবারে। গলা ছেড়ে ধর বাপ! 'বঁধু লাও বা না লাও মুখ দেখে যাও/পটেশ্বরীর আয়না।'…

কাল নিশুতি রাতে নির্জন দীঘির পাড়ে চিনাথের উঠোনে পটেশ্বরী ও ষষ্ঠীচরণের কেলেঙ্কারির 'ইহারছাল' হয়ে গেছে। তার মানে রিহার্সাল। গোবর্ধন সাজছে। চিনাথ সাজছে। বেলার রঙ আর একটু ফিকে হোক। ওদিকে পাঁঠাবলি শেষ হয়ে যাক। তখন সঙ আর ছড়ার ধুম পড়বে। তোরাপের

মড়ার নাচও শুরু হবে। এগুলো হচ্ছে গাজনতলার শেষ মজা। লোকে সময় গুণছে মনে মনে। এখানে চিনাথের উঠোনে বাঁশের মাচায় ঢোলের ওপর কাঁটামাদারের ছায়া। লম্বা ছায়াটা মাঠফেরা মুনিষের মতো ক্লান্ত হয়ে দীঘির জলে গিয়ে নেমেছে। মাটির কুম্ভে তাড়ির ফেনা পড়েছে উপচে। পাতলুন ও শার্ট ঢ্যাঙা চিনাথের শরীরে বেঢপ আঁটো হয়ে গেছে। সরু গোঁফটা যাচ্ছে খসে, আবার এঁটে নিচ্ছে পাকুড়ের আঠায়। এনামেলের খুরিতে তাড়ি ঢেলে 'পটেশ্বরী' বলে—ও মিনসে, খাও গো! চিনাথ হাসে।—চুপ্ বে! এখন আমি তোর মামা। মামা বলে ডাক।

তখন সেজে গুজে তৈরি হয়েছে সীতু ডোমের মা। তার সঙ একটাই। কাবুলীওলার। থলথলে মোটাসোটা মেয়ে। চুল পাকন্ত। মাথায় ফেট্টি বেঁধে হাতে লাঠি নিয়ে কাবুলী সেজে ভিড়ে ঢুকবে। 'উপিয়ার' বদলে ছুদ চাইবে। লাঠি ঠুকরে। আর তার খাতক সাজার কথা ন্যাড়া ডোমের। রোগা পাঁকাটি চেহারা। কালো কুচকুচে রঙ। খুব লোক হাসাতে পারে। কিন্তু এবার ঝুরন ডোমনীর সঙ্গে তার বউয়ের ঝগড়া হয়েছে। সে সাজছে হনুমান। উপ ঝাঁপ করে উঠোনে খড়ের লেজ নেড়ে দাপাদাপি করছে। তার বউ হাসি চেপে ধমকেছে—এখানে কী? গাজনতলায় জাঁক দেখাও গে না! তাই শুনে গম্ভীর ন্যাড়া বলছে—থাম্ মাগী! পেরাকটিস কচ্ছি।……

আর কুনাইপাড়ায় তখন সুদাং কুনাই হাসপাতালের ডাক্তারবাবু সাজতে ব্যস্ত। তার সঙ্গে ছড়াও থাকবে। ছড়া বেঁধেছে তিলক কুনাই। ইস্কুলে কেলাস থিরি অব্দি পড়েছিল। গোমুখ্য নয়। খাতা আছে। পেনের কলম আছে। লিখেছে: আর যাব না আঁতুড়শালে/রেক্‌শা ডেইক্যে নিয়ে যাও গো বহরম-পুরের হাঁসপেটালে॥' পরকলিটা শেখাচ্ছে দোহারকিদের। 'ইনজেকশন দেবেন ডাক্তার পেঁচোয় পেলে॥'

এই নয়। আরও আছে। জিভের সরে আঙুল ভিজিয়ে পাতা ওল্টাচ্ছে। তারপর—'ওগো বঁধুয়া, পাশে শুয়ো না দিন বড় কঠিন/দেশে এল ফেমিলি পেলানিং॥'…

গাজনতলায় আজ এইসব হাঁড়ি ভাঙার ধুম। যার যা মনের কথা আছে, বলে নাও সম্বচ্ছরের মতো। এখন বাবা ন্যাংটেশ্বর তোমার সহায়। কাকে পরোয়া?

তাই বলে একেবারে বেপরোয়া হওয়াও যায় না। ছোটলোক-টোটলোক মানুষ সব। রাত পোহালেই পেটের ধান্দায় বেরুতে হবে। গাঁয়ের লোকদের চটানো বিপদ। সে যদি পারে কেউ, তো ওই বোরজে মশাই। বাবুপাড়ার বজ্রধর বাঁড়ুজ্যে। নিজেকে বলেন পল্লীকবি। কখনও বলেন চারণকবি। অবশ্য কবিয়ালী করতে কোন আসরে কেউ দেখেনি কখনও। নিদেন রথযাত্রা বা পুজোপার্বণের দিন ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছড়া গান। কবিয়ালের ভঙ্গীতে নাচেন। ঢোল বাজায় নবীন বোরেগী। খঞ্জনি বাজায় অকু নাপিত। দোহারকি করে জনাকতক চাষাভূষো মানুষ। কিন্তু বোরজে মশাইকেও সারা বছর যেন গাজনতলার জন্যে হা-পিত্যেশ করতে হয়। এমন জমাট আসর আর থাকতে নেই। রসিক মানুষ বলে রসের গানেই পাকা। সঙের ঝাঁঝমেশানো সেইসব ছড়াগান গাজনতলার সঙ্গে চমৎকার মানিয়ে যায়। তার ওপর আছে হাটে হাঁড়িভাঙার বদখেয়াল। পাড়ার গোপন কেলেঙ্কারি নিয়ে গান বাঁধতে ছাড়েন না। পারে কে বোরজে মশাইকে? কালো দাঁতগুলো বের করে হেসে বলেন—আমি বজ্রধর, বজ্র ধরতে পারি হে। যা পারো কোরো।

নাদুসনুদুস মানুষটি। মাথায় টাক আছে। প্রকাণ্ড গোঁফ আছে। সামনে একটা দাঁত ভাঙা। ওখান দিয়ে পিক করে থুতু ফেলার অভ্যেস। ভুঁড়িটিও নেয়াপাতি। পাঞ্জাবির হাতা গুটিয়ে একহাত কপালে অন্যহাত মাজায় রেখে নাচেন। কপালে সিঁদুরফোঁটা। হঠাৎ কারও দিকে তাকিয়ে ফিক করে হাসলে তার আর মুখে ভাত রোচে না। বোরজে মশাই আমাকে দেখে হঠাৎ হাসলেন কেন? সারাক্ষণ মগজে এই ঝিঁঝি পোকা ডাকে। যদি জিগ্যেস করে বোরজে মশাই, হাসলেন কেন? বোরজে মশাই জবাব দেবার পাত্রই নন। কথায়-কথায় ছড়া কাটেন। রঙ্গব্যঙ্গ করেন। বকুলতলায় বুড়োথুড়ো বাবুরা আড্ডা দিচ্ছেন এবং কোন চাপা ব্যাপার নিয়ে কথা চলছে, দূর থেকে ওঁকে দেখলেই—চুপ, বোরজে আসছে, বলে গম্ভীর হয়ে যান। ছোট ভাই চক্রধর বিডিও আপিসের পিওন। তারও বয়স পঞ্চাশ হয়ে এল। বলে—আর কতকাল এঁড়েমি করবে বলোদিকিনি দাদা? তোমার জন্যে মুখ পাইনে কোথাও। ছিঃ! বজ্রধর ফিক করে হেসে বলেন—কী বললি, এঁড়েমি? এঁড়ে দেখেছিস কখনও? দেখে আয় গে, মিত্তিরমশাইয়ের বাগানে চরছে। এবং চক্রধর একদিন সাইকেলে আপিস থেকে ফিরে আসছে, সন্ধেবেলা সেই বাগানের দিকে তাকিয়ে সত্যি একটা এঁড়ে দেখেছিল। হাসতে-হাসতে নাড়ি ছিঁড়ে যায়। মাইরি দাদাটা যেন কী!

এই বোরজে মশাইও এখন তৈরি হচ্ছেন অক্ষ নাপিতের বাড়িতে। অক্ষ এক বালতি ভাঙের শরবত বানিয়েছে। বোরজে মশায়ের চোখ ক্রমশ ঢুলুঢুলু। গাজনতলায় গিয়ে একবার ফাঁক বুঝে ছিলিমও টানবেন। একসময় গাজনতলা অন্ধকার হয়ে যাবে। ভিড় যাবে ভেঙে। শুধু কয়েকজন মাতাল থাকবে শুয়ে। কেউ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টলবে। আপনমনে কথা বলবে। আর আসবে একটা কি দুটো শেয়াল। হাড়িকাঠের কাছে ঘুরঘুর করবে। রক্ত চাটবে। গাজনতলা তখন পুরাণের শেষপাতা।···

দীঘির পাড়ে চিনাথ তার উঠোনের মাচায় এনামেলের খুরি ধরেছে, গোবরা সাবধানে নীলচে রঙের তালরস ঢালছে, পিছনে চাপা একটা শব্দ হল। ঢালু পাড়ে কেয়া কোঙা ফণিমনসা আর নাটাকাঁটা কুচফলের ঝোপঝাড় আছে। গোবরা ভাবল গরু কী মোষ, ঘুরল না। চিনাথ বলল—সাবোধান বাপ। এবং চিনাথের দৃষ্টি খুরির দিকে। তারপর মাচাটা মচমচিয়ে উঠল।

চিনাথ উদাস চোখে তাকায়। গোবরা বলে—কে বটে হে ? তারপর সেও মুখ তোলে। দুই সঙালের চোখে পলক পড়ে না। এসেই মাচায় পা ঝুলিয়ে বসেছে একটা লোক। একটু-একটু হাঁফাচ্ছে। রোদপোড়া তামাটে চেহারা। চোয়ালের হাড় ফুটে আছে পষ্টাপষ্টি। এক চিলতে গোঁফও আছে। পাতলা খোঁচা খোঁচা দাড়ি আছে। তার গায়ে ধুলোকাদায় নোংরা খয়েরি জামা, পরনে আঁটো ছাইরঙা পেন্টুল, তার কাঁধে একটা কাপড়ের ব্যাগ ঝুলছে। চিনাথ একটু ঝুঁকে পায়ের দিকটাও দেখে নেয়। খালি পা শুকনো কাদা মাখা। লোকটা ঠোঁট ফাঁক করে হাসল।

চিনাথ বলে—আপুনি কে বাবুমহাশয় ?

গোবরা বলে—নিবাস কোথা বাবুমহাশয় ?

লোকটা খিক্‌খিক্ করে হেসে ওঠে।—আমাকে চিনতে পারছ না শ্রীনাথ ?

অমনি চিনাথের নেশা চিড়িক করে দুফাঁক হয় এবং মধ্যিখানে মাথা তুলে চমকখাওয়া গলায় নেশা ও স্বাভাবিকতায় দুদিকে দুহাত রেখে সঙাল বাউরি বলে—তাইলে চিনলাম বাবু মহাশয় !

গোবরা মেয়েলি চোখে তাকিয়ে বলে—আম্মোও চিনি-চিনি লাগে। বো··· বো···বোর···

—আপুনি আজ্ঞে বোরজে মশায়ের জামাই। বলে চিনাথ মাচা থেকে

ধুপ করে নামে এবং আঁটো পাতলুন প্রায় কাটিয়ে হেঁটমুণ্ডে পায়ের ধুলো নিতে হাত বাড়ায়। বিগলিত হয়ে বলে—অপোরাদ লেবেন না জামাইবাব, আমি বাঞ্চোত লেশাখোর মনিষ্যি। কী দেখি। ও জামাইবাবু, খবরাদি ভাল তো? আমাদের মেয়ের খবর ভাল তো? বাড়ির সব ভাল তো? ও জামাইবাবু, দেখি, শ্বউরবাড়ি ঢোকেন নি এখনও—হুঁ, আগে ঘাটে গিয়ে ধোয়াপাখলা করুন! বাপ গোবর্ধন, ঘাটবাগে লিয়ে যা জামাইবাবুকে।

এই দীর্ঘ আবেগাপ্লুত সংলাপের পর চিনাথ পশ্চিম মাঠের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলে—উদিকে ফের কোত্থেকে এলেন গো? বিলখাল জায়গা। দিশে লেগেছিল নাকিন? যান. মুখচোখে জল দিন।

বোরজে মশাইয়ের জামাই কোন কথার জবাব না দিয়ে পুবের গাজনতলার দিকে তাকায়। বলে—ওখানে কী হচ্ছে শ্রীনাথ?

—আজ যে গাজন আজ্ঞে! চিনাথ ভক্তিতে নম্র হয়ে বলে। আজ সংকেরাস্তির পুজো আজ্ঞে! দেখছেন না, তাইতে আমি সেজেছি। সঙটঙ দোব। ছোটনোক মনিষ্যির কথা ছেড়ে দিয়ে ঘাটে যান জামাইবাবু! আমরা গাজনতলা যাব। বেলা পড়ে এল।

গোবরা চোখে ঝিলিক তুলে বলে—আপনার শ্বউরমশায়ও সঙ দেবেন গাজনতলায়।

জামাইবাবু শুকনো হাসে। তারপর বলে—তেষ্টা পেয়েছে। জল খাওয়াও তো শ্রীনাথ।

—জল?

—হ্যাঁ, জল। জামাইবাবু ঢোক গিলে ফের বলে—ঘরে মুড়িটুড়ি থাকলে দিতে পারো। নেই?

সন্দিগ্ধ স্বরে চিনাথ বলে—শ্বউরবাড়ি যাবেন না জামাইবাবু? ক্যানে গো?

জামাইবাবু এবার রেগে যায়। —অত কথায় তোমার কাজ কী শ্রীনাথ? জল চাইলাম, দেবে কী না বলো।

অপ্রস্তুত হেসে চিনাথ টলতে টলতে ঘরে ঢোকে। পটেশ্বরীর শাড়িপরা গোবরা মেয়েমানুষের চোখে তাকিয়ে থাকে বোরজে মশায়ের জামাইয়ের দিকে। জামাইবাবু খুঁটে খুঁটে জামার শুকনো কাদা ছাড়াচ্ছে। কোঁচকানো ভুরু। ঘাম শুকিয়ে মুখটা ময়ামানুষের মতো ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। গোবরা ভাবে, এর অর্থটা কী বটে? বড়ই গুহ্যকথা মনে হয়।

কাঁসার একটা গেলাস আছে ঘরে। চিনাথ হাতড়ে পায় না। জানালাহীন ছোট্ট ঘরে এখন অন্ধকার। ওদিকে গাজনতলার ধুম বুঝি ফুরিয়ে যায়। অসময়ে এ কী জ্বালাতন! নেশার ঘোরে খালি পটেশ্বরীকেই বিড়বিড় করে গাল দেয় চিনাথ। পেতলকাঁসার জিনিস বলতে ওই গেলাসটা বাদে সব ঘুচিয়ে গেছে পালানী মেয়েটা। অপয়া রাক্কুসী! চিনাথ দুমদাম পেঁটরা সরায়। হাঁড়ি থালা ওলটপালট করে।

গোবরা ডাকে—ও মামা! দেরি হয়ে যাচ্ছে।

চিনাথ বলে—যাই বাপ্। জামাইবাবু বড় মুখ করে আমার কাছে জলটল চাইলেন। ই কি কম কথা? যাই বাপ্, যাই!

হুঁ! অসময়ে এ কী ভোগান্তি দেখদিকিন্। তুমি বাপু বোরজেমশায়ের জামাই। শ্বউরবাড়ি গিয়ে খাটে বসবে। পান খেয়ে ঠোঁট রাঙাবে। আপন শাউড়ি নেই বটে, ছোটঠাকরুন তো আছেন। তিনিও শাউড়ি।…বোরজে মশায়ের ছেলেপুলে বলতে ওই একটিমাত্তর মেয়ে। মা-মরা মেয়েটা বড্ড ন্যাওটা ছিল বাবার। টাউনে বিয়ে দিলে সেবার চিনাথ সেই বিয়ের ভোজ খেয়েছিল। একসময় বোরজে মশাইয়ের দলেও সে ছড়া গাইত সং দিত! কিন্তু ওনার যা মুখখিস্তি আর কথায় কথায় চড় থাপ্পড়!

—ও মামা!

—যাই বাপ্, যাই!

গেলাস খুঁজে পেয়ে হঠাৎ সেটা খামচে ধরে বসে রইল চিনাথ। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেছে। চিনাথের বুক ঢিপঢিপ করে কাঁপে। নেশা ফিকে হয়ে যায়। হা বাবা ন্যাংটেশ্বর, খামোকা এ কী ঝড়বাদল অবেলায়!

আর সেই সময় বোরজে মশায়ের জামাই এসে ঘরে ঢোকে। চাপা গলায় বলে—শ্রীনাথ, আমি তোমার ঘরে থাকছি। তোমরা গাজনতলায় চলে যাও। আর শোন, আমি এখানে থাকছি, কেউ যেন জানে না। কেমন?

অগত্যা চিনাথ বলে—আচ্ছা।

—ওই ছেলেটাকেও আমি বলেছি। ওকে একটু সামলে রেখো ভাই!

—আজ্ঞে।…

চিনাথ যখন বাইরে এল, তখন গাজনতলার দিকে আকাশের রঙ শালিখ পাখির ডিমের মতো নীলধূসর হয়ে গেছে। কিন্তু পশ্চিমের মাঠের আকাশে রক্তসন্ধ্যার ঘোর লেগেছে। মাচার কলসীটা থেকে বাকি রস খুরিতে ঢেলে গোবরা মিচিক মিচিক হাসে। —খাও মামা!

খুরি তুলে চিনাথ ঘরের দিকে চোখ নাচিয়ে বলে—সাবোধান।

গোবরা অবিকল পটেশ্বরীর গলায় বলে ওঠে—হ্যাঁ মিনসে, হ্যাঁ। সেটা তুমাকে বলতে হবে না।…

গাজনতলায় হুলুস্থুল ভাব জমেছে ততক্ষণে। ঘন ঘন শিবো নামে জয়ধ্বনি দিচ্ছে ভক্ত সন্নেসীরা। শেষ বলির ঢাক বাজছে চৌগুণ তালমাতোল। হাড়িকাঠ ঘিরে ওরা ঘুরে ঘুরে নাচছে। মাথার ওপর বেতে-বেতে হচ্ছে ঠোকাঠুকি। বুড়োনিমের তলায় রামপদ বাগদী যাত্রাদলের বিবেক সে. গমগমে গলায় গান ধরেছে :

নাচে, পাগলা ভোলা গলায় মালা
হাতে লয়ে শূল।
প্রমথ প্রমত্ত নাচে, (কানে) ধুতুরারই ফুল ॥
স্কন্ধেতে নাচে নাগিনী
হাঁ করে হাঁকে হাকিনি
ডাঁ করে ডাকে ডাকিনী
এলাইয়া চুল ॥…

রামপদের মূর্তিটি শিবের। সারা গায়ে চুলোর ছাই মাখানো। পরনে নকল বাঘছাল। হাতে ডম্বরু। কাঁধে প্লাস্টিকের সাপ আর মাথায় পরচুলোর জটাজুট। তাতে একফালি রাঙতার চাঁদও আঁটতে ভোলেনি ; মুখে খড়িগোলা রঙ মেখেছে এবং গোঁফ এঁটেছে কান বরাবর দড়ি টেনে। বেশি হাঁ করা যাচ্ছে না। তাতে কী? গলার স্বর হাঁড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে যেন, এমন গমগমে ও প্রতিধ্বনিময়। বোরজে মশাই তারিফ করে বলেছিলেন—বাগ্দীর পো কাঁকড়া গুগলি খেয়ে একখানা সরেস গলা জুটিয়েছে বটে! ও রামপদ, রেডিও-সেণ্টারে তোকে লুফে নেবে রে। যেতে চাস তো বল্, জামাইকে এককলম লিখে দিই। জামাই এখন কলকাতার কলেজে পোফেসর হয়েছে জানিস তো? খুব নাম। খবরের কাগজেও নাম ছাপা হয় বাবা। সহজ কথা।…পরে একদিন রামপদ গিয়ে ধরল—কই বোরজে মশাই, দিন তাইলে এককলম লেখে, কলকেতা যাই! অমনি বোরজে মশাইয়ের কী রাগ! জামাই না আমার শালা! বুঝলি? শালা। অবশ্য তখন ভাং খেয়ে মনের গতিক অন্যরকম ছিল হয়তো। রামপদ বেজার হয়ে ফিরে এসেছিল। যাক্ গে বাবা, এ গাঁগেরামই ভাল।

ভিড়ের একপাশে মনকির হোসেন ছড়াদার দলবল নিয়ে ছড়া গাইছিল : 'কুচুনীপাড়ায় ভোলা যাও কিসের কারণ। কার সঙ্গে প্রেম করে মজাইলে মন হে…' এবং হইহই করে কুনাইপাড়ার সুদাং-এর দল এসে পড়তেই শ্রোতৃবৃন্দ ছত্রখান, মনকির ছড়াদার তখন আরো চড়ায় গলা তোলে।

এবার জমাটি তুঙ্গে ওঠার সময়। একের পর এক সঙের দল আসছে। ছড়াদাররা আসছে। এসে গেল ন্যাড়া ডোমও হনুমান সেজে। এসে সটান উঠে পড়ল বুড়ো নিমের কাঁধে। ডালপালা নেড়ে উঁপ আঁপ করতে থাকল। তলায় বাচ্চাকাচ্চারা চ্যাঁচায়—এই হনুমান কলা খাবি? জয়জগন্নাথ দেখতে যাবি? যুধিষ্ঠির মণ্ডলের সেই গাঁজাখোর ভ্যাবলা ছেলেটা বন্দুক তাক করে। আঙুল হয়েছে নল। মুখে বলে—গুড়ুম। একপা পেছনে, একপা সামনে, একই ভঙ্গীতে বন্দুক তাক করে থাকে। হনুমান ভিড়ে নেমে এসেছে, তখনও মোনাক্ষেপা বন্দুক তাক করে আছে। হেরম্বর মেয়ে সৈরভী অভিসার থেকে ফিরে তার পিঠে খোঁচা মেরে বলে—মরণ! তখন সে ঘোরে। এবং দাঁত বের করে নিষ্পাপ হাসে। বলে—সৈরভী! কবে এলে গো? সৈরভী যেতে যেতে ফের বলে যায়—মরণ।

এসে পড়েছে 'কাবুলীওয়ালা' সীতু ডোমের মা ঝুরন ডোমনীও। তাকে ঘিরে মেয়েদেরই ভিড়। হাসতে হাসতে মেয়েদের কোমরের কাপড় যাচ্ছে খসে। ডাগর স্তনে ঝড়লাগা দুলুনি। যুবোযোয়ান পুরুষেরা আড়চোখে তাকিয়ে আছে। হেনসময়ে খবর হল, বোরজে মশাই আসছেন! এতক্ষণে আসছেন দলবল নিয়ে। আবার ভিড়গুলো ভাঙল চুরল। এসে পড়েছেন! বোরজে মশাই এসে পড়েছেন! গাজনতলায় সাড়া পড়ে গেল।

দীঘির পাড় দিয়ে দিনশেষের রোদ ঝিকিমিকি প্রজাপতির মতো নাচছে বোরজে মশায়ের টাকে। মুখে সেই বাঁকাচোরা হাসি। সামনের একটা দাঁত নেই। ঢুলুঢুলু চোখ। কোমর ঘুরিয়ে হাত মাথায় তুলে নাচতে-নাচতে আসছেন। নবীনের ঢোলে বাজছে তেওট তাল : ধা ধিন ধিন ধেরেকেটে ধেরে কেটে…রসিক বোরজে মশাই ফাঁকের মাথায় বলে উঠছেন : এক দুই তিন মেরেকেটে মেরেকেটে…এবং তিনটি আঙুল দেখাচ্ছেন। তার মানে? মানে আবার কী? ফেমিলি পেলানিং। সুদাংয়ের গান এবার মাঠে মারা গেল। সুদাং গতিক বুঝে অন্য গান ধরেছে। বোরজে মশায়ের মতো অমন ঠাটঠমক অমন রঙধরানো পদ বাঁধার সাধ্যি তার নেই।

সবশেষে এল চিনাথের সঙ। সঙ্গে গোবর্ধন। 'বঁধু লাও বা না লাও মুখ দেখে যাও পটেশ্বরীর আয়না'।। সৈরভী তার 'মরণ' ছুঁড়ে গোবরার পিঠে কিল মেরেছে—গলা নেই, টলা নেই, খালি চিঁ চিঁ!

গোবরা নাচতে নাচতে একটু কাছ ঘেঁষে চাপা গলায় বলে—ও সৈরভী, তোর চুলে অত খড়কুটো ক্যানে?

সৈরভী রাঙা মুখে সরে যায়। ভিড়ের মধ্যে ঢুকে আবার খোঁপাটা ঠিক-ঠাক করে নেয়। খোঁপার কাছ থেকে হলদে শুকনো কদ্বেপাতা ঝরে পড়ে। বুকের ভেতরটা হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগে। একবার ঠোঁট কামড়ায়। তারপর হনহন করে চলে যায় অন্য ভিড়ে। কেন যেন হঠাৎ বড্ড ভয় করে সৈরভীর।···

তখন মন্দিরতলায় ভক্ত সন্নেসীরা লম্বা হয়ে পড়ে প্রণাম করছে। খগা জগার ঢাক শেষবারের মতো বাজছে। ঠাকুমশাইয়ের ট্যারা মেয়েটা ধামার মুণ্ডুগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে, নাকি ভকা বাউরির দিকে, বোঝা যায় না। ঠাকমশাই ভেতরে ঢুকে সলতে উসকে দিচ্ছেন। বাইরে হাতের রেখা ঝাপসা হয়ে এল।

এবার সময় হয়েছে তোরাপ গুণিনের মড়া নাচানোর। অং বং করে মন্তর পড়ছে গুণিন। অষ্টাবক্র লাঠির ডগায় সিঁদুর মাখানো মুণ্ডুটার সবে ঘুম ভাঙছে। দাঁতগুলো আরও ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। গুণিন দুলছে। হাতের লাঠিটাও দুলছে। চোখ বুজে গুণিন হেঁড়ে গলায় তালে লালে বলছে: জাঁগ জাঁগ জাঁগ জাঁগর ঘিনা···জাঁগর ঘিনা জাঁগ জাঁগ জাঁগ···

ওদিকে বোরজে মশাই খিটকেলে ছড়া গাইছেন। বাবুপাড়ার একটা কেলে-ঙ্কারি। সবাই টের পেয়ে উপভোগ করছে। ভুজঙ্গ ডাক্তারের বিধবা বোন আর ব্লক আপিসের পশুডাক্তারের প্রেম জমে উঠেছে। ডাক্তারের গাইগরুর ব্যামো সারাতে এসেই নাকি এই ব্যাপার। এখনই খবর চলে যাবে ডাক্তারের কানে। কিন্তু কী করার আছে! বজ্রধর বাঁড়ুয্যে বলবেন—আমার কবডঙ্কাটি। ভুজুর ওষুধ আমি খাই নাকি? ওষুধ নয়, ঘোড়ার পেচ্ছাপ। আসলে হয়েছিল কী, ও মাসে একবারান্দা রুগীর সামনে বোরজে মশাইকে অপমান করেছিল ভুজঙ্গবাবু। মিক্সচারের দাম না হয় ছেড়েই দিচ্ছেন, ট্যাবলেটগুলো কিনতে তো পয়সা লেগেছিল! উনি তো আর দানছত্র খুলে বসেননি। বোরজে মশাই গুম হয়ে বলেছিলেন--ট্যাবলেটে আমাশা বেড়ে গেছে ভাই ভুজু। কাজেই তুমিই আমাকে ক্ষতিপূরণ দাও। তারপর তক্ষুনি কেটে পড়েছিলেন। এবং

আসতে-আসতে মাথায় গজিয়েছিল এই গানটা। রোস, দেখাচ্ছি মজা গাজনের দিন। আজ সেই মজা দেখাচ্ছেন। তিনবার ধুয়ো গেয়ে দোহারকিরা সমের মুখে ছেড়েছে, বোরজে মশাই অন্তরার প্রথম কথাটা বলতে ঠোঁট ফাঁক করেছেন, ঠিক সেই সময়…

হঠাৎ সব শব্দ থেমে গেল গাজনতলায়।

দিনশেষের ধূসর কী এক আলো ন্যাড়া, পাথুরে এবং চাষাপুরুষের হাতের তালুর মতো খসখসে এই এক একর চটানে এতক্ষণ মানুষজনকে প্রাগৈতিহাসিক যূথ-স্মৃতিতে চুবিয়ে রেখেছিল।

একখানা পুরানো ছবির পট ভাঁজ করা থাকে সারাবছর এবং সেই পট খুলে হাত পা ছড়িয়ে বসে ঢুলুঢুলু চোখে দেখছিলেন বাবা ন্যাংটেশ্বর শিব, যাঁর অন্য নাম মহাকাল।

হঠাৎ কারা এসে লাথি মেরে উল্টে দিল সেই পট। প্রাগৈতিহাসিক যূথ-স্মৃতির তাবৎ মন্ময়তা ও তন্ময়তা বুদ্‌বুদের মতো ফেটে গেল তক্ষুনি।

মন্দিরের কোটরে পিদীম ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে ঠাকমশাই বিগ্রহের আড়ালে খেঁকশিয়ালের মতো লুকিয়ে পড়লেন। শেষ আরতির ঘণ্টা সঙ্গে সঙ্গে গেছে থেমে। আর ভকা বাউরি সেই ফাঁকে একটা মুণ্ডু নিয়ে পালায়। ট্যারা মেয়েটা একবার চেরা গলায় চেঁচিয়েই ব্যাপারটা চোখে পড়ামাত্র চুপ করে।

ন্যাড়া বাউরি খড়ের লেজ কামড়ে আবার নিমগাছে চড়তে যাচ্ছিল। গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে মানুষের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। নকল শিবের মুখ চচ্চড় করে, পিটপিট করে তাকায়। ঝুরন ডোমনী, সুদাং, চিনাথ, গোবর্ধন…তাবৎ সঙাল ভাঁড় এবং ভক্ত সন্নেসীগণ, খড়্গধারী রাখু কামার, খগাজগা ভ্রাতৃদ্বয় এবং খগার পুঁকড়োলাগা কাঁসিবাজানো ছেলেটা কুমোরের বারান্দায় ঝুলনপূর্ণিমার পুতুল হয়ে ওঠে।

আমোদিনীর ভূতিনীও পালিয়ে যায়। হেরম্ব চৌকিদার রক্তকাদাছাইমাখা নীল পাগুড়ি মাথায় জড়াতে গিয়ে কপালে হাত ঠেকায়। সে হাত নামাতে ভুলেই যায়। মন্দিরের গায়ে পোড়ামাটির কাজ যেমন।

বোরজে মশাই ঠোঁট ফাঁক করেছেন তো করেছেন। ভাঙা দাঁতের গর্ত দেখা যাচ্ছে। নবীন ঢোল থেকে হাত তুলতে পারছে না, কী ভীষণ আঠালো ছাউনি! অরু নাপিতের খঞ্জনিজোড়া কানের কাছে ধরা, শব্দহীন। বড় সাধে

ভুজু ডাক্তারের বিধবা বোনের গাইগরু সেজে চার-পা হয়েছিল হারাধন তিওর, সে দু-পা হতে গিয়ে বসে পড়েছে।

তোরাপ গুণিনের লাঠির ডগা থেকে মড়ার মাথা লাফ দিয়েছিল পালাবে বলে, পারেনি। গুণিনের দুপায়ের ফাঁকে গেরুয়া লুঙ্গির তলায় লুকিয়ে আছে। তোরাপের চোখের জ্যোতিটি আর নেই। ঘোলাটে চোখের পাতা, নিষ্পলক এবং তারাদুটো ন্যাবায় আক্রান্ত, হলুদবর্ণ।

গাজনতলার চারদিক থেকে মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে ঝাঁকে-ঝাঁকে 'ছিয়ারপির নোক।' বাবুরা বলেন সি আর কি। দিল্লি থেকে পাঠানো।

ছিয়ারপির নোক শুনলেই ইদানীং গায়ের রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে যায়। বউ-বউড়ি ঝি-ঝিয়াড়ি আর যুবোযোয়ান মরদগুলো মাঠেবাদাড়ে গিয়ে লুকিয়ে পড়ে। ঝগড়াঝাঁটিতে পরস্পরকে লোকেরা শাসায়—থামো, ছিয়ারপি ঢোকাব ঘরে। চ্যারাক্-পোঁ চলবে না।

'ছিয়ারপিরা, দেখতে কেমন, সবাই জেনে ফেলেছে ইদানীং। ওনাদের মাথার টুপিটি লাল নয়কো মোটে। মহা বন্দুকবাজ। লাঠিবাজও বটেন। এবং ঝাঁকে আসেন, ঝাঁকে যান। এবং বাবুপাড়ার বর্ণনা মতো ওনারা সেই হিল্লিদিল্লির নোক। তাই মহিমাপুরের বংশীদারোগারও সাধ্যি নেই, সামাল দেবেন। গতমাসে পাশের গাঁ হাটপাড়ায় চালে আগুন ধরিয়ে আসামী বের করেছিল। বংশী দারোগা পরে বলে গেছেন—বাবারও বাবা থাকে। আমি তো এতটা কাল সামাল দিয়ে এসেছিলুম, পারলুম না। আর হাটপাড়ার ও শালারাও মহা ত্যাঁদোড়। কতবার বলেছি, শোনে নি। নে, এখন মর্।

গাজনতলার চোখে সেই মরার আতঙ্ক। ছোটলোক টোটলোক মানুষ সব। নিজেদের মধ্যে মারামারি করে। রক্তারক্তি হয়। মেঘের মতো গর্জে গালমন্দ করে পরস্পরকে। কিন্তু বাবুমশায়দের সামনে একেবারে কেঁচো। ওনারা চটলে পেটে পাথর বেঁধে পড়ে থাকা ছাড়া গত্যন্তর নেই। আর সেই বাবু-মহাশয়রাও যমের মত ভয় পায যেনাদের, তেনাদের এমন করে সশরীরে চোখের সামনে দেখলে পিথিমী আঁধার হয়ে যায়। ভুঁইকম্পে পা টলে। জিভ শুকিয়ে খড় হয়। হে বাবা ন্যাংটেশ্বর, অবেলায় হঠাৎ এ কী উপদ্রু! আসরভঙ্গ, নেশাছুট্, রা সরে না মুখে।

একটা হৃদয়হীন ভয়ঙ্কর শব্দহীনতার তলায় ক্ষীণতম একটা বিলাপ নড়ে-চড়ে। কে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

তারপর কে বাজখাঁই গলায় চেঁচিয়ে বলে—এ্যাই শুওরের বাচ্চারা !

সঙ্গে সঙ্গে নড়াচড়া শুরু হয়। মন্দিরের গায়ে পোড়ামাটির কাজ থেকে ছিটকে পড়ে মূর্তিরা ছত্রভঙ্গ পালাতে থাকে। রুক্ষ ন্যাড়া চটানে পায়ের শব্দ ওঠে। ভারী জুতোর শব্দ ওঠে। ধুপ ধুপ ধুপ দুদ্দাড়…ঝন ঝনাৎ। উল্টে যায় পাঁপর ভাজার উনুন কড়াইসমেত। রসগোল্লার গামলা গড়িয়ে পড়লে বেচা ময়রা আকাশপাতাল আর্তনাদ করতে থাকে। সইদের মনোহারির রঙ ঝিলিমিলি বাজারের ওপর অজস্র হাতিবাঘশুওর ও হরিণের পাল ছুটোছুটি করে।

—এ্যাই শুওরের বাচ্চারা। আবার কে হাঁকরায় এবং বোরজে মশাইয়ের কাঁধে থাবা পড়ে। অমনি বোরজে মশাই ভাঁড়ের গলায় বলতে থাকেন—আমি কিচ্ছু জানিনে। মাইরি বলছি, আমি কিচ্ছু…আমার জামাই নয়, শালা… একশো শালা—মাইরি বলছি…তারপর গুঁতো খেয়ে অঁক করেন এবং চুপ করেন।

ওদিকে ঘুরপাক খাচ্ছে হাতিবাঘশুওর ও হরিণের পাল। মন্দির থেকে বুড়ো নিমতলা, বুড়ো নিমতলা থেকে দীঘির পাড়, দীঘির পাড থেকে কেয়া-ফণিমনসার ঝোপ অব্দি।

বস্তুত কী যে ঘটেছে, কেউই বুঝতে পারছে না। হাতের রেখা অস্পষ্ট করেছে সন্ধ্যার ছাইরঙ, যখন বুনোপায়রার পালকের মতো দেখায় দিনের মরণদশাকে।

তাহলেও এতক্ষণে ঠাহর হয়েছে, শুধু 'ছিয়ারপির নোক' নয়, বংশী দারোগার দলবলও আছে। তাদের মাথার লাল টুপিগুলো ঘুরপাক খেয়ে ভাসছে।

তারপর বংশীলোচন গাজনতলার মন্দিরের সামনে গেলেন। প্রণাম করে একচিলতে মাটি কপালে ঘষে একটু হেসে বললেন—এবার কটা পাঠা পড়ল রে ? কেউ জবাব দিল না। তাকিয়ে দেখলেন দুটো ঢাক সিংহের কাটামুণ্ডুর মতো পড়ে আছে। বায়েন নেই। খাঁড়া পড়ে আছে হাড়িকাঠের পাশে। কামার নেই। বেতগুলো পড়ে আছে। সন্ন্যেসীরা নেই। আর দারোগাবাবুর পায়ের তলায় কাঁসি। বললেন—শালারা মানুষ, না ভূত ? এ্যাঁ ?

একে-একে ধরে নিয়ে আসছে সেপাইরা সঙসাজা লোকগুলোকে। সামনে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে। টর্চ জ্বালছেন বংশীলোচন। মুখে কিছু দেখছেন। খুঁজছেন।

—এ্যাই ব্যাটা! কে তুই?

—এজ্ঞে সুদাং।

—কী সেজেছিস?

—ডাক্তারবাবু এজ্ঞে!

—ডাক্তার! দারোগা খিকখিক করে হাসেন।

একটু সাহস পেয়ে সুদাং বলে—এজ্ঞে ফেমিলি পেলানিংয়ের সঙ দিচ্ছিলাম কি না!

--কী!! ফ্যামিলি প্ল্যানিংয়ের সঙ? গিরিধারী, শালাকে এখানে বসিয়ে রাখো। আর তুই কোন ব্যাটা?

—আমি সার ন্যাড়া।

—ওটা কী তোর হাতে?

—লেজ সার!

বংশীলোচন লেজটা কেড়ে নিয়ে খড় ছিঁড়ে ফর্দাফাঁই করেন। তারপর ফের খ্যা খ্যা করে হেসে বলেন—কী সেজেছিলি? বাঘ?

—না সার, হনুমান!

—এ ব্যাটা আবার কে?

—হুজুর, আমি তোরাপ আলি।

দারোগা তার জটাজুট আর দাড়ি ধরে টানাটানি করেন। তোরাপ খোলা গলায় বলে—ওঁ বাঁপ, বাঁপজান গোঁ!

এবার দারোগা চিনতে পেরে বলেন—ও। তুই সেই ভূতের রোজা। ডাকাতদের বোমা সাপ্লাই করিস না আজকাল?

—নাঁ হুঁজুর, নাঁ। তোরাপ পা ছুঁতে হুমড়ি খায়। কিরে করে খোদা আর ন্যাংটেশ্বরের নামে।

—বোস্ এখানে। কথা আছে তোর সঙ্গে।

তোরাপ বসে থাকে রক্তছাইকাদার ওপর। মড়ার মাথাটা কাঁধের ঝোলায় রাগে ফোঁসে না কি? নিশ্চয় ফোঁসে। তোরাপ টের পায় সেটা। মনে মনে মন্তর পড়ে। খ্—খাঁ এই দাঁরোগাঁর পেঁকে। কঁড়মঁড়িয়ে মচমচিয়ে খা।

—তুই কে?

—আমি ঝুরুন গো! হেই দারোগাবাবু চেনা মানুষ চিনতে ভরোম। ই কী কথা।

—কী সেজেছিস ঝুরুন? তোর মাথায় ওটা কী? বংশীলোচন মিঠে গলায় বলেন। ও ঝুরুন, হাতে লাঠি কেন?

ঝুরনডোমনী হেসে হেসে বলে—অমোৎ (রহমত) কাবুলীকে মনে পড়ে না দারোগাবাবু? আমি অমোৎ গো, অমোৎ।

—হুঁ, তুই কোন ব্যাটা?

—হুজুর, আমি আমপদো বাগ্দী। স্বরোপদর ছেলে হুজুর।

—তোর বাপ তো দাগী ছিল?

—ছেল হুজুর। আমি দাগী লই। খাতা খুলে নিষ্টি দেখুন।

—ক' হাঁড়ি গিলেছিস ব্যাটা?

—হুজুর, বিরিক্ষি আজকাল তেমন ঝরেন না। আগে মনিষ্যি তো বটেই, পাখপাখালি কাঠবেড়ালি অসের বন্যেতে ভেসে যেত। আপনি তো জ্ঞেনী বেক্তি হুজুর, ক্যানে এমন হল, বলুনদিকিনি?

—চোওপ্!

—চুপলাম হুজুর।

—হুঁ, শিব সেজেছিস দেখছি?

—ওইটুকুনই পারি এঁজ্ঞে।

—বোরজে বাঁড়ুয্যের জামাইকে দেখেছিস?

আবছা আঁধারে সঙালের দল মুখ তাকাতাকি করে। বংশীলোচনের টর্চ সমানে আলো বিকিরণ করতে থাকে। কয়েক দণ্ড চুপচাপ থাকার পর রামপদ জোরে মাথা দোলায়।—বাবা ল্যাংটেশ্বরের ছামুতে বলছি, তেনাকে অনেকদিন দেখিনি। সেই যে আঘুন মাসে একবার এলেন—

—এসেছিল নাকি?

—এসেছিলেন বটে। কিন্তুক, যতীনবাবু, চিকান্তবাবু, আপনার মশাই হরিরামবাবুরা বোরজে মশাইকে শাসালেন। বোরজে মশাই বললেন, জামাই তুমি পালিয়ে যাও। গণ্ডগোল করো না।

—থাম্! চৌকিদার কোথায় গেল? চৌকিদার!

—আছি সার। পেছনেই আছি।

—সে ব্যাটা এসেছিল, খবর দিস নি কেন?

—সন্ধেবেলা এসেছিল শুনলাম, খবর দেব-দেব ভাবছি, আবার শুনলাম, কেটে পড়েছে।

—চুপ, ভাওখোর কোথাকার! রোস, দেখাচ্ছি মজা।

এই সময় গাঁয়ের দিক থেকে একটা হ্যাজাক আসছিল। বংশীলোচন ও তাঁর বাহিনী আলো দেখতে থাকেন। আলোটা এনেছে হরিরামবাবুর লোক। মন্দিরের বারান্দায় সেটা রাখা হয়। আরেকজন এনেছে একটা চেয়ার। বংশী-লোচন খাপ্পা হয়ে বলেন—এখন সিংহাসনে বসব না।

তাহলেও আলোটা পেয়ে ভাল হল। দারোগা সিগারেট ধরিয়ে বলেন—তুই কে রে?

—আমি লাটু কুনাই এঁজ্ঞে?

—কী সেজেছিস?

লাটু হাউমাউ করে কেঁদে পা ধরতে যায়। সেজেছিল দারোগাবাবু। বরাবর তাই সাজে সে। খাকি পোশাকটার বয়স তার বড় ছেলের সমান। হ্যাটটারও তাই। এগুলোর মালিক ছিলেন কায়েতবাড়ির মটর সিঙ্গি। বন্দুকবাজ শিকারী ছিলেন তিনি। বিলেখালে পাখপাখালি মারতেন। বুড়ো হবার পর ভিক্ষে করে এনেছিল লাটু। তারপর তো কবে মরেহেজে গেছেন মটর সিঙ্গি। সে প্রায় এককুড়ি বছর আগের কথা।

—তুই কে রে?

—গোবরা দারোগাবাবু।

—মাগী সেজেছিস কেন?

গোবরা ফ্যালফ্যাল করে তাকায়। তার হয়ে চিনাথ বলে—গাজনের দিন হুজুর। বাপপিতেমোর আমল থেকে আমরা সঙালী করে আসছি।

—চোওপ,। তোকে কে ফোঁপর দালালী করতে বলেছে? কে তুই?

—অধীনের নাম আজ্ঞে চিনাথ বাউরি।

—কোথায় থাকিস? কী করিস?

—হুইখানে আজ্ঞে। দীঘির পাড়ে একাদোকা থাকি। মাঠে জাগালী করে খাই।

— বোরজে বাঁড়ুয্যের জামাইকে চিনিস?

—না আজ্ঞে। বললাম তো, মাঠে-ঘাটে সম্বচ্ছর কাটাই। গাঁঘরের খবর জানতে পারিনে।

—পণ্ডিতের মতো কথা বলছিস কেন? তাড়ি গিলিস নি?

চিনাথ সবিনয়ে বলে—ছোটনোক মনিষ্যি আজ্ঞে। গিলেছিলাম বইকি।

তাতে আজ বাবার গাজন। কিন্তুক মজাটা দেখুন, লেশা আপনাদের দেখেই চটে গেয়েছে। হিঁক…হিঁক…হিঁক…

—দাঁত বের করিস নে।

—আচ্ছা হুজুর।

—আবার দাঁত বের করে!

—হুজুর অবোস। আজ বছরের শেষ দিন। হাসতে হয়।

—দাঁত ভেঙে দেব ভূতের বাচ্চা!

—হুজুর, আজ শিবের বিয়ের পরব। শিব বড়নোক শ্বশুরকে হেনস্তা করতে সঙ সেজে গেলেন। সঙ্গে আমরাও গেলাম। তাপরে হুজুর, বড় লণ্ডভণ্ড হুলস্থুলুস হল। তাপরে…

বেটনের গুঁতো খেয়ে সে চুপ করে। হেঁটমুণ্ডে ঝুলন্ত গোঁফটা টেনে ছাড়াতে থাকে। বংশীলোচন আরেকজনকে নিয়ে পড়েন।…

মাঠের ধারে নিসিং পণ্ডিতমশায়ের বাড়ি। অন্ধ হয়ে গেছেন ইদানীং। তবু কত বছরের অভ্যাস। নাতি-নাতনীরা হাত ধরে এনে বারান্দায় বসিয়ে দেয়। পা ঝুলিয়ে শতরঞ্জিতে বসে পশ্চিমের আকাশের দিকে মুখ তুলে থাকেন। হাতের মুঠোয় লাঠিটা খাড়া হয়ে থাকে সামনে। মনের চোখে সূর্যাস্ত দেখেন।

আজ ছিল গাজনতলায় ধুম। বাজনা হইহট্টগোল কানে আসছিল। হঠাৎ থেমে গেল তো গেলই। নিসিং পণ্ডিত বললেন—কী হল রে?

কেউ ধারেকাছে নেই। জবাব পেলেন না। তখন গলা চড়িয়ে ডাকলেন—পিণ্টুমণ্টুরা কোথা গেলি রে?

পিণ্টুমণ্টুরা নেই। কেউ যেন নেই বাড়িতে। আরও দু-চারবার ডেকে তেতোমুখে বললেন—সব মরেছে, সব্বাই। তারপর কান পেতে বসে আছেন তো আছেন। টের পাচ্ছেন একটা কিছু ঘটেছে গাজনতলায়। এমন হঠাৎ সব নিঃঝুম হয়ে যাবার কথা তো নয়।

কতক্ষণ পরে পায়ের শব্দ শুনে বলেন—কে?

—আমি সল্লা পণ্ডিতমশাই!

—সল্লা মানে?

—ঢুলেপাড়ার সল্লা গো! বিল থেকে আসছি।

—ও, সরলা। মাছ পেলি রে?

—আর মাছ পণ্ডিতমশায়! পেরান নিয়ে তটস্থ। সেই দুপুর থেকে লুকিয়ে ছিলাম বেনার জঙ্গলে। এতক্ষণে পালিয়ে আসছি। বাবা রে বাবা! মিনসেদের বিলখালেও মরণ নেই গা!

নিসিং পণ্ডিত গলা চেপে বলেন—কী, কী?

—আবার কী? ছিয়ারপি বলেই মনে হল।

—বিলে কী কবতে গেল বল্ তো?

—উদ্ধব গয়লার সঙ্গে দেখা হল। বললে, বোরজে মশায়ের জামাই নাকি কাল থেকে ওখানে লুকিয়ে আছে। ছিরু ঘোষের বাথানে ওনাকে কে দেখতে পেয়েছিল। পেয়ে খবর দিয়েছিল গাঁয়ে।

—তারপর, তারপর?

—গাঁ থেকে নাকি সেই খবর গেল থানায়। তাপরে যা হবার হল! ঢঙ মিনসেদের।

নিসিং পণ্ডিত মাথাটা একটু দোলান। বলেন—হুঁ। বোরজেটাও মরবে। তখন বলেছিলাম, যেখানে-সেখানে মেয়ে দিসনে বোরজে। কোথাকার কে, জাত-পাত চেনাপরিচয় কিচ্ছু ঠিক নেই।

—হ্যাঁ গা পণ্ডিতমশায়, বোরজেবাবুর জামাই নাকি জেহেলখানা ভেঙে পালিয়ে এসেছে?

—হুঁ তাই শুনেছি।

—জেহেলখানায় ঢুকেছিল ক্যানে বাপু? ঢুকল যদি পালালই বা ক্যানে?

—সরলা, তুই গোমুখ্যু। খিকখিক করে হাসেন নিসিংপণ্ডিত।

—বলুন না বাপু, কী করেছিল জামাইবাবু?

—নকশাল পার্টি করত। বুঝলি?

—ও, নকশাল। বুঝলাম বটে।

—কী বুঝলি?···নিসিং পণ্ডিত নড়ে চড়ে বসেন। ফের বলেন—বেশ। যা বুঝেছিস, বুঝেছিস। এখন বাড়ি যা। ছাখ্ গে, তোদের গাজনতলায় কী যেন হচ্ছে।

সরলা দুলেনীর কাঁধে বেসাল জাল। লম্বা বাঁকা দুটো বাঁশে আটকানো। মনে হয় বিশাল ডানাওলা পরী এল পশ্চিমের বিল থেকে উড়ে। শাঁৎ করে উড়ে চলে গেল ফের।

আবার নিঃঝুম চুপচাপ অবস্থা। কতক্ষণ পরে আবার পায়ের শব্দ হয়। নিসিং পণ্ডিত বলেন—পিন্টুমন্টুরা এলি নাকি রে? গাজনতলায় কী হচ্ছে বল্‌দিকি?

কোন জবাব না পেয়ে ভাবেন কুকুরটুকুর হবে। তারপর আপনমনে বলেন —হবেটাই বা কী? সঙ হচ্ছে, সঙ। গাজনতলায় যা হয়! ··

হরবোলা ছেলেটা

সকাল থেকে সাদেরালির মনে ধাঁধা, ছেলের পেন্টুল কাচতে গিয়ে পকেটে কাঁইবিচির সঙ্গে একটা দু টাকার নোট পেয়েছিল।

বছর দশেক বয়েস হল ছেলেটার। এখনও মাঝে মাঝে বিছানা ভেজায়। শোবার আগে মাথায় ফুঁ, তুকতাক, পীরের সিন্নি, মৌলবির তাবিজ, এমন কী মা ষষ্ঠীর থানের ধুলোতেও ফল ফলেনি।

পাশের বাড়ির আয়মন বুড়ির এক পেল্লায় মোরগ আছে। ভোরবেলা দরমা থেকে ছাড়া পেলেই সে সাদেরালির খড়ের চালে নখের আঁচড় কাটতে কাটতে মটকায় ওঠে। আর তক্ষুণি টের পায় সাদেরালি। তার কলজেয় নখের আঁচড় পড়ছে খর খর খর খর। একঠেঙে ভিখিরী-সিখিরী মানুষ সে। ক্রাচে ভর করে কষ্টেসিষ্টে সারাটা শীতকাল মাঠে মাঠে ঘুরে চেয়েচিন্তে ওই খড়গুলো এনেছিল। আয়মনের মোরগ চালটা ঝাঁঝরা করে ছেড়েছে। মটকায় চড়ে বাং দিলে পাড়ার মুর্গির ঝাঁকও তার সঙ্গে প্রেম করতে আসে।

তাই রোজ ভোরে সাদেরালির প্রথম কাজ মোরগ তাড়ানো। দ্বিতীয় কাজ কাঁথাকানির তলায় হাত চালিয়ে ছেলের পেন্টুল পরখ। ভিজে থাকলে ছেলের ঘরপালানী মায়ের নামে একনাগাড়ে গালমন্দ দেয়। শুকনো থাকলে ওর কপালে হাত রেখে ডাকে, সোনা রে! মানিক রে! হরবোলা রে!

হরবোলা বলার কারণ, ছেলেটা পাখপাখালি আর জন্তু জানোয়ারের ডাক নকল করতে পারে। যখন আপন মনে একলা হেঁটে যায়, দুপুরবেলার নিঃঝুম ঘোরলাগানো ঘুমঘুম স্বরে ঘু ঘু ডাকে—ঘু ঘু ঘু···ঘু ঘু ঘু। ওই তার যেন নিজের ডাক।

আগে জীবন্তীর বাজারে বেড়ালের ঝগড়া শুনিয়ে দুটো লেবনচুস কী একটা

জিলিপি রোজগার করত। রিকশোওলারা কুকুর শেয়ালের ডাক শুনতে চাইত। এক গেলাস চায়ের লোভে ছেলেটার কচি গলা চিরে যেত। সাদেরালি বারণ করেছিল। খামোকা গলার কষ্ট করা। লোকেরা মাগুনি আমোদ লুটতে চায়। দুনিয়া জুড়ে খালি আমোদগেঁড়ের ভিড়।

আজকাল বাপব্যাটা আলাদা হয়ে বেরোয়। খোঁড়া মানুষ। খানতিনেকের বেশি গাঁ ঘুরতে বেলা গড়িয়ে যায়। আর ছেলেটা ধুকুর ধুকুর হেঁটে পাঁচ-সাতটা গাঁ সেরে আসে। বাজারের মুখে খালের ধারে বটতলায় দুজনের দেখা হয়। ওখানেই সকালবেলা ছাডাছাড়ি, সন্ধেবেলা ফের দেখা। কাল সাদেরালি ভেবে সারা হচ্ছিল। মাঠে তখন বুনোপায়রার পাখনায় মুখ গুঁজে থাকার মতো ছাইরঙা সন্ধেবেলাটা ঝিম মেরে আছে। গাঁয়ের গোরস্থানে শিমুল গাছটা কুয়াশার জোব্বা আর টুপি পরে নমাজে দাঁড়িয়েছে। তাকিয়ে তাকিয়ে চোখ ব্যথা। এমন সময় খালের ওপরে কোথাও ঘুঘু ডাকল। ঘু ঘু ঘু···ঘু ঘু ঘু। সাদেরালির বাপের হৃদয় খুব নাড়া খেয়েছিল।

কিন্তু তখনও টের পায়নি ওর পেণ্টুলের পকেটে একগুচ্ছের তেঁতুল বিচির সঙ্গে একটা লালচে নোট আছে।

একসঙ্গে কে ওকে দু-দুটো টাকা দিতে পারে, কে এমন দয়াল দাতা, সাদেরালির মনে পোকা ঢুকেছে। বটতলা থেকে বাজার, বাজার থেকে কয়েক একর নীচু মাঠ পেরিয়ে বাড়ি পৌঁছনো অব্দি ছেলে তাকে সারাদিনের পুরো বৃত্তান্ত খুঁটিয়ে বলতে ভোলে না। সাদেরালিও জিগ্যেস করতে ছাড়ে না, কারণ তার বাপের মন। আর ছেলেও বাপেরটা জেনে নেয়। কে কত কামাতে পেরেছে, তাই নিয়ে ঠাট্টাতামাশাও চলে। হঠাৎ কাল সন্ধে থেকে তাল কেটে গেছে, সাদেরালি আজ সকালে সেটা ঠাহর করেছে।

কাল সন্ধে থেকে ছেলেটার মুখে অন্য ভাব। টুকটুকে ফর্সা ছেলেটা ধোঁয়াটে নীল চোখ। মাছের মতো তাকাচ্ছিল লম্ফের আলোয়। আঙুলের ডগায় ভাত ঘাঁটছিল।

আর কী যেন বলতে যাচ্ছিল অন্ধকারে বিছানায় শুয়ে, সাদেরালির চোখে ঘুমের পাথর তখন। সকালে পেণ্টুল কাচতে গিয়ে তেঁতুলবিচি আর লাল রঙের নোট দেখে একে একে সব মনে পড়েছিল। তারপর থেকে লাল নোটটা তার খুলির ভেতর খসখস করে নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে। মাথা থেকে ভাপ বেরুচ্ছে। বার বার ছেলেকে জেরা করছে। ঠিকঠাক জবাব নেই। খালি বলে, পেয়েছি।

পেয়েছিস, তো বুলিস নি ক্যানে? ধমক দেয় সাদেরালি। থাপ্পড় তুলে চ্যাচায় ফের, একটো লয় আধটো লয়। দু-দুটো টাকা। টাকা কি গাছের ফল?

ছেলেটা ঘাড় গুঁজে আবার বলে, পেয়েছি।...

বেরুতে খানিকটা দেরি হল আজ। আলপথে গিয়ে ইটভাটার কাছে সাদেরালি হঠাৎ দাঁড়াল। ছেলেটা পিছনে হাঁটছে। কেমন ঝিমধরা আড়ষ্ট চেহারা। কাঁড়ির সেপাইদের কাছে পাখপাখালির ডাক শুনিয়ে কবে একটা খাকি পেণ্টুল পেয়েছিল। হিসির দিন ওটা অনিচ্ছাসত্ত্বেও পরতে হয়। পেণ্টুলটা হাঁটু পেরিয়ে ঝোলে। আর এই শীতের হিম থেকে বাঁচতে ওই সাইজেরই একটা ঘিয়ে রঙের সোয়েটার আছে। মেদীপুরের হিঙন আলি হাজি পেল্লায় মানুষ। তার বাড়ি দিনকয়েক রাখালী করতে গিয়েছিল গত বছর। দাতা হাজিসায়েব তাকে টুটাফাটা ওই সোয়েটার পরিয়ে বলেছিলেন, যা ব্যাটা! বাদশা বানিয়ে দিলাম। কদিন পরে হাজিসায়েবের বদনার গুঁতো খেয়ে পালিয়ে আসে। গায়ে তখন সোয়েটারটা ছিল। তারপর আর বাপ ব্যাটা ভুলেও মেদীপুরের দিকে পা বাড়ায় না।

সাদেরালি চাপা স্বরে বলল, হ্যা রে বাছা, চুরিচামারি করিস নি তো?

ছেলেটা জোরে মাথা দোলায়।

ভয় পাওয়া গলায় সাদেরালি ফের বলে, বাপ নাদেরালি! এখনও খুলে বল। আমি তোর জন্মদাতা। চুরি করিস নি তো?

ছেলেটা এবার ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে ওঠে, না।

তবে কে দিলে টাকা?

দিয়েছে।

কে দিয়েছে রে?

সেই ধোঁয়াটে নীল চোখ। নিষ্পলক মাছের মতো চাহনি। নাকের ফুটো একটু একটু ফুলছে। পাতলা চিমসে রুক্ষু ঠোঁট চাটল একবার। দুপায়ে শিশিরভেজা ঘাসের কুটো, নিস্পন্দ দু একটা পোকাও লেগে আছে।

উঁচু রাস্তায় এক্সপ্রেস বাসটা জীবন্তীর বাজার ছেড়ে জোরে বেরিয়ে গেল। রোজ সকালে দুজন গিয়ে নৈমুদ্দির চায়ের দোকানে বসে এই বাসটার অপেক্ষা করে। দশ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকে বাসটা। যাত্রীরা চা খেতে নামে। সাদেরালি আর তার ছেলে নাদেরালি দু গেলাস চা আর অন্তত এক টুকরো পাউরুটির পয়সা কামিয়ে নেয়। সাদেরালি হেঁড়ে গলায় সুর ধরে বলে :

ঘরবাড়ি বালাখানা…

নাদেরালি চেরা গলায় বলে ওঠে :

রবে না রবে না।

ধনদৌলত খানাপিনা…

রবে না রবে না ॥

রূপযৌবন পোশাক আশাক…

রবে না রবে না ॥

সাদেরালি ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে পা বাড়াল। ছেলের স্বভাব সে জানে। একবার গোঁ ধরলে আর কিছুতেই নোয়ানো যাবে না। জবাই করতে গলায় ছুরি ঠেকালেও না। তবে একথা ঠিক, চুরিচামারি করা স্বভাব নয় ছেলেটার। সেই এতটুকু থেকে দেখে আসছে। শিক্ষা সহবতও দিয়েছে। ন্যায়-অন্যায় ভালমন্দ সমঝে দিয়েছে। বার বার বলেছে, ছাখ বাপ! কপালদোষে ভিক্ষে মেঙে খাই বটে, আমরা ভিখমাঙা বংশ নই। নেহাৎ এই পাটা কাটা গেল, শরীলে আধিবেধি ঢুকল। গতর খাটিয়ে খেতে পারিনে বলেই ভিখ মাঙি দোরে দোরে। তুই বড়োসড়ো হ। খাটতে শেখ। তখন আমার জিরেন।…ছেলে বাপের কথা কান করে শুনেছে। জিগ্যেস করেছে, পা কিসে কাটা গেল বাপজী? সাদেরালি একটু হেসেছে।…সে শুনে তুই কী করবি বাছা? সে বড়ো অনাছিষ্টির কথা।

না শুনে ছাড়বে না। ছেলেটার এই স্বভাব। কথাবার্তা কমই বলে। হাসেটাসেও যৎকিঞ্চিৎ। কিন্তু জেদ ধরলে খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দেবে। ঘাড় গোঁজ করে দাঁড়িয়ে থাকবে। একঠেঙে কমজোরী মানুষের পক্ষে তাকে নড়ানো কঠিন। অগত্যা সাদেরালি তার পা খোয়ানোর কাহিনী ইনিয়ে-বিনিয়ে শুনিয়েছে। শোনালে মনটাও হাল্কা হয়। কতজনকে তো শুনিয়ে ছেড়েছে।

আমার এই পা, বুঝলি বাপ—এই পায়ে হেসোর কোপ মেরেছিল তোর মা। বলেই সাদেরালি ছেলের মুখের দিকে তাকিয়েছে। মনের ভাবটা আঁচ করতে চেয়েছে। মায়ের কথা জানতে-টানতে ওর আগ্রহ নেই কোনদিনও। মা কী জিনিস, হয়তো বোঝেও না। সেই দেড় বছর বয়সে মায়ের সঙ্গছাড়া।

ক্যানে মেরেছিল বাপজী?

এই প্রশ্ন শুনে সাদেরালি মুশকিলে পড়ে গেছে। সত্যি কথাটা অতটুকু ছেলেকে বলা যায় না। অথচ খালি মনে হয়েছে, ও জানুক। ওর জানা

উচিত। অগত্যা ভেবেচিন্তে সাদেরালি বলেছে, তোর মায়ের সঙ্গে আমার কাজিয়া হয়েছিল।

ক্যানে বাপজী?

ভুরু কুঁচকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়েছে সাদেরালি। বলবে নাকি, বলা কি উচিত হবে অতটুকু দুধের বাচ্চাকে—তোর মা ছিল খানকী মেয়ে?

মুখে বলবে কী, মনের ভেতর ছবি এখনও স্পষ্ট। সেই খরার দুপুরবেলাটা চোখের সামনে এখনও জলজল করছে। কাঁকরগড়ার সোলেমান ঠিকেদার রাস্তা মেরামতের কাজে মুনিশ খুঁজতে আসত এ গাঁয়ে। তখন সাদেরালির শরীরে জোর ছিল। মাটি কোপানোর কাজে তার জুড়ি ছিল না। সেই সুবাদে সোলেমান সাইকেলে চেপে তার বাড়ি আসত। বোকাসোকা সরল মানুষ সাদেরালি হুঁশ করে নি কেন ঠিকেদার সকালসন্ধে তার মতো মুনিশখাটা লোকের বাড়ি আড্ডা দেয়। তারপর একটু করে সন্দ জেগে উঠেছিল। এক খরার দুপুরে মাথা ধরেছে বলে সাদেরালি কাজ ফেলে হুট করে বাড়ি ফিরেছিল। এসেই দেখে, উঠোনে দেড় বছরের বাচ্চাটা আপনমনে খেলছে। ঘরের দরজাটা বন্ধ ছিল, ঠেলতেই খুলে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে তাকে ঠেলে বেরিয়ে গেল হারামজাদা সুলেমান ঠিকেদার। ভেতরে আবছা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে মেয়েটা তখন আলুথালু চুল আর গতরের কাপড়খানা সামলাচ্ছে। ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সাদেরালি। গলা টিপে ধরতে গিয়েছিল কিন্তু মেয়েটা যেন তৈরী ছিল। আচমকা হেসো ছুড়েছিল। হেসোটা হাটুর নীচে লাগল। সাদেরালি আর্তনাদ করে বসে পড়েছিল।

সেই ফাঁকে মেয়েটা বেরিয়ে যায়। দেড় বছরের ছেলেটা তখন মোরগঝুঁটি ফুলগাছটা ছিঁড়ে কুচিকুচি করছে।

পরে পায়ের ঘা বিষিয়ে যায়। ওই নিয়ে মুনিশ খেটেছে। জলকাদা ঘেঁটেছে। ছেলেটাকে বাঁচিয়ে রাখতে মেহনত করেছে। পা ফুলে ঢোল হয়েছে। যন্ত্রণা বেড়েছে। তখন অগত্যা জীবন্তীর হাসপাতালে গিয়েছিল সাদেরালি। ছেলেটাকে রেখে গিয়েছিল আয়মন বুড়ির কাছে। মাস দুই পরে ক্র্যাচে ভর করে বাড়ি ফিরল। দয়াবতী আয়মন ছেলেটার যত্নআত্তির ত্রুটি করেনি।

ভেবেছিল, হারামজাদী মেয়েটা ছেলের টানে ফিরে আসবে। আসে নি। আরও কিছুদিন পরে তার বাপ এসে তালাক চাইল মেয়ের জন্যে। লোকের

পরামর্শে সাদেরালি পাঁচশো টাকা চেয়েছিল। শেষঅব্দি দুশোয় রফা হয়। সাদেরালি পরে জেনেছিল, টাকাটা সোলেমানের।

টাকাগুলো পুঁজি করে তিন-চারটে বছর সে কত কী করেছে। একটা গাই গরুও কিনেছিল। দুধ বেচে খাওয়া-পরাটা জুটছিল। তার কপাল! গাইগরুটার কী অসুখ হল। পিরিমল হাড়ি নামকরা গোবদ্যি। সারাতে পারল না। ব্লকে পশুডাক্তার আছেন। সেও ছমাইল দূরে। শেষঅব্দি হাল ছেড়ে দিয়েছিল। নকড়ি কসাই এসে নিয়ে গেল। পঞ্চাশ টাকার বেশি দেয় নি। সেই টাকায় অল্পস্বল্প মনোহারী জিনিস কিনে জীবন্তীর বাজারে হাটবারে গিয়ে বসত। চুড়ি, সেপটিপিন, চুলের ফিতে আর প্লাস্টিকের কাঁটা বেচত। ছেলেটা ভারি বশ। বাপের সঙ্গে ধুকুর ধুকুর হেঁটে আসে। তেলেভাজা খায়। চটের কোনায় চুপ-চাপ বসে থাকে। খোঁড়া সাদেরালি দোকানদারি করে। পুঁজি ভাঙিয়ে পেট চালায়।

এর বছরখানেক পরে সে ভিখিরী হয়ে গেল।

এইসব কথা ছেলেকে ইনিয়েবিনিয়ে অনেকবার বলেছে। শুধু ওই কেলেঙ্কারিটুকু গোপন করেছে। অথচ যত দিন যাচ্ছে তত মনে হচ্ছে, ওকে সবটাই বলা উচিত। ওর জ্ঞান বুদ্ধি হয়েছে। জানুক ওর মা মেয়েটা কেমন ছিল। আজ আট-নটা বছর কেটে গেল। নিদয়া মেয়েটার মনে একবারও ছেলের কথা বাজল না। বড় তাজ্জব লাগে সাদেরালির। লোকের কাছে বরাবর খবর পেয়েছে, হারামজাদী কাঁকরগড়ায় সোলেমান ঠিকেদারের ঘর করছে। খুব সুখেই আছে। কয়েকটা বাচ্চাকাচ্চাও বিইয়েছে! দামী শাড়ি আর গয়নাগাঁটি পরে মাঝেমাঝে শহরে সিনেমা দেখাতে যায়। সাদেরালি গাঁয়ে-গাঁয়ে ঘোরে বলেই আবছা নানান কথা কানে আসে।

কিন্তু ভুলেও সে কোনদিন কাঁকরগড়া যায় নি। না খেয়ে মরে গেলেও ওদিকে পা বাড়াবে না। আর ছেলেটাকেও বলা আছে, হুঁশিয়ার বাপ! কাঁকরগড়ায় যদি পা দাও, আমার মরা মুখ দেখবে।

ক্যানে বাপজী?

প্রশ্ন শুনে মুশকিলে পড়েছে সাদেরালি। ছেলেটা মায়ের খবর জানতে চায় না। সাদেরালি তাকে ভুলেও বলে নি, তার মা আছে কাঁকরগড়ায়! অন্ত

কেউ বলেছে কি না, তাও কৌশলে জেনে নিয়েছে। ছেলেটা এমন কিছু বলে না যাতে বোঝা যায়, ব্যাপারটা সে টের পেয়েছে।

ফের প্রশ্ন করলে সাদেরালি একটা রূপকথার গল্প শুনিয়েছে ছেলেকে। আহিরজান নামে এক বাদশার ব্যাটা ছিল। সে গেল শিকারে। বনের মধ্যে হরিণ চরে। বাদশার ব্যাটা তীর ছুঁড়ল। সেই তীর বিঁধল হরিণের বুকে। কিন্তু মারা পড়ল না। পালিয়ে গেল গহন বনের ভিতরে। আহিরজান তাকে ঢুড়ে হয়রান। হেনসময়ে দেখা এক ফকিরের সঙ্গে। ফকির বললে, হরিণ গেছে উত্তরে। কিন্তু হেই বাপ হুঁশিয়ার। ক্যানে? না—সবদিকে যাও, উত্তরে যেও না। গেলেই বিপদ। কি বিপদ? না, ওই হরিণ হরিণ না। তবে কী? না—আক্কুসী। মানুষের কলজে খায়।…

দম নিয়ে সাদেরালি বলেছে, তাই বলি নাদেরালি, সব বাগে যেও। খোদাতালার দুনিয়াটা অনেক বড়ো। ইচ্ছেমতো চরে ফিরে খেও। কিন্তু হুঁশিয়ার, উত্তরে পা দিও না। আর ছাখো বাপ, আমি একদিন গোরে যাব। তুমি লায়েক হবে। তখনও কথাটা মনে রেখো।

উত্তরে কাঁকরগড়া. মাইল তিনেকের বেশি দূরে না। পাকা রাস্তায় যাওয়া যায়। মাঠের পথেও যায়। কতবার ওই মাঠ পেরিয়ে দুজনে দূর-দুরান্তের গাঁয়ে গেছে। সাদেরালি ওদিকে তাকালেই চোখে কাঁকর পড়ে। তাকায় নি। ছেলেকেও নানান কথায় ভুলিয়ে রেখেছে। যদি কখনও বলেছে, চলো না বাপজী, আজ ওই গাঁয়ে যাই।

অমনি সাদেরালি রেগে ধমক দিয়েছে। কতবার বলেছি না ওদিকে যেতে নেই? গেলেই বিপদ। কাঁকরগড়ায় কলজেখাকী ডাইনী আছে।

ছেলেটা যেদিন থেকে আলাদা হয়ে ঘুরছে, সেদিন থেকে সাদেরালি আরও হুঁশিয়ার। কাঁকরগড়ার কথাটা রোজ সকালে তুলতে ভোলে না। সন্ধ্যাবেলায় ও ফিরে এসে বটতলায় দাঁড়ালো। ছল করে জেনে নেয়, ও তল্লাটে গিয়েছিল নাকি। তবে সাদেরালি বুঝেছে, ছেলে বাপকে ভীষণ মানে। এতটুকু অবাধ্যতা তো কোনদিন করে নি। যা বলে তাই শোনে।

তবু মাঝে মাঝে কাঁটার মতো সংশয় বেঁধে। নাবালক ছেলে। দৈবাৎ গিয়ে পড়তেও তো পারে। শেষে ভাবে, যদি গিয়েও পড়ে, মাকে তো চিনবে না। আর ও নিদয়া হারামজাদীও ছেলেকে কি চিনতে পারবে? কত ছেলে-পুলে ভিখ মেঙে বেড়ায় গাঁয়ে-গাঁয়ে।

কাল সন্ধেবেলা কি যে হয়েছিল, কাঁকরগড়ার কথাটা অভ্যাসমতো জিগ্যেস করে নি। সকালে পেণ্টুলের পকেটে কাঁইবিচির সঙ্গে লাল নোটটা পেল, তখনও মাথায় আসে নি।

এতক্ষণে নৈমুদ্দির চায়ের দোকানে বসে চা আর পাউরুটি তারিয়ে তারিয়ে খাওয়ার পর সাদেরালি সেই লাল নোটটা বের করল এবং সঙ্গে সঙ্গে তার কলজেয় কী চিড়িক করে উঠল। তার খুলির ভেতরটা কাঁপা মনে হল কয়েক মুহূর্ত। তারপর দেখল, হাতটা কাঁপছে।

কোনরকমে পয়সা মিটিয়ে কাঁপা-কাঁপা হাতে সে বাকি পয়সাগুলো ফতুয়ার পকেটে রেখে ক্রাচটা ওঠায়। রোজকার মতো ছেলেটা তাকে অনুসরণ করে। পীচের রাস্তায় খটখট আওয়াজ করে সাদেরালি একটু জোরেই হাঁটতে থাকে। সাঁকো পেরিয়ে খালের ধারে বটতায় গিয়ে দাঁড়ায়।

এখানেই দুজনে ছাড়াছাড়ি হবে। কে কোন গাঁয়ে যাচ্ছে, পরস্পরকে জানাবে।

কাল সকালে ছাড়াছাড়ির সময় ছেলেটা হাসি মুখে বলেছিল, আজ আমি চণ্ডীতলা যাব বাপজী! নাককাটীর গান শুনে অনেক চাল দিয়েছিল।

নাককাটীর গানটা সাদেরালি শেখায় নি। কী ভাবে কোথায় শিখেছে কে জানে।

…নাকটি ছিল বাঁশির মতো
কতজনায় দেইখ্যে যেতো
  পথেঘাটেতে হায় গো…
মোড়লবুড়া বদের গোঁড়া
কেইট্যে লিলে নাকের গোড়া
  পথেঘাটেতে হায় গো…

গানটা শুনলে সাদেরালি হাসিতে গা ঘুলোয়। সে বলেছিল, তাই যাস চণ্ডীতলা।

তা পরে যাব কাপাসী।

তাই যাস বাপ! যেথা মোন চায় যাস। হরবোলার খুব কদর হয়েছে। তার কুকুর ডাক শুনে গাঁয়ের সব কুকুর ছুটে এসেছিল। বাপ-ব্যাটায় হেসে খুন। খানিক পরে ছেলেটা খালের ধার দিয়ে চলে গেল। ঘু ঘু ঘু…ঘু ঘু ঘু…দূর থেকে ভেসে আসছিল তার ঘুঘুপাখির ডাক।

আজ বটতলায় দুজনের মনে অন্য ভাব। মুখে থমথমে ছায়া কাঁপছে। সাদেরালি ভুরু কুঁচকে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। ছেলেটা তাকিয়েই দৃষ্টি সরালো। ধোঁয়াটে নীল চোখে দূরের দিকে তাকাল। রুক্ষ ঠোঁটটা চাটল একবার। তারপর ঘড়ঘড়ে গলায় সাদেরালি ডাকল, নাদেরালি!

হাঁ?

তুই কাল কাঁকরগড়া গিয়েছিলি, তাই না?

হুঁ।

দম আটকানো স্বরে সাদেরালি বলে, হুঁ! তাই বটে। তো টাকাটা তোকে কাঁকরগড়ায় দিয়েছে?

ছেলেটা গলার ভেতরে বলে, হুঁ।

হাঁ করে দম নেয় সাদেরালি। তারপর শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলে, তো মরদমানুষ দিলে, কী মেয়েমানুষ দিলে টাকাটা?

ছেলেটা মুখের দিকে তাকায়।

সাদেরালি গর্জন করে, মরদমানুষ, কী মেয়েমানুষ?

বাপের মূর্তি দেখে নাদেরালি কাঁপা-কাঁপা স্বরে বলে, একটা মেয়েমানুষ দিলে। আমি···আমি তেঁতুলতলায় কাঁইবিচি কুড়িয়ে দীঘির ঘাটে গেলাম। পানির পিয়াস লেগেছিল। তাপরে—তাপরে কলজেখাকীটা ধরে নিয়ে গেল।

হঠাৎ হু হু করে কেঁদে ওঠে ছেলেটা। তখনি খোঁড়া লোকটা তার কাঁধ খামচে ধরে। থাপ্পড় মারে গালে। নেমকহারাম!

ছেলেটা পড়ে যায়। কান্না সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেছে। নিষ্পলক তাকিয়ে বাপের মার খায়। সাদেরালি হাঁফাতে হাঁফাতে তাকে টেনে ওঠায় ফের। বেধড়ক মারতে থাকে। কষা কেটে রক্ত ঝরে। হিঙন হাজির ঝিয়ে রঙের সোয়েটারে ধুলো আর রক্তের ছোপ।

সাদেরালি চ্যাঁচায়, আজ থেকে তুই ফের আমার সঙ্গে ঘুরবি। তারপর পকেট থেকে সেই পয়সাগুলো ছুড়ে ফেলে খালের জলে। বার বার থুতু ফেলে। ছেলেটা আস্তে আস্তে উঠে বসল।

কিছুক্ষণ পরে ছেলেটার কাঁধ খামচে ধরে সে মাঠের পথে নেমেছে। খোদাতালার আসমানকে শুনিয়ে বলছে, আজ আমি শুওর খেলাম। যতদূর যায়, খোঁড়া লোকটা ধুয়োর মতো আওড়ায় কথাটা।

কাঁকরগড়ার দীঘির ঘাটে আনমনে দাঁড়িয়ে আছে সোলেমান ঠিকেদারের বউ। পাড়ের তেঁতুলবনে দৃষ্টি। কাঁকে একটা পেতলের ঘড়া।

ঘু ঘু ঘু···ঘু ঘু ঘু!

তেঁতুলবনে ঘুঘু ডাকল। হরবোলা ছেলেটা এসে গেছে। হেই বাপ! আর অমন করে গাঁয়ে গাঁয়ে ভিখ মেঙে ঘুরিস নে। সোনার গতর কালি হয়ে যাবে। রোজ এই তেঁতুলতলায় এসে দাঁড়াস। রোজ তোকে টাকা দেব। চাল দেব। খন্দ দেব। পেণ্টুল দেব। জামা দেব। সব দেব।

চঞ্চল চোখে চারদিকটা দেখে নিয়ে সোলেমানের বউ পাড়ে ওঠে। কেয়া ফণিমনসা নাটাকাঁটার জঙ্গলে চুপিচুপি হেঁটে যায়। ঘুটিঙ কাঁকরে ঢাকা মাটিতে পায়ের তলায় কষ্ট। আর ওই ঘু ঘু ডাক আজ তুরপুনের মতো ঘুরে ঘুরে কলঙ্কের শুকনো ঘায়ে ঢুকে যাচ্ছে। বড্ড টাটায়।

ঘু ঘু ঘু···ঘু ঘু ঘু!

বুকের কাছে চালের পুঁটুলিটা লুকোনো, তাতে একটা দশ টাকার নোট। ঠিকাদার টের পেলে জবাই করবে। রূপসী বউয়ের আর সে রূপ নেই। চুলেও পাক ধরেছে একটা দুটো। ঠিকেদারের চোখে আর সেই নেশার রঙটা খেলে না। কথায় কথায় তেড়ে আসে। শহরের মেয়ে নিকে করে আনবে বলে শাসায়।

তেঁতুলবনে ঢুকেই সোলেমান ঠিকেদারের বউ থমকে দাঁড়ায়। জাং দুটো ভারি লাগে। মাথার ওপর ডালপালায় বসে একটা ঘুঘু ডাকছে।

রাগে দুঃখে সে বলে ওঠে, মর মর! তারপর মাঠের দিকে তাকিয়ে থাকে ঝাপসা চোখে। বিশাল মাঠ হু হু করে জ্বলে। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর আস্তে আস্তে ঘাটে ফিরে আসে। ভাবে, তাহলে কি একটা স্বপ্ন দেখেছিল? ঘড়ায় জল ভরে তেঁতুলবনের দিকে তাকাতে তাকাতে সে বাড়ি ফেরে। হরবোলা ছেলেটা এল না। কিন্তু কাল থেকে তার মাথার ভেতর যে ঘুঘু পাখিটা ঢুকে গেছে সে সমানে ডাকছে আর ডাকছে।

আর তখন দূরের গাঁয়ে এক মোড়লের বাড়ির উঠোনে হরবোলা ছেলেটাকে মেয়েরা সাধাসাধি করছে ঘুঘু পাখি ডাকতে। সে পাথরের মতো চুপ। তার খোঁড়া বাপটা তার চুল খামচে ধরলে এবার সে কাঁদে আর শুধু বলে জানি না।

ইস্কাপন এবং তিরি

ইস্কাপনের একটা আসল নাম ছিল। তার বোন তিরিরও ছিল। কিন্তু তাদের তাসের দেশের লোক করে ফেলেছিল কপালীতলার ম্যাওনবাবু। আগের দিনে গাঁয়ে পালে পালে হনুমান হানা দিত। হিন্দুদের ধর্মভয়, এদিকে মুসলমানদের মধ্যেও কালক্রমে সেই ধর্মভয়ের একটা ছায়া পড়েছিল, বড়জোর অহিংস ধরনে হেই হাই চেঁচানো ছাড়া আর কিছু ঘটত না। এইতে পালের গোদার সাহস বেড়ে যায় এবং 'স্বেরাচার।' হয়ে ওঠে। দোগাছির বাঘা মৌলবী সায়েবের ফতোয়াতেও কাজ হয়নি। বড়জোর ইশপ নামে একটা জেহাদেচ্ছু গোঁয়ার চাষা গোদাটার ঝুলন্ত লেজ কেটে দিয়েছিল। তাতে আরও অত্যাচার বেড়ে যায়। দূর গাঁয়ের লোকেরা কপালীতলার শীর্ষে তার হিংস্র হাঁকরানি শুনতে পেত। অবশেষে রায় চৌধুরীদের ম্যাওনবাবু বন্দুকের লাইসেন্স পেল।

সেই বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে পড়ার শুরু থেকে মুসলমান পাড়ার ইস্কাপন তার পিছনে থেকেছে। গোদাটার নাম দিয়েছিলেন নিসিং পণ্ডিত : এ্যাটিলা দি হুন। মাঠের বটগাছে যখন এ্যাটিলাকে বধ করা হল চারদিকের গাঁয়ের লোক ভেঙে পড়েছিল। বোঝাই যায়, ম্যাওনবাবুর চেলা ইস্কাপনকেই সেই মহাভারতের কুরুক্ষেত্রপর্ব শতমুখে বর্ণনা করতে হয়েছিল।

তবে মরার আগে এ্যাটিলা ইস্কাপনের একটা কানের লতি নিয়ে যায়। ফলে সে কানকাটা ইস্কাপন হয়ে ওঠে।

তার কিছুদিন পরে কালবোশেখীর ঝড়ে ভাঙা ডাল কুড়োতে গিয়ে তিরির একটা চোখে খোঁচা লাগে। পরে তার নাম হয় তিরিকানী।

ভাইবোনের যা চেহারা, তাতে বিয়ে হওয়া কঠিনই ছিল। তার ওপর, ভিটে বাদে এক কড়িরও সম্পত্তি নেই। একজন ক্ষেতমজুর, অন্যজন ধানি-কুটোনী। একজন মাঠে ম্যাওনবাবুর জমিতে ধান কাটে, অন্যজন ম্যাওনবাবুর ঢেঁকিতে ধান কোটে। দুজনেরই গলায় সুর আছে। কপালীতলার মাঠে ভাই গান গায়, বোন গায় ঢেঁকি চেপে—দুলে দুলে নাচের ভঙ্গীতে, পাড়াগেঁয়ে দুপুরের ঘুমঘুম সুরে স্মৃতি জাগানো—যখন নিঃঝুম দুপুরে বাজপড়া তালগাছের মাথায় চিল ডাকে বিষাদে। নিমের পাতায় শিরশির করে ওঠে অন্যমনস্ক বাতাস। হাজার-হাজার বছরের গ্রামীণ অবচেতনার গহন জল কাঁপতে থাকে। কত কী মনে পড়ে যায়। কত সকাল দুপুর বিকেল কত রাতের একচিলতে

স্বপ্ন ঝিলিমিলি রাঙতার মতো কালো জলের নদী রূপালীর অতলে পড়ে থাকা —যা অলৌকিক রোদে প্রতিফলিত।

ওদিকে হনুমান হত্যার পাতকেই যেন ম্যাওনবাবুর পেটে শূলের রোগ হল। এক দুপুরে রূপালী নদীর ওপারে জঙ্গলে পেট চেপে ধরে সে ধড়ফড় করছিল। বন্দুক পাশে পড়ে ছিল। ইস্কাপন দৌড়ে গিয়ে দেখে, বন্দুকটা তেমনি পড়ে আছে। ম্যাওনবাবু নেই।

অনেক খুঁজে নদীর দহের ধারে তার লাশটা পাওয়া গেল। এক হাত জলের দিক বাড়ানো, অন্য হাত পেটের তলায়—উপুড় হয়ে পড়ে আছে। চাপ চাপ রক্ত।

জল খেতে গিয়েছিল। পায়নি। এ্যাটিলাও মরার আগে জল পায়নি। লোকে ছুয়ে ছুয়ে চার করার এমন সুযোগ ছাড়ল না। বিরাট প্রায়শ্চিত্তযজ্ঞ হয়েছিল সেবার।

ইস্কাপন এসব পাপটাপ মানে না। তার মতে, দিনরাত টোটো বন্দুক হাতে ঘুরে বেড়ানো, খাওয়া নেই, নাওয়া নেই, খালি পেটে যেখানে সেখানে জল গিলেছে, জঙ্গলে আফল-কুফল খেয়েছে কত সময়। বাবুকে বন্দুকের নেশায় পেয়েছিল। ওই নেশাতেই খেল। ইস্কাপন একলা হয়ে পড়েছিল। তার মাথার ওপর ছাদের মতো দুর্দিনের নিরাপত্তা ছিল, সেটা গেল। বেমরশুমে ইস্কাপনের পেটের ভাত জোটে না। ওদিকে তিরিকানীর বয়স বাড়ছে। ডাগর হয়েছে। আজকাল কেউ না কেউ একলা পেলে খপ করে তার হাত চেপে ধরে। ভাইবোন টের পায়, ম্যাওনবাবু তাদের পথে বসিয়ে গেছে।

অথচ তিরিকে ধান কুটতে যেতেই হয় গেরস্থবাড়ি। কিছু চাল আনে। ইস্কাপন বিলখাল খুঁজে শাকপাতা নিয়ে আসে। সন্ধ্যাবেলা উঠোনে উনুন জ্বলে। মাটির হাঁড়িতে শাক ভাত সেদ্ধ করে একচোখওয়ালী মেয়েটা। ইস্কাপন দাওয়ায় বসে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে।

সেবার প্রচণ্ড খরা। মাঠে ধুলো ওড়ে। সব জলা শুকিয়ে কাঠফাটা। বৃষ্টির জন্যে মুসলমানরা মাঠে গিয়ে নামাজ পড়ে। হিন্দুরা অষ্টপ্রহর খোলকত্তাল বাজিয়ে নাম সংকীর্তন গায়। বাবা ধর্মরাজের চত্বরে সন্ন্যাসী এসে ধুনো জ্বালে এবং যাগযজ্ঞ হয়।

রাতে উৎকট গরমে কুঁড়েঘরের দাওয়ার নিচে ছেঁড়া তালাই বিছিয়ে শুয়ে আছে ইস্কাপন। দাওয়ায় দরজার সামনে শুয়েছে তিরি। সে মেয়ে। শা

খুলে শুয়েছে। গাময় ঘামাচি। ঘুমের ঘোরে খোলামকুচি দিয়ে চুলকোয়। নিচে শুয়ে ইস্কাপন আকাশের ছায়াপথ দেখছে। হঠাৎ চাপা গলায় তাকে তিরি ডাকে—ঘুমোলি?

উঁহু। ঘুম কই?

আজ মোল্লাবাড়ি ধান কুটছিলুম। তখন মোল্লা এল বেলডাঙ্গার হাট থেকে।

হুঁ।

বাঁজা গাইগরুটা বেচে এল।

হুঁ।

আড়চোখে দেখলুম কাঠের সিন্দুকে গোছাগোছা নোট রেখে দিলে।

ইস্কাপন খুকখুক করে হাসে। কিছু বলে না। কানা বোন। একটি চোখ। তাও আড়চোখ।

তুই দাঁড়িয়ে থাকবি গোয়াল ঘরের পেছনে। আমার চেনা বাড়ি। দেখে এসে তোকে বলব। তারপরে···

তারপরে?

দেয়ালে গর্ত করবি। আমি ঢুকব।

সিঁদ? বলে ইস্কাপন আবার হাসে। চাপা হাসি।

পারবি না? ক্যানে পারবি না? তুই তো মরদ মানুষ।

ইস্কাপন চুপ করে থাকে। কখনও এসব কথা ভুলেও ভাবেনি। কিন্তু বোনটার বুদ্ধি আছে।

কী হল? পারবি না?

ইস্কাপন হাই তুলে বলে, হুঁউ। পারব মনে হচ্ছে।

তবে ওঠ।

এক্ষুণি?

হ্যাঁ, এক্ষুনি নধু চৌকিদার হেঁকে গেল। আর বেরবে না। ওঠ!

ভাই বোনে ওঠে। ঘরের কোণা হাতড়ে বাপের কালের ভাঙা শাবল বের করে। দুজনেই কিন্তু থরথর করে কাঁপে। কাঁপতে কাঁপতেই বেরিয়ে যায়।

-

সেবার কপালীতলার থানায় এসেছেন নতুন দারোগা। লালমোহন খাস্তগীর নাম। লোকে বলে লাল দারোগা। চোখ ঘুরিয়ে তাকালেই দাগী চোর

কাপড়ে-চোপড়ে হয়। আর সেইবারই কপালীতলার সব গেরস্থবাড়ি কোন-না কোন রাতে সিঁদ কেটে চুরির খবর। গাঁয়ে চোরডাকাত ছিল না বললেই চলে থানার দাপটে, এবং লোকগুলোও হাঙ্গামা-হুজ্জত ভালবাসে না বংশপরম্পরা। গোড়ার দিকে সন্দেহভাজন লোকেরা বেদম মার খেল। সে মারের মা-বাপ নেই। লালু দারোগার কারবারই আলাদা।

কানকাটা ইস্কাপনকে কে সন্দেহ করবে! অমন সরল গোবেচারা বোকা হাবা মানুষ আর দুটি নেই গাঁয়ে! আর কানী মেয়েটাও তেমনি। সুর ধরে গান গেয়ে ঢেঁকিতে পাড় দেয়। মেয়েমহলে জনপ্রিয়তা আছে, বিয়েশাদীতেও নাচে গায়। পুরুষ সেজে ফার্স দেয়। কেউ ভাবতেও পারে না। গেরস্থ বাড়ির গুপ্ততথ্য সে আঁচলে চালের সঙ্গে গিঁট দিয়ে বাঁধছে।

কিন্তু ইস্কাপনের চুকচুকে শরীর, পাঁজরের হাড় মাংস, মুখের তৃপ্তি আর সারাদিনের নাক ডাকানো ঘুম, ওদিকে ঢেঁকিতে চেপে কানী মেয়েটাও দুলতে থাকে—শরীরে ফুলন্ত ভাব, হঠাৎ যৌবন জেল্লায় ফেটে পড়ছে—হাঁটতে পাছা দোলে, আত্মবিশ্বাসের জলজলে ছটা।

ক্রমশঃ এসব দিকে চোখ পড়ে লোকের।

লালু দারোগার ডাক আসে। রঘু চৌকিদার তলব দিয়ে দিয়ে যায় দুজনকে। দারোগা খুদেচোখে খুঁটিয়ে ভাইবোনকে দেখতে দেখতে হাসেন। অর তো দেহি একগোয়া কানই নাই! নিল কেডা? চিলে?

ইস্কাপন করুণ হাসে। আজ্ঞে না। হনুমানে।

হনুমানে! এ্যাই মরসে! অর তো দেহি একচক্ষু নাই!

তিরি কাঁপতে কাঁপতে বলে, গাছের ডাল পড়েছিল হুজুর: ঝড়ে।

ঝড়! এ্যাই মরসে! দারোগা হাহা করে হাসেন। এই সময় ভুবন জমাদার সেপাইবাহিনী, কিছু মাতব্বর লোক আর দু'জন বাহকের মাথায় চাপানো দুটো বস্তা নিয়ে থানায় হাজির। ইস্কাপনের বাড়িতে বমাল মিলেছে দেড় বস্তা ধানচাল, তার মধ্যে গয়নাগাটি আর টাকা পয়সার পুঁটুলি। একঝাঁক থালাবাটি গেলাস—সবই কাঁসার।

তেওয়ারী! দারোগা হাঁকেন। মাইয়াডারে লইয়া যাও। ফজল আর সমাদ্দার লও কান-কাটাডারে। এ্যাহন আইনের কাজ আইন করুক। কী কন আপনারা। হাঃ…হাঃ…হাঃ।

সবাই বোঝে ব্যাপারটা কী দাঁড়াবে। তবু সবাই খ্যাক খ্যাক করে হাসে

প্রায় দেড়বছর পরে। সদর শহরের জেলখানা থেকে একই সময় খালাস পেল ইস্কাপন আর তিরি। গঙ্গার ধারে জেলখানা। বাঁধে বটগাছ। বটতলায় চা-পান-বিড়ির দোকান আর এক সন্ন্যাসীর আড্ডা। বটতলায় দাঁড়িয়ে ভাইবোন পরস্পরকে দেখছিল।

তিরি একটু হাসে। চল যাই।

কোথায়?

গাঁয়ে।

ঘাড় নাড়ে ইস্কাপন।—না।

মরণ! তাহলে যাবি কোথা?

ইস্কাপন অনবরত দাড়ি চুলকোয়। জেলে গিয়ে দাড়ি রেখেছে। মাথায় লম্বা চুল হয়েছে। খুব নামাজ পড়ত আর তার ফকিরী চালচলন দেখে বিজ্ঞ জেলার খুশি হয়েছিলেন। ভেবেছিলেন লোকটা ছিল চোর। সাধু হয় তো হোক। সে তো ভালই।

হঠাৎ তিরি বলে, তুই তো ফকিরের মতো চেহারা করেছিস! আয় ভিক্ষেয় যাই। আমার একটা চোখ কানা। তোর দুটো চোখ কানা হোক।

ইস্কাপন গম্ভীর হয়ে বলে, হোক।

হুঁ। চোখ বুজে থাকবি। আমি তোর লাঠি ধরে বাড়ি-বাড়ি ভিক্ষে করে বেড়াব। আর···

ইস্কাপন বুঝেছে। বলে, হুঁ।

তারপর থেকে এ গাঁ ও গাঁ ঘোরে এক অন্ধ ফকির। তার লাঠি ধরে নিয়ে বেড়ায় একটি যুবতী মেয়ে—তারও একটা চোখ নেই। তারপর সিঁদ কেটে চুরি হবেই সে গাঁয়ে। তবে আর ধান চাল নয়। বাসন কোসন গয়নাগাঁটি—নয়তো টাকা।

ভাইবোন আরও চালাক হয়েছে। সদর শহরে মহাজন ধরেছে। কত ধুরন্ধরের সঙ্গে ভাবও হয়েছে। ওদিকে পাড়াগাঁর পথে ভিক্ষের ঝুলি কাঁধে ঘুরে বেড়ায় এক সংসারত্যাগী ফকির আর ফকিরনী—গলায় পাথরের মালা আর মনমাতানো সুর। নির্জন দুপুরে সেই সুর আগের মতোই ঘুমঘুম আচ্ছন্নতা আনে।

পয়সাকড়ি জমেছে। তবু অভ্যাস! নেশা ধরে গেছে রক্তে। রাত না চ'রে শান্তি পায় না।

শহরের বস্তি এলাকায় ঘর ভাড়া করে ভাইবোন থাকে। ছেঁড়া, কাঁথার তলায় বমাল। সুযোগমতো গদীতে বেচে আসে। সকাল হলে আবার গঙ্গা পেরিয়ে কাঁহা কাঁহা মুল্লুক—দূরের পাড়াগাঁয়ে।

তেমনি এক গাঁয়ের নাম কুসুমপুর। মকিম মোল্লা সেখানকার বড় চাষী। চারটে মরাই, দু জোড়া হালের বলদ আর জোতজমার মালিক। এক বৃষ্টিঝরা সন্ধ্যাবেলা তার দরজায় অন্ধ ফকির আর এক তরুণী ফকিরনী জোড়াগলায় হাঁক ছেড়েছে—ইয়া হক, মওলা!

বৈঠকখানায় সবে হারিকেন জেলে নামাজ সেরে মোল্লা শণের দড়ি কাটছে ঢেরা ঘুরিয়ে। অভ্যাস। বয়স হয়েছে। তবু গতর চনমন করে। কিছু না কিছু করা চাই। হাঁক শুনে তাকায়। অন্ধ ফকির বলে, সেলামালেকুম! একচক্ষু ফকিরনী হাত তোলে কপালে। আদাব দেয়।

মোল্লা বলে, আলেকুম সেলাম ফকির সাহেব।

রাতটুকুন শোবার ঠাঁই চাই, বাপজান!

মোল্লা ফকিরনীকে দেখে বলে, হুঁ! এটি কে বটে ফকির সাহেব?

ওটা আমার বহিন, বাপজান। আমি দু'চোখে দেখি না, ও এক চোখে। কপাল দেখুন!……ফকির খিলখিল করে হাসে। কী আর করি? ভাইবোনে ভিক্ষেসিক্ষে করে বেড়াই।

মোল্লা বলে, হুঁ। আসমান জোর বর্ষাচ্ছে। এ সময়ে মেহমান এলে ফেরাতে নেই। ঠাঁই পাবে ফকির সাহেব। ফকিরনী চোখে ঝিলিক তুলে বলে, খানাও চাই মোল্লা সাহেব।

পাবে, পাবে। হাত তুলে আশ্বস্ত করে প্রৌঢ় মোল্লা।

সে রাতে ফকিরনী শোবার ঠাঁই পেয়েছে বাড়ির ভেতরে। স্ত্রীলোক সে। স্ত্রীলোকের ইজ্জত আছে। মনে মনে হেসে ফকির বৈঠকখানায় শুয়ে পড়ে। তক্তপোশে কাঁথা ও বালিশ পেয়েছে। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসে। অথচ ঘুমোবার জো নেই। কখন ফকিরনী এসে জাগাবে সেই প্রতীক্ষা। ঝুলির মধ্যে সিঁদ কাঠিতে হাত ভরেই চুপ করে পড়ে আছে সে। চোয়াল শক্ত। অন্ধকারে চোখ জ্বলছে।

মধ্যরাতে বিষ্টি থামল। তারপর গাছের পাতা থেকে টুপটাপ ফোঁটা ঝরে। রাতের পাখি ডানা ঝাপটায়। ঝিঁঝিঁ ডাকে। ফকিরনী আসে অবশেষে। পায়ে হাত রেখে ফিসফিস করে, আয়।

পূর্ব-দক্ষিণ কোণায় বড় ঘরেই মাল আছে। সব দেখা হয়ে গেছে। দেওয়ালের পিছনটা বৃষ্টির ছাঁট পেয়ে নরম হয়ে আছে। সহজেই মাটি খসে যায়। নিপুণ হাতের সিঁদকাঠি চুপিচুপি মাটি খসায়।

তিরিই ঢুকবে ভেতরে। ইস্কাপন মুখ ঘোরাবে। তিরি শাড়ি খুলবে, জামা খুলবে, ন্যাংটা হয়ে ঢুকবে। তেলও মেখে নেবে ঝটপট। একাজে তার তুলনা নেই।

এবং এভাবেই তিরি ঢুকল। ইস্কাপন হুমড়ি খেয়ে গর্তের সামনে বসে আছে।

বসে আছে তো আছেই। কোথায় যেন চাপা শব্দ হল কয়েকবার। তার পর সব চুপ। পা ব্যথা করে। ইস্কাপনের তিরি আসে না।···

আর এল না তিরি।

ভোর হয়ে আসছে। কাক-কোকিল ডাকছে। তিরি এল না। তখন ইস্কাপন উঠল। রাগে ভয়ে দুঃখে কাঁপতে কাঁপতে মাঠের দিকে চলল। নদীতে সবে ঢল নেমেছে। গাঢ় হলদে জলের স্রোত বইছে। সেই ধূসর ভোরবেলায় অনেক কিছু ভাবতে-ভাবতে ইস্কাপন করল কী তিরির কাপড়টা, ব্লাউসটা (ভিক্ষেয় বেরিয়ে সায়া পরে না সে) আর সিঁদ-কাঠিটা নদীতে ডুবিয়ে দিল। তারপর ঘাটের দিকে চলল। খেয়ানৌকায় পার হবে। কোথায় যাবে আর?

শহরেই ফিরবে আপাতত।

এর কিছুদিন পরে ইস্কাপন গদীতে কিছু পুরনো বমাল বেচতে গিয়ে ধরা পড়ে। টিকটিকিরা ওঁৎ পেতে ছিল। ইস্কাপন ফকির এখন জেলে। ছবছরের মেয়াদ।

তিরির চিঠি যায় মাসে মাসে। ভালই আছে। কুসুমপুরও জায়গা ভাল। মকিম মোল্লাও ভাল লোক।

মেয়াদ খেটে ফিরলে আল্লার ইচ্ছায় তুমিও ভাল হয়ে যাবে। বিয়ে শাদি করবে। চিরদিন একরকম থাকা পোষায় না। তিরির চিঠি যায়। আল্লার দয়ায় আমার কোলে সোনার চাঁদ ছেলে হয়েছে। মেয়াদ খেটে এসো। দেখে মন ভরবে। কপালে এত সুখ ছিল ভাবিনি।

ইস্কাপন ক্ষেপে যায়। ইচ্ছে করে—

যাক গে! বোনের তো একটা গতি হয়েছে।

কিন্তু একটা কথা কিছুতেই বুঝতে পারে না। সে রাত্তে ব্যাপারটা ঘটেছিল কী? কী হয়েছিল? হারামজাদী মেয়েটা তা প্রাণ গেলেও যেন বলবে না। আসলে মোল্লা লোকটা অতিশয় ধূর্ত।

ইস্কাপন কপিক্ষেতে বসে চুপিচুপি কাঁদে। পরনে জেলের পোশাক। চুলে সত্যিকার জটা। দাড়ি বুক ভাসিয়েছে। সে স্তব্ধভাবে কাঁদে। হয়তো দুঃখে, হয়তো সুখে।...

শয়তানের চাকা

পাড় পেরোলেই শহর। এখানে দূরের পথ এসে হামাগুড়ি দিতে দিতে গাঙের বালিতে নেমে গেছে। হাত বাড়িয়ে জল ছুঁয়েছে। আশেপাশে কাশ-ঝোপ, করমচা, আকন্দগাছ সন্ন্যাসীর মত কৌপীন-পরা—প্রতি বর্ষার তোড়ে ওদের সংসারের ধস ছেড়েছে ক্রমান্বয়ে। এখন লম্বা চিরোলচিরোল হলুদ বা ধূসর পা বাড়িয়ে দিয়েছে নিচে। খাদের দিকে। ঢালু পথটারও ওই দশা। ইটের টুকরো পাথরকুচি বেরিয়ে পড়েছে উদোম হয়ে। পিচের আবরণ ধুয়ে ভেসে গেছে কবে। তার সামনেই শীতের ঠাণ্ডা আর শান্ত জল। কিনারে পারাপারের খেয়া। তাই বাবুরালি ওরফে বাবরালির বড় কষ্ট হয় রিকশো টেনেটুনে আনতে। ছেড়ে দিলে তো অকাল গঙ্গা বিলক্ষণ; কিন্তু সওয়ারী রুগ্ন। হয়ত তাকেই পাঁজাকোলা করে তুলে নৌকোর পাটাতনে রাখতে হবে। বাড়তি পয়সা দিক বা না দিক, মানুষোচিত অল্প খাটুনি—বাবুরালি আনন্দই পায়। হৃদয়ের কোনখানে ঠাণ্ডালাগা চিরকালের ঘা, সেখানটিতে বেশ তাত পায়।

অন্য অন্য সওয়ারীর বেলা অন্য রকম। ওই উঁচুতে ঘাটবাবুর আটচালার পাশেই রিকশোর 'খেল খতম।' বাবুরালিরই বুলি এটা: খেল খতম দাদা, আসুন। তার মানে, বেশ এতক্ষণ ক'মাইল পথ তো খেল দেখলেন—আসমানের খেল, জমিনের খেল। পথেও রকমারি রঙ-বেরঙের খেল কমতি নেই। তার উপর হাড্ডিসার গতরে আর শামুকখোল পাখির মত দুটি ফাটাফুটি ছাইরঙা পায়ের ওঠাপড়া কসরত কম দেখা হল না দাদাদের। এবার আসুন।...

তারপর নিষ্ঠাবান জাদুকরের মত রিকশোর ছাউনি ঝপ্ করে নামিয়ে নিজেই সওয়ারী কিছুক্ষণ।—এ কিরপাদাদা, মেহেরবানী করে জেরাসে চায় পিলায়ে দে! কৃপাময় বাবুরালিকে ভালবাসে। রানীরঘাট লাইনে এই প্যাডলারটি তার সমসাময়িক। রানীরঘাট যখন জন্মেছিল, তখন থেকেই যে যার নিজের লাইনে রয়েছে। আজ তো রানীরঘাট হাটের মাঝে শোভা মেলেছে। ঝলকে উঠছে সাতরঙা বসনভূষণের ছটা বেলায় বেলায়। কাছে-আসা দূরের পথে পিচ পড়েছে। অজস্র বাস-লরী রিকশোয় আড্ডা গুলজার। রানীরঘাটের সুখ কানায় কানায় উপচে পড়ছে।

সেই সুখেই সুখী বাবুরালি প্যাডলার শহরের সওয়ারী এপারের স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে, ফের স্টেশনের নতুন সওয়ারী নিয়ে কাঁহা কাঁহা মুল্লুক পাড়ি দিতে পারে। ওদিকে ন্যাশনাল হাইওয়ের পথে সাগরদীঘি, এদিকে জেলা বোর্ডের পুরনো লজঝড়্ পথে কান্দী—আরও বিশ-ত্রিশ মাইল যেতে বললেও অক্লেশে উড়ে যাবে। যেতে যত কষ্টই হোক, ফেরার পথে চেঁচিয়ে বলবে—চলো রানীরঘাট, রানীর ঘা-আ-আ-ট! রানীরঘাটে মনটি বাঁধা পড়ে আছে। তাই যেন গানের সুরে ডাক: রানীর ঘা-আ-আট্! ধুয়োতে ফেরা ঘূর্ণিপাক তীব্রতর।

তেমনি এক ফেরার পথেই পেয়ে গিয়েছিল এই সওয়ারীকে। পাশে বটগাছ। তার ছায়ার বাইরে শীতের রোদপোহানো দুটি মেয়েমানুষ। একজন চুলে শণের পাক-ধরা, তোবড়ানো গাল, দড়ি-দড়ি মাস,—অন্যজন মুখের রঙ ফিকে হলুদ, বসা কালো কালো চোখ, লতানো রুক্ষ চুল, খড়ি-খড়ি মিহি হাতে কগাছি লাল প্লাস্টিকের বালা। বিজ্ঞ বাবুরালির বুঝতে দেরি হয় নি, অকালে ব্যাধির ক্ষয় কী সর্বনাশ লিখে দেয় টাটকা গতরে। এই মেয়ে হতে পারত ধানের শীষের মত ডাঁটালো, অল্পেতে অস্থির, মুখে কথার খৈ ফোটে; তা নয় তা. দেখ, সব শুকিয়ে কাঠফাটা ঘোর খরায়। সব চুপচাপ। যেন চিতার চন্দন কাঠখানি পড়ে আছে পথের পাশে।

থেমেছিল বাবুরালি।—এঃ হে হে, বিমারিতে ঘায়েল করেছে, বাসের ভিড়ে বেজায় পেরেসানী হবে মা! আসুন, লিয়ে যাই।

মেঘ না চাইতেই বৃষ্টির ফোঁটা যেন। মড়বড় করে উঠেছে শণচুলো বুড়িমানুষ। হঠাৎ পেয়ে যাবার আনন্দ তো বটেই; শহর থেকে দশ-বারো মাইল দূরে এমন উড়ন্ত সিংহাসন আচমকা মিলে যাওয়া।—অ মা সুরধুনী,

কষ্ট করে গতরখান তোল এট্টু। চাপলেই সোয়াস্তি পাবি—কতক্ষণ থেকে ঠায় অপিক্ষেয় বসে আছি। মুখপোড়া বাসগুলোর গিদেরে পা পড়ে না মাটিতে।...এই বলে বাবুরালির দিকে চেয়ে একটুখানি হাসি। —বাবা আমার ভগবানের দূত। ইচ্ছেমাত্তর এসে পড়েছে!

বাবুরালিও হাসছিল। —আপনাদের মরজি, আর ওপরওলার দোওয়া মাজান! এ লাইনে জিন্দেগী ফুরিয়ে দিলাম চাক্কা ঠেলে।

—অই, সুরি! অ সুরধুনী, শীগগিরি কর বাছা, বেলা বাড়ছে ইদিকে। বুড়ি হাত ধরে মেয়েকে ওঠানোর চেষ্টায়। মেয়ের যেন ভ্রূক্ষেপ নেই। কোনদিকে চোখ বোঝা যায় না। ঈশানকোণে চিনিকলের চোঙ দেখে, না দূরের ঐ শঙ্খচিল—নাকি ফাঁকা মাঠে কয়েকটা অর্জুন গাছের সারি, উপচে-পড়া হলুদ ফসলের উপর তাদের ছায়ার মোটা কালো দাগগুলো।

শেষে অটস্ফুকণ্ঠে কী বলেছে। যাবে, না যাবে না, এইরকম অস্পষ্ট কী একটা। বুড়ির টানাহেঁচড়া সমানে চলছিল।—অই, ও কি কথা মেয়ের! সেই সাত সকালে জাড়ে কাঁপতে কাঁপতে গেরাম থেকে বেরিয়েছি। পাকা সড়কে আসতে জলখাবার বেলা কাবার। যাবিই বা কখন? উদিকে হাসপাতালের দুয়োরে আবার তালাকুলুপ না মেরে দেয়। ওঠ্ মা, ওঠ্!

সুরধুনীর রুগ্ন পাণ্ডুর মুখে অনিচ্ছার ছায়া দুলছে। চোখের তারাদুটো নীলাভ—ধূসর পর্দার ভিতর থেকে আবছায়ার মত পৃথিবীকে যেন দেখছে। সংশয়ের কাঁপন ভেঙে ভেঙে জলের ফোঁটা গুটিকয়। এক কোণে তারা লুকিয়ে আছে—সহজে দেখতে পাওয়া কঠিন। তবু, বাবুরালির দেখছিল। দেখেই বলল,—কোন তকলিফ হবে না মা। ওখানে বড় বড় ডাক্তারবাবুরা আছেন। বেমারী তেনাদের গায়ের হাওয়া লাগলেই পালাবে। তখন শহরে বায়স্কোপের বাজী দেখে হাসতে হাসতে গাঙ পেরোও, ইচ্ছে হলে এই গোনাগার বান্দা বাবুরালির চাক্কায় চাপো, নয়তো ব্রেজোবাবুর ভ্যানগাড়িতে খুশিতে ঘরে ফেরো।

বুড়িও হাসিমুখে মাথা নেড়ে সায় দিচ্ছে। —চাই কি, তখন বিনোটিতে শ্যামচাঁদের মেলা দেখিয়েই নিয়ে আসব। কাল পুন্নিমা গেল, আরেক পুন্নিমা অব্দি ধুমধাম লেগে থাকবে। বাঘ-সিঙ্গি হাতী-ঘোড়ার সার্কেস, মেমসায়েব নাচবে, কত কাণ্ড সেখানে রে সুরি!

সুরির যেন কান নেই। কোনরকমে এতদূর নিয়ে আসা হয়েছে. আর

এগোচ্ছে না, ও যতই লোভ দেখাও। সে তো কচি খুকীটি নয়, মোয়া দেখিয়ে কার্যসিদ্ধি করবে!

বাবুরালি সেটা বুঝতে পারছিল। মেয়েটির সিঁথিতে সিঁদুরের চিহ্ন—অবহেলায় ঘষাঘষা হালকা ছোপ। হাসপাতাল নিয়ে যাবে বলে বুঝি সাতসকালে চুলে চবচবে তেল মাখানো হয়েছে। খোঁপা বাঁধা হয়েছে। বেশ বোঝা যায়, নিজের হাতে চুলবাঁধার ব্যাপার নয়। বুড়ির কীর্তি। বোধ করি, সিঁদুরের দাগও পুরু ছিল—কখন যেন ইচ্ছে করে ঘষে ঘষে তুলেছে। কাপড়ের পাড়ে সেই দগদগে চিহ্ন। কিসের ক্ষোভ? সোয়ামীর উপর মান? তাই বটে। কিন্তু ও মেয়ে, তোমার সোয়ামী কোথা গো?···বলতে না পেরে বাবুরালি আমতা হাসছিল। সওয়ারীর ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলাতে নেই। এ লাইনের সব চাক্কাওলাই জানে, সওয়ারীর সঙ্গে বেশি গা ঘেঁষাঘেঁষি অর্থাৎ সুখ-দুঃখ বিনিময় মাত্রা ছাড়ালে ঠিকে ভাড়ারও কম পয়সা নিতে হবে শেষ অব্দি। এতখানি পথ যার সঙ্গে হৃদয়সংযোগ ঘটেছে, সে পয়সা কমিয়ে হাতে দিলে প্রতিবাদের জোরটাও ফুরিয়ে যায়।

তবু একটা অদম্য ইচ্ছা বাবুরালিকে কাবু করল। বলেই ফেলল—'তা ওগো মাজান, তুমি বুড়োমানুষ, সঙ্গে রুগী আনলে। বরঞ্চ একজনা জোয়ান মানুষ থাকলেই ভালো হত। জামাই এল না কেন মাজান?···বলেই গা বাঁচাতে ফের মন্তব্য করল—তা তিনিই বা আসেন কী করে? গেরামের মানুষ, এখন আবার মাঠঘাটে ফসল উঠছে। বাবুরালি জোরে হাসতে লাগল। —বুঝি বৈকি মাজান, আমিও তো তোমার গে একসময় গেরামে ছিলাম। ক্ষেত ভি ছিল, লেড়কাবালা জরু···

যেন কষ্ট করে কামড়ের শব্দ ভিতরে থামল বাবুরালি। —বহুত দের হয়ে যাচ্ছে, জলদি করো মা।

বুড়ি চেঁচিয়ে উঠল এতক্ষণে। —ন্যাকামি করবার জায়গা পেলি নে সুরি! দোব পটাপট চড় কষে! এখনও হুজ্জতী তোর?···তারপর আচমকা কান্না হাউমাউ করে। —কী পাপে তোকে গবুভে ধরেছিলাম—আমার সারাটা কাল যন্ত্রণার কূলকিনার নাই। হাড়মাস জ্বালিয়ে কালি করে দিলি হারামজাদী! অই—অই জেদই তোর সব্বনাশ কল্লে, সোনার গতরে বেয়াধি ধরল, ফের সেই জেদ এখনও···নে, ওঠ! হাসপাতালে তোকে সঁপে দিয়ে তবে আমার ছুটি···

হুরিও তেমনি কেঁদে উঠেছে সঙ্গে সঙ্গে। আমি যাবো না, যাবো না আমি! গলা টিপে মেরে ফেলো, বিষ এনে দাও, খাই। আমি ওখানে থাকতে পারবো না।

বাবুরালিকে সাক্ষী মানল বুড়ি। আঁচলের খুঁট থেকে একটা কাগজ বের করে বলল—এই দেখ বাবা, চিনাথ ডাক্তার সব নেকে দিয়েছে। বলেছে- হাসপাতালে ওটা দেখালেই চোখ বুজে ভর্তি করে নেবে। কোন কষ্ট হবে না। বলো দিকি বাবা, হাসপাতালে কি মানুষ মরতে যায়, না বাঁচতে যায়? বলো, তুমিই বলো?

কী জবাব দেবে বাবুরালি? শহরের হাসপাতালে কেউ যায় মরতে, কেউ যায় বাঁচতে। অনেক দেখা হয়ে গেছে তার। এমনি রুগী অনেক গেছে সওয়ারী হয়ে। তারা কতজন ফিরেছে, কতজন ফেরে নি—সে খবর তো সে জানে না। বাঁচার আশা সকলেরই থাকে। বাঁচার কথাই ভাবতে হয়। বাবুরালির বলেছে—বেঁচেবত্তে ফিরে এসো মানিক, আমার চাক্কা হামেশা তৈয়ার রইল। সেই চাক্কা শহরফেরা নীরোগ স্বাস্থ্যকে ঘরে পৌছে দিতে গানের সুরে বাজে। চাক্কার ঘুবনপাকে কত মরণ-বাঁচনের সমাচার, পুছ করে দেখ। চাক্কা সব বাত বলবে ঠিকঠিক। সওয়ারী চাপলেই চাক্কার বাত শুনে সব হালহকিকত টের পায় বাবুরালি। রুগী যখন বলে—ফিরে এলে দেখা হবে, বাবুরালি চাক্কাকে পুছ করে। তারপর চুপিচুপি হাসে।

এদিক হুরির নাকিকান্না ক্রমশ বেড়েছে। কথাও বলছে পুটপুট করে—খৈ ফোটার মত। বাবুরালি কান খাড়া করে সমঝে নিচ্ছে। উত্তরের হাওয়া আসছে দূরের শহর থেকে গাঙ পেরিয়ে। ঐ হাওয়ায় শহরের গন্ধ যেন ভাসতে ভাসতে চলেছে দূরের পথে দূরতর দিকে। রানীরঘাটে এতক্ষণে কত সওয়ারীর ঘরে ফেরার সময় হল। গ্রামের চাষাভূষো জোয়ানেরা গত সন্ধ্যায় আড়তে চাল বেচে বায়স্কোপ দেখেছে। তারপর শীতের রাতটা আড়তেই কাটিয়ে দিয়েছে। তাদের ফেরার পালা শুরু। সকালে শহরের বাজারে অল্পস্বল্প কেনাকাটা চুকেবুকে গেছে কখন। ঘাটবাবু পারানির কড়ি গুণছে এতক্ষণ। বস্তায় তাজা ফুলকপি, দু-চারখানা শীতের কাপড়, মনোহারী জিনিসপত্তর। অবিকল দেখতে পাচ্ছে বাবুরালি। স্বাস্থ্য নিয়ে যাওয়া, স্বাস্থ্য নিয়ে ফেরা। যেতে আসতে সমান আনন্দ। আর, এখানে এই সন্নিস্থে!

তো কী আর করা! অবুঝ যুবোজোয়ান মেয়েমানুষ, মুখ খড়িখড়ি, ঠোঁট আমচুর। পাঁকাটি শরীর যেন পটপট করে ভাঙছে গভীর দুঃখে। দেখে কষ্ট

লাগে। তবু বুরি বাত ভাবে না বাবুয়ালি। চাক্কার দিকে তাকায়। বাঁচিয়ে দেবার অস্থিরতায় মনের ভিতরটা আকুপাকু করছে। ফেলে গেলে মনে হয়, বড় গোনাহের কাজ করা হবে।

আলবাৎ হবে। মনের ভিতর মৌলবী যেন হুঁশিয়ারি দিচ্ছে। বেচারী লড়কীটাকে সোয়ামী পোঁছে না ; বিমারির হাল দেখে ছেঁড়া জুতোর মত ফেলে দিয়েছে ঘর থেকে। —তো দেখ মাজান, আদমী বড় নিমকহারাম দুনিয়ায়। যবতক তোমার দৌলত আছে, জওয়ানী আছে, তবতক তুমি একদম আরসির মাফিক রৌশনদার। দুবেলা চেকনাই মুখ দেখবে ঘুরিয়েফিরিয়ে। আরসি কানা, তো হারামজাদা ভি কানা !···হেঁট হয়ে শুকনো ঘাস তুলে দাঁত খুঁটছে বাবুয়ালি। চাক্কার দিকে চোখ। সামনে শীতের হাওয়া ঝাঁপিয়ে আসছে। বুকটা কেমন শুকনো লাগছে। কোথাও হার হয়ে যাবে, এমনি মনে হয় বার বার। আর, মাথার ভিতর—খুবই ভিতর দিকে কী কথা ঘুরপাক খায় ঐ উড়ন্ত শঙ্খচিলের মত। সেই কথা কান্নার সুরে বাজে।

এতক্ষণ হিমের বোধটা ছিল। নাইকুণ্ডলে যেন কুত্তার কাঁইকুঁই ডাক ছিল। কখন থেমেছে। পথের পাশে সমিস্তে— সমিস্তে তাকে আষ্টেপিষ্টে বেঁধে ফেলল কেমন করে।

বুড়ি ইতিমধ্যে অনেক এগিয়েছে। প্রায় টেনে ধরাশায়ী করে রিকশোর পাদানির পাশে এনে ফেলেছে মেয়েকে। মুরি চুল ছিঁড়ে একাকার।—আমাকে যেন ফিরতে না হয় আর ! হে মা গঙ্গা, আমাকে তোমার কোলে টেনে নিও মা······

তাজ্জব। বাবুয়ালি ভেবে পেল না, এত ভয় কেন, কেনই বা এত কান্নাকাটি ! বেমারি হলে মানুষের হুঁশ-আক্কেল থাকে না সত্যি ; কিন্তু এমন তো দেখা যায় না বাবা ! আদিখ্যেতার চূড়ান্ত একেবারে। সে সীটে বসে সামনে ঝুঁকে প্যাডেল ঠেলল। ঠেলতে ঠেলতে বলল—খুস্‌ শালার চাক্কা !

খানিক এগিয়ে বাবুয়ালি বুঝতে পারল, চাক্কা বেজায় নারাজ। বেমারি ঐ সওয়ারীর মত ঘাড় বেঁকিয়ে গোঁ ধরেছে। আরে বাসরে, তুই তো বেটা হাসপাতাল-যাওয়া রুগী নোস্, তুই কিনা তেজী টাট্টু। লে, কদমবাজী করে রানীরঘাটে হাজিরা দে দিকি ; তারপর খানিক আরাম।···এইরকম বলতে বলতে সে দম আনছিল বুকে। ঝাঁপিয়ে পড়ার মত ঝুঁকে-ঝুঁকে প্যাডেল ঠেলছিল। সামনে বুকের উপর যেন দেয়াল তোলা হয়েছে ইতিমধ্যে। গুমগুম

শব্দ ওঠে কোথায়। নাকি বুকের ভিতর? কানে ঝাপটানি দেয় ঠাণ্ডা হাওয়ার থাবা। ঠোঁট শুকিয়ে আরও কাঠ। জিভ দিয়ে চাটতে গেলে থুতুও মেলে না। গলা আঠা-আঠা। হঠাৎ কোনখানে তলে তলে ফুটো করা হয়েছে, আর চুপিচুপি ধসে-পড়ার সুড়সুড়ি—তাই হঠাৎ-হঠাৎ চমকে ওঠা ভয়েডরে। এমন কেন হচ্ছে রে দাদা? এই বাবুরালি প্যাডলার অনেক শীত দেখেছে। অনেক হাওয়ার সঙ্গে লড়েছে। যখন নীল আসমান বরফের চাঁই হয়ে থেকেছে, মাঠের নগ্নতায় অজস্র নেকড়ের মত ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা হাওয়া তোলপাড় করে ফিরেছে, সূর্যকে মনে হয়েছে পটের ছবির মত মিথ্যে, রোদ হয়েছে ফলের খোসার মত রঙসর্বস্ব নীরস ঢাকামাত্র—তখনও বাবুরালির চাক্কা চলেছে অকুতোভয়ে। জমাট রক্ত গলে গেছে সাহসের উষ্ণতায়। চলো রানীরঘাট, রানীর ঘা-আ-আ-ট্!... আজ যেন তামাম জিন্দেগী ঠাণ্ডা হয়ে এল। সামনের পথ সামনেই থেকে যাচ্ছে। রানীরঘাট দূর থেকে দূরতম হয়ে রইল। বাবুরালি দম টেনে বলতে চেষ্টা করল—চলো রানীরঘাট, রানীর ঘা-আ-আ-ট্! অথচ চাক্কা পায়ের সঙ্গে বেইমানি করে। পাশের শিরীষ-কৃষ্ণচূড়ার ধূলিমলিন পাতা কাঁপিয়ে উজান হাওয়া তার উপর লাফ দেয়। বাবুরালি কাতরস্বরে ডাকে—মাজান, পেরেসানী হচ্ছে না তো?

বুড়ি মেয়েকে জড়িয়ে ধরে বসে আছে। চাগিয়ে তুলবার চেষ্টা করেছে, পারে নি। হাওয়ার হিম থেকে বাঁচতে আড়াল দরকার। বুড়ি বলল—ঢাকনাটা তুলে দাও বাবা।

বাবুরালি পিছন ফিরল একবার—পেরেসানী আরও বাড়বে মা, চাক্কা গড়াবে না। গায়ে রোদ লাগাও বরঞ্চ, আরাম পাবে।

বুড়ি গজগজ করল।—আরামের মুখে ঝাঁটা। এমন কষ্ট জানলে রিকশোয় চাপতাম না!

তিন মাইল এগোলে দ্বারকানদীর ব্রীজ। দুস্তর চড়াই খানিক। তবে ব্রীজে উঠলে কিছুক্ষণ আরাম। ওপারে ঢালুতে পোয়াটাক রাস্তা বেশ যাওয়া যাবে। ব্রীজটা দূরে মস্তো সাদা শকুনের মত দেখা যাচ্ছে গাছপালার ফাঁকে। সেই-সময় হঠাৎ ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষল বাবুরালি। বলল—মাজান!

—কী হল?

—চাক্কা চেপে ধরেছে শয়তান, বুঝলে মাজান? বাবুরালি হাসবার চেষ্টা করছিল। —মাঝে মাঝে শয়তান এসে ঐ রকম বদমাইশী করে।

বুড়ি ককিয়ে উঠেছে একেবারে। —সে কি বাবা!

—জী হাঁ। তবে ডর পাবেন না। একটু জিরিয়ে লিই। বিড়ি খেয়ে লিই।

আসলে চেন খসেছে। নেমে এসে পিছনে ঢুকে চেন লাগিয়ে নিল বাবুরালি। তারপর বিড়ি ধরাল। নিঃশব্দে টানতে লাগল। হাওয়াও কেমন বদমাইসী করে দেখ। এখন যেন তাড়া খাবার ভয়ে সরে গেছে। অথচ চাপলেই তখন হুড়মুড় করে ছুটে আসবে।

বুড়ি বলল—একটু তাড়াতাড়ি করো বাবা! অনেক দেরি হয়ে গেল।

গোঁফ মুছে হাসল বাবুরালি। —সবুর, সবুর। হাসপাতাল তো পালিয়ে যাচ্ছে না। ঠিকই পৌঁছে দেব, ভেবো না মাজান। কাঁচাপাকা চুল ঠিকঠাক করে নিল সে। গামছা খুলে ফের জড়াল কানমাথা ঢেকে। ফের গোঁফ মুছে প্রায় লাফ দিয়ে উঠল সীটে। হাঁকল—চলো রানীরঘাট, রানীর ঘা-আ-আ-ট্!

সুরির কোন সাড়া নেই। বুড়ির কোলে উবুড় হয়ে আছে। বুড়ির চোখে মুখে অস্বস্তি। রিকশোয় চেপে বড্ড ভুল করেছে। এত দেরি হচ্ছে, তাতে ঠাণ্ডা বাতাস, মেয়ের অসুখ আবার বাড়বে নির্ঘাত।

ফের চেন পড়েছে দ্বিতীয়বার। বাবুরালি গজগজ করছে—শয়তানটা আজ জ্বালাবে দেখছি।

ব্রীজে আসবার আগেই আরও বারকয় এমনি শয়তানি। বার বার থামা আর গালাগালি—শালা শয়তান, তোর একদিন কি, আমার একদিন···

হাঁফাচ্ছিল বাবুরালি। নামিয়ে দেবে সওয়ারী? এত পেরেসানী আজ —এত ঠাণ্ডা হাওয়া। অথচ চারপাশে রোদের দুনিয়া আসমানে রোশনাই, সামনের স্বপ্নের মত রানীরঘাট বাবুরালির জন্যে অপেক্ষা করে আছে। কিন্তু জেদ্ বেড়ে যাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে। এই রুগ্ন যুব-জোয়ান মেয়েটিকে হাসপাতালে না পৌঁছে দিয়ে ছুটি মিলবে না। পথের মাঝে ফেলে দিলে বড্ড হার হয়ে যাবে, মনে হয়। মনে হয়, মাথার ভিতর কে চুপি চুপি বলে—বাবুরালি, খবরদার! বেইমানি করিস না। সারা জিন্দেগী সওয়ারীর সঙ্গে বেইমানি করিস নি, আজ কেন করবি?

দশ বছর আগে রানীরঘাটের একটি ছোট্ট ঘরে এক রুগ্না আউরত প্রতিদিনই তাকে বলত—আমাকে হাসপাতালে দিয়ে এসো, খোদার কসম লাগে···। সে বলত—একবারও সময় হল না তোমার, হা খোদা! ···সময় হয়নি বাবুরালির।

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সওয়ারীর পথ চেয়ে ছুটোছুটি করছে, ঘরের সওয়ারীকে গাঙ পেরিয়ে হাসপাতালে পৌঁছে দেবার ফুরসৎ পায় নি। ঘরের সওয়ারী নিয়ে যায়; অত সময় কোথা? এদিকে রোজগার বন্ধ হলে তুনিয়া অন্ধকার। বাবুরালি ঘাটে দাঁড়িয়ে হেঁকেছে—আসুন, আসুন, নিয়ে যাই! সওয়ারী না পেলে তাদের অপেক্ষায় সময় খরচ করেছে দরাজ হাতে। অথচ ঘরে বেমারি আউরত কাঁদে। ফিরে এসে বলেছে—আর একবেলা সবুর। ওবেলা ঠিক নিয়ে যাবো। ···যাওয়া হয় নি। বড় ভয়, পাছে মোটা মজুরীর সওয়ারী হাতছাড়া হয়ে যায়।

আসলে কী একটা অভাব ছিল কোথাও। মস্ত ফাঁক ছিল যেন। মুহব্বত মমতার অভাব? ঘরে কি ফুটো ছিল সুখের পাত্রে?···কী ছিল কে জানে শুধু মনে হয় আলসেমি করে জীবনের ধন হেলায় মানুষ খুইয়ে ফেলে শয়তানের চাকায় নিশির টান তাকে ঘর থেকে পথের দিকে টেনেছিল। ঘরের কথা কোনদিনই ভাবে নি। পথের উপর প্যাডেল ঘুরিয়ে দ্রুত ধেয়ে চলাই তার কাছে পরম সুখ মনে হয়েছিল।

সেদিন যেন ঠিক এমনি করে শয়তান চাকা টেনে ধরেছিল।

কতকটা গোঙিয়ে উঠল বাবুরালি—খবর্দার! যেন নিজেকে হুঁশিয়ারি দিল। ব্রীজ সামনে। চড়াই এসে গেল। বাবুরালি নামল সীট থেকে। হাঁফাতে হাঁফাতে হ্যাণ্ডেল ধরে টানতে লাগল ভারী রিকশোটা। কষ্ট দেখে বুড়ি বলল—আমরা খানিকটা নেমে গেলে ভালো হত বাবা। কিন্তু সঙ্গে এই বোঝা···

বাবুরালি একবার পিছু ফিরল মাত্র। চোখদুটো লাল হয়ে উঠেছে। সব রক্ত জমেছে মুখে। ঝুঁকে-ঝুঁকে টানছে। যেন যুগ যুগ ধরে বাবুরালি এমনি করে তার সওয়ারীকে নিয়ে দুস্তর চড়াইপথে চলেছে। সব স্মৃতি ঝাপসা হয়ে আসে। সব মুখ ধূসর হয়ে যায়। পারা-ওঠা আয়নার মত প্রতিবিম্ব অস্পষ্ট। অস্পষ্ট দু-পাশের বাবলা বন, পীচের পথ, ব্রীজের সাদা রেলিঙ। স্বপ্নের মত আবছায়া ভাসে চতুর্দিকে। বাবুরালি মুখ নামিয়ে ঠোঁটটা ঘষে নিতে চেষ্টা করছিল হ্যাণ্ডেলে। শয়তান এবার তার পা-দুটোকেও টানছে। চাকায় জড়িয়ে থেকে হাত বাড়িয়েছে পায়ের পেশীতে।

ব্রীজের উপর কিছু সমতল চত্বর। রিকশোটা একপারে স্থির হয়ে দাঁড়াল। বাবুরালি দাঁড়িয়ে পড়েছে। হ্যাণ্ডেলের উপর মাথাটা রেখেছে।

বুড়ি ডাকল—থামলে কেন বাবা ? বাবুরালি নড়ে না।

—ও বাবা !

বাবুরালি চুপ করে আছে। যেন এখনই মাথা তুলে ব্যস্ত সওয়ারীকে ধমক দেবে—সবুর, সবুর !

বুড়ি একটু উঠে হাত দিয়ে পিঠটা ঠেলে দিল তার—ওগো ছেলে, শুনছ ?

সাড়া নেই দেখে ধড়মড় করে উঠল এবার। সুরধুনীও উঠে ফ্যালফ্যাল তাকাচ্ছে। বুড়ি বাবুরালির কাঁধ ধরে ধাক্কা দিল। —ওগো রিকশোওলা, কী হল তোমার ?

সেইসময় ব্রজ ড্রাইভারের ভ্যান এসে গেছে পিছনে। ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে। চেঁচামেচি শুনে না দাঁড়িয়ে পার নেই।—ও বাবা ডেরাইভার, আমাদের এট্টু তুলে নাও দিকি, মুখপোড়া রিকশোওলা ভিরমি খেয়ে বসে রইল। উদিকে হাসপাতালের দুয়োর বন্ধ হতে চলল···

ব্রজ পানখেকো মোটা মোটা লাল দাঁতে হাসছে। —বাবুরালি না ? শালা মাতালের কাণ্ড ! নেশায় উবুড় হয়ে গেছে বেটা। কই, ওঠ শীগগিরি !

মা-মেয়েকে তুলে নিয়ে ভ্যানটা চলে গেল। বাবুরালির যাওয়া হল কই ? শয়তান চাকার সঙ্গে তাকে চিরকালের মত বেঁধে ফেলেছে।

সাড়ে চার হাত মাটি

এক শীতের সন্ধ্যায় ঠাণ্ডাহিম কুয়াশায় ঢাকা মাঠে ঝাপসা বিবর্ণ চাঁদ কাঁধে নিয়ে ফেরা হাটুরেরা গমক্ষেতে বাবরুকে দেখে বলেছিল, "বুঢ়া, তুমি জাড়ে মরে যাবা হে!" আর বুঢ়া বাবরু তাদের বলেছিল, "জাড় ? তা অনেক জাড় আমার দেখা হয়েছে। ই কী জাড় !"

আসলে বাবরু বলতে চেয়েছিল, এই মাটির দুনিয়ায় সে অনেক শীত এমনি করে কাটিয়েছে। আর সে কী শীত ! যখন কিনা সাপ আর পোকামাকড়েরা মাটির তলায় দীর্ঘ ঘুমের ভেতর নিস্পন্দ হয়ে থাকে, মধ্যরাতের কুয়াশায় চাঁদটাকে মনে হয় ছেঁড়া ন্যাকড়াকানির মতো ফালতু জিনিস আর প্রহর ডাকা শেয়ালেরা মাঝে মাঝে ককিয়ে ওঠা কণ্ঠস্বরে শপথবাক্য আবৃত্তি করে, "আজ যদি বেঁচে থাকি কাল ঘর করব"—পাড়াগেঁয়ে রাখালেরা তাদের এই

আর্ত বাক্যটি ছড়ার সুরে গেয়ে পরিহাসে হি হি করে হাসে। আর সত্যিই সে কী শীত! যখন বুড়ো-বুড়িরা দু'পায়ের ফাঁকে মাটির মালসায় তুষের আগুন রেখে এক পুরনো পৃথিবীর বৃত্তান্ত শোনায় নাতিপুতিদের। বারোয়ারিতলায় কম্বল জড়ানো হারু পঞ্চায়েত বাবুপাড়ায় শোনা কাগজের খবর প্রতিধ্বনিত করে, "বড় হিম আসছে বাবাসকল! আর কেউ বাঁচবে না, পাহাড়ি মুল্লুকে শয়ে শয়ে মরছে—বাবুমশাইরা কাগজে নেকে দিয়েছেন।" আর তাই শুনে খড়কুটো জ্বালানো অগ্নিকুণ্ডের চারপাশে জোড়া-জোড়া আদিম চোখ হলুদ হয়ে যায় আতঙ্কে। কোনও এক প্রাজ্ঞ মোড়ল ঘড়ঘড়ে গলায় বলেও ওঠে, "তাইলে আর কেউ বাঁচবে না হে!" আর তখনই হয়তো মুসলমানপাড়ার বাবরু তার গমক্ষেত থেকে ফিরছে। তার আধন্যাংটো ঢ্যাঙা দেহটি ঈষৎ কুঁজো, যার কারণ এই মাটিরই প্রচণ্ড টান। সে মাটির ভেতরটা ফুঁড়ে সেই রহস্য খুঁজে পেতে চায়, যা কিনা এই দুনিয়াটাকে শস্যবতী করে, এবং বীজকণা থেকে যে বিস্ময়কর রহস্যে উদ্ভিদেরা জেগে উঠে মুখ বাড়ায়, সে তারই তত্ত্বতল্লাশে নিয়ত ব্যগ্র বলেই হুমড়ি খেয়ে বসে থাকে মাটির ওপরে। ঝুঁকে থাকে ভিন্ন এক জোরালো মাধ্যাকর্ষণে, এবং এই করতে গিয়েই তার লম্বাটে মেরুদণ্ডটি ক্রমশ বেঁকে গেছে। হারু পঞ্চায়েতের কণ্ঠস্বরে প্রতিধ্বনিত বাবুদের কাগজের খবর শুনে একটু দাঁড়িয়ে কেশে সাড়া দেয় এবং একটু হেসে বলে যায়, "মোড়লদাদা, কী বুলছ হে? ই কী জাড়! অনেক জাড় আমার দেখা আছে।" আর হারু পঞ্চায়েতমশাই রাগ করে বলে, "তুমি বাবরু তালি, ই বিত্তেন্ত বুঝবা না হে! ঘর যাও।"...

এই ছিল বাবর আলি ওরফে বাবরু, আমাদের ছোট্ট গ্রাম কাঁসুলির এক বুড়ো চাষাভুষো মানুষ। তার কাছেই জেনেছিলাম, আরও এক জগৎ আছে দূরের আকাশে, যেখান থেকে জ্যোৎস্নারাতে পরীর ঝাঁক উড়ে এসে সাতবাউড়ি বিলের জলে সাঁতার কাটে। খিলখিলিয়ে হাসে। আর ভিজে চুলে ফিরে যাবার সময় গমক্ষেতের বুড়ো মানুষটির সঙ্গে মস্করাও করে যায়। বাবরু বলত, 'ওই যে দেখছ আজ বড় লিওর পড়েছে. সে কি তুমি লিওর ভাবছ গো? পরীদের চুলের পানি।' লিওর হল শিশির, এতো জানতাম না। শিশির হল বইতে পড়া 'নীহার'। আমাদের পাশের বড় গ্রাম ইন্দ্রাণীর স্কুলে জমিদারবাড়ির যে ছেলেটি আমার সহপাঠী ছিল, তার নাম ছিল শিশির। একদিন ক্লাসে বাংলার স্যার হরিনাথ 'নীহারবিন্দু'র মানে বোঝাতে গিয়ে শিশিরকে দেখিয়ে বলেছিলেন, ওই

দ্যাখো, মূর্তিমান নীহার বসে আছে। তবে বিন্দু নয়, সিন্ধু।' সারা ক্লাস হেসে খুন।

সে আলাদা গল্প। আমি বাবরুর গল্পই বলতে চাইছি। তবে শিশিরও এর সঙ্গে ভীষণভাবে জড়িয়ে আছে। তাদের আলাদা করা যায় না।

কাঁসুলি থেকে মাঠের পথে ইন্দ্রাণীর স্কুলে যেতে আমি পাখিওড়া দূরত্বই বেছে নিতাম। চষা ক্ষেত, কাঁদর, জলকাদা আর উলুকাশের জঙ্গল এসব কোনও বাধা ছিল না আমার কাছে। আর ওইরকম গতিপথের দরুন রোজই দেখা হয়ে যেত বাবরুর সঙ্গে। তার কোনও ছেলেপুলে ছিল না। তার বউয়ের ছেলেপুলে বাঁচত না। শেষবার বিয়োতে গিয়েই সে নাকি মারা পড়ে। বাবরুর মাটির দিকে মুখ ফেরানোর এও একটা কারণ হতে পারে। সে তার অল্প কয়েকটুকরো নাবাল মাটির ভুঁই নিয়েই জীবন কাটাচ্ছিল। তখন আমার বছর-বারো বয়স। পৃথিবীর কিছু-কিছু সত্যাসত্য আঁচ করতে পারলেও বাবরুর মুখোমুখি হলেই কী একটা আমূল রদবদল ঘটে যেত আমার ভেতর। হাঁটু ভেঙে সে যখন ফসলের গাঢ় বর্ণালী থেকে মুখ তুলত, গায়ে কাঁটা দিত। এ কাকে দেখছি? এ কি মানুষ? এ কী মানুষ! মনে হত, অবিকল দেখতে পাচ্ছি, ওর হাঁটুর নিচে থেকে শেকড়বাকড়ের আঁকুর গজিয়েছে, তার সাদা চুলে চৈত্রের ভাঁড়লে ফুলের বিস্ফোরণ—যা সাদা রেশমি তুলো উড়িয়ে নিয়ে যায় আর ঘূর্ণিহাওয়া তক্ষুণি কুড়িয়ে নিয়ে পাগুড়ি বেঁধে ব্যস্তভাবে গাঁওয়ালে যেতে থাকে মাঠ পেরিয়ে। মনে হত, তার ঢ্যাঙা, কুঁজো শরীর জুড়ে গজিয়ে উঠেছে শ্যাওলা। আর ছত্রাকের মতো তার না-ভাঙা ধূসর দাঁতের প্রাকৃতিক সেই হাসি! আর সে কাছে ডেকে পুরনো পৃথিবীর আদিম বৃত্তান্ত শুনিয়ে ছাড়ত। তখন পৃথিবীর সদ্যচেনা সেই সত্যাসত্যগুলি বড় নিষ্ফল হয়ে যেত তার মুখোমুখি গিয়ে। টের পেতাম জীবজগতের ভেতর দিকটাতে তার নিয়মিত গতিবিধি এবং পাখি, পোকামাকড়, পশু ও উদ্ভিদের গোপন রহস্যময় খবর সে জেনে ফেলেছে। তার শরীরে পেতাম পাখির বাসার খড়কুটোর গন্ধ। সাতবাউড়ির বিলের জল বর্ষায় উপচে এসে তার ভুঁইগুলি ডুবিয়ে দিলে তখন সে বাধ্য হয়ে মানুষের পৃথিবীতে ফিরে আসত। করুণ মুখে বাবাকে বলত, 'ছান না একখানা পিটিশান নেকে নবাববাহাদুরকে।'

তখন ইংরেজ আমল। মহালের মালিক ছিলেন মুর্শিদাবাদের নবাববাহাদুর। নাবাল এলাকায় নদীর অববাহিকায় চাষীরা নিজেরাই বাঁধ বেঁধে-বেঁধে হন্যে হয়ে যেত। প্রতিবছর কোথাও-না-কোথাও বাঁধ ভাঙতই, আর বাবরুর মতো লোকেরা নবাববাহাদুরের কাছে পিটিশন পাঠাত।

তো এই বাবরুকে পরে দেখতাম গ্রামের গোরস্তানে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চমকে উঠতাম। ওখানে আবার কী করছে সে? সে কি এবার মৃতদের ভেতর পৌঁছানোর চেষ্টা করছে? জীবজগতের সব খবর জানার পর এ বুঝি তার ভিন্ন এক তত্ত্বতল্লাশ। তখন আমিও কৈশোর-যৌবনের সন্ধিকালে পৌঁছেছি। এক দুপুরে তাকে গোরস্তানে শিমুল গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কাছে গেলাম। আমার ডাক শুনে সে বিষণ্ণ একটু হাসল। তারপর সাদা চুলদাড়ি নেড়ে বলল, "পসন্দ হল না বাছা!"

"কী পছন্দ হল না বাবরু?"

বাবরু আস্তে বলল, "কবরের জায়গা।"

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলাম তার দিকে। অথচ অবাক হওয়ার কোনও কারণ ছিল না। এটা তো চিরদিন মুসলিমদের একটা প্রথার মতনই, বুড়ো হয়ে গেলে লাঠি ঠুক ঠুক করে গোরস্তানে গিয়ে কবরের ঠাঁই বেছে রাখা। কিন্তু কেন বাবরু কবরের ঠাঁই ঠিক করতে এসেছে? সে কি মৃত্যুর পায়ের সাড়া পেয়ে গেছে? বিশ্বাস হয় না। সে তখনও নাবাল মাটির ক্ষেত্রে আসন্ধ্যা খাটে। মাথায় করে খড় বা বিচুলি বয়ে আনে। অবরে-সবরে অন্য লোকের মুনিশও খাটে। খাটতে পারে। তার শরীরটি তখনও মজবুত। আমি বললাম, "কেন তুমি কবরের জায়গা খুঁজে বেড়াচ্ছ, বাবরু?"

বাবরু শ্বাস ফেলে বলল, "বয়েস তো কম হল না গো! তাই শোবার জাগাটুকুন ঠিক কত্তে এসেছিলাম। তো কথা কী, যেখানটা যাচ্ছি সেখানেই দেখি কোন-না-কোন শালাব্যাটা শুয়ে আছে!"

হেসে ফেললাম। "তা তো থাকবেই! তুমি কি শোন নি, মৌলবিসায়েবরা বলেন, দুনিয়া ধ্বংস হলে প্রতি কবর থেকে সত্তর হাজার করে মানুষ উঠে হাশরের ময়দানে গিয়ে দাঁড়াবে আর খোদা তাদের বিচার করবেন?"

বাবরু আরও আস্তে বলল, "শুনেছি।"

"তাহলে?"

বাবরু জোরে মাথা নেড়ে বলল, "সেটা কথা লয়গো! এই গোরস্তানের

কথা লয়গো ! এই গোরস্তানের যেখানটা যাচ্ছি, সেখানেই দেখি এমন লোকের কবর আছে, তাদের আমার পসন্দ হয় না।" বলে আঙুল তুলে বনতুলসীর ঝাড়ের দিকটা দেখাল। "ঢুঁড়ে ঢুঁড়ে ওখানটা পসন্দ হল। তো মনে পড়ে গেল, উখানে শালীবিটি শুয়ে আছে—তুমি দেখনি তাকে, বড্ড পাড়াকুঁদুলি ছিল। বনবে না।"

হাসি চেপে বললাম, "তাহলে এক কাজ করো। তোমার বিলের জমিতে—"

দ্রুত কথা কেড়ে বাবরু বলল, "সেটাই তো ইচ্ছে ছিলো গো ! সেখানে শুতে পেলে শান্তি হত মোনে। কিন্তুক, আর তো তার যো নাই বাবা !"

"কেন ?"

বাবরু তাকাল। একটু পরে শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, "চেরটাকাল ভাবতাম, ভুঁইয়ে যদি হঠাৎ মরণ হয়, যেন আমাকে সেখানেই কবর দেয়। কিন্তুক আর তো একটুকুনও ভুঁই নাই, বাবা।"

"সে কী !" চমকে উঠে বললাম। "বেচে ফেলেছ নাকি ?"

বাবরু ম্লান হাসল। "বছর বছর ডুবে যায়। যেটুকুন চৈতেলি হয়, বেচে খাজনার টাকাও হয় না। শেষে ইস্তফা দিয়ে এলাম লায়েববাবুকে।"

সে আমলে নদীর অববাহিকায় নাবাল আর জঙ্গুলে জমি সামান্য সেলামিতে বছরওয়ারি বন্দোবস্ত করার প্রথা ছিল। বছরসন খাজনা না দিলেই বেজে উঠত নিলামের ঢোল। বন্যার পর বন্যায় বিপর্যস্ত চাষী বাধ্য হয়ে 'ইস্তফাপত্র' লিখে দিত কাছারিতে। এর ফলে সে অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের হাত থেকে নিস্তার পেত।

তো সেদিন বিষণ্ণ বাবরুর কথা শুনে চমকে উঠলেও তার কবরের জায়গা খোঁজার ব্যাপারটা ভারি হাস্যকর মনে হচ্ছিল। হাসতে হাসতে বলেছিলাম, "বেশ তো ! তাহলে বলাইহাজির মতো তুমি বরং নিজের বাড়ির উঠোনেই কবর দিও নিজেকে।"

বাবরু আবার আমাকে চমকে দিয়ে বলেছিল, "ভিটেটুকুনও তো বাঁধা আছে দেনার দায়ে। কবে দেনা করে খেয়েছিল আমার বাবা। পঙ্কুবাবুর খাতায় সে দেনা শোধই হয় না—শোধই হয় না। শেষে মকবুল দফাদারকে বন্ধক দিয়ে সে দেনা শুধলাম। ইদিকে মকবুল করাড়ে বন্দক নেকে লিয়েছে—পাঁচবছরে টাকা না দিলে ভিটের মালিক হবে।"

'করার' হল 'ইকরারনামা', সেটা অনেক পরে জেনেছিলাম। ইংরেজ আমলেও মুসলিম শাসনকালের অসংখ্য রীতি প্রচলিত ছিল। আর 'প্রান্তিক-চাষীও' যে আরো প্রান্তিক চাষীর মাংসভোজী, এবং তথাকথিত জোতদারদের চেয়ে কম যায় না, সেটা জানতে তো আরও দেরি হওয়ার কথা। আসলে প্রতিটি গ্রামীণ মানুষই মাটিখেকো রাক্ষস। তো আমার সহপাঠী শিশিরের কথা বলেছি। কলেজেও দুজনে সহপাঠী ছিলাম। কলেজে ঢোকার বছরই দেশ স্বাধীন ও বিভক্ত হয়েছিল। পাস করার পর আমি চাকরির জন্য যখন হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছি, তখন শিশির সাতবাউড়ির বিলের নাবাল মাটিতে কৃষিখামার গড়ে তুলেছে। টেস্ট রিলিফের বদান্যতায় পাকাপোক্ত বাঁধ হয়েছে নদীর কিনারায়। চাষীদের ইস্তফা দেওয়া সব জমি জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের হিড়িকে শিশিরের বাবা নামমাত্র সেলামিতে নবাববাহাদুরের কাছারি থেকে বিক্রিকবলা দলিলে কিনে ফেলেছেন। তাঁর নিজের জমিদারিটির পরিধি ছিল যৎকিঞ্চিৎ। গ্রাজুয়েট ছেলেকে 'মর্ডানাইজড এগ্রিকালচারে' নামিয়ে দিয়েছেন বুদ্ধিমান পিতা। সাতবাউড়ির অনাবাদী মাঠে উলুকাশের জঙ্গল ছত্রখান করে ফেলেছে ট্রাক্টরের দাঁত। একপ্রান্তে শিশিরের 'ক্যাম্প।' সেই ক্যাম্পে একদিন আমন্ত্রণ পেলাম শিশিরের।

চিনতে পারছিলাম না সেই রহস্যময় ছেলেবেলার আরও রহস্যময় ভূখণ্ডকে, যেখানে গমের ক্ষেতে হুমড়ি খেয়ে বসে এক বুড়ো চাষা মাটির অলৌকিককে ঢুঁড়ে হন্যে হত, মুহুর্মুহু বিস্মিত হতে-হতে প্রাণরহস্যের তত্ত্বতল্লাস করত। আর কোথায় সে পরীর ঝাঁক-নামা অথৈ স্বাধীনতাময় বিলের জল? আর সেখানে পরীদের অবগাহনের যো নেই। মাছের ঘেরি ঘিরে টাঙ্গি-বল্লম হাতে দিনভর রাতভর পাহারা দিচ্ছে এলাকার দুর্ধর্ষ খুনেরা—শিশির যাদের মাথা কিনে ফেলেছে। গরিবগুরবো মাঠ-বিলকুড়ুনি মেয়েরা আর শাক তুলতে গুগলি শামুক সংগ্রহে পা বাড়ায় না তাদের ভয়ে। আদিগন্ত শরৎকালীন সবুজ ধানক্ষেতে সব প্রাকৃতিক স্বাধীনতা ফর্দাফাঁই। এই কি তাহলে অসীমকে সীমায় বাঁধা? এই কি তাহলে মানুষের ঐতিহাসিক শক্তির সেই দক্ষতা, যা দিয়ে যুগে যুগে পৃথিবীর রূপ বদলে যায়? আমি কি প্রশংসা করব, না নিন্দা করব? আনন্দিত হব না বিষণ্ণ?

তবে এ তো ঠিকই যে, মানুষ পৃথিবীর রূপ বদলে দেয়, দিতে পারে। মানুষই রূপকার। পৃথিবীকে যুগে-যুগে নানান রূপে যারা সাজায়, স্থাপত্যে কী ভাস্কর্যে কী শিল্পকলায়—কিংবা এইসব বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র আঁকে যারা, তাদের সবাই-ই তো রূপকার।

আর ঠিক এই কথাটা ভাবতেই মনে পড়ল বাবরুর কথা। আরে তাই তো। বাবরুও তো ছিল এক রূপকার, যে নিজের মাটিতেই যথার্থ শিল্পীর মতো অহঙ্কারে ও স্বাধীনতাবোধে মৃত্যুর পর শুয়ে থাকতে চেয়েছিল! কোথায় সে?

তারপরই হঠাৎ তাকে দেখতে পেলাম। ফার্মের জমিতে সারবদ্ধ নিড়ান-রত মুনিশদের ভেতর সাদা মাথাটিকে দেখেই চিনতে পারলাম। শিশিরকে বললাম, "ওই লোকটা বাবরু না?"

শিশির বলল, "হ্যাঁ। ঠিক চিনেছিস।"

"ও এখনও বেঁচে আছে, ভাবা যায় না রে।"

শিশির হাসল। তার পায়ে গামবুট। পরনে প্যাণ্টশার্ট, মাথায় বিলিতি টুপি। সে সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বলল, "বুড়োটা মাইরি বদ্ধপাগল! বুড়ো হলেও খাটে প্রচণ্ড। কিন্তু সবসময় ওর ওই এক ধুয়ো, কথাটা মনে আছে তো বাবুমশাই? অতিষ্ঠ করে ছাড়ে একেবারে।"

জিগ্যেস করলাম, "কী কথা রে?"

শিশির তেতো মুখে বলল, "আচ্ছা তুই কল্পনা কর, এই ফার্মের জমিতে একটা জায়গায় লোকটা—ওই যে দেখছিস, একটা লাঠি পুঁতে রেখেছে। বলে ওখানে নাকি ওর জমি ছিল, ও মারা গেলে যেন ওখানে ওকে কবর দেওয়া হয়।"

মাথার ভেতর ঝড়ের ঝাপটানি টের পেলাম। সব মনে পড়ে গেল। চুপচাপ সিগারেট টানতে থাকলাম। ইচ্ছে হল, বলি, কেন একজন যথার্থ শিল্পী তার নিজের মাটিতে শুতে পারবে না—কিন্তু শিশিরকে সেকথা বোঝানো নিরর্থক।

সে একই ভঙ্গীতে ফের বলে উঠল, "রাগ করিস না—আমাকে সাম্প্রদায়িক ভাবিস না। তুই তো জানিস, আমি কী! কিন্তু আমি যদি মুসলমানও হতাম, আমার ফার্মের জমিতে একজনের কবর দেওয়া কি সম্ভব হত আমার পক্ষে? তুই বল্। কবরের জন্য গ্রামে কবরখানা আছে। এখানে কেন বাবা?"

কিছুক্ষণ পরে ক্যাম্পখাটে বসে হুইস্কির গেলাসে চুমুক দিচ্ছি, সামনে সাদা

চুলদাড়ি নিয়ে হাড়জিরজিরে আধন্যাংটো কুঁজো একটি লোক এসে সেলাম দিয়ে দাঁড়াল। তারপর ডাকল, "বাবুমশাই!"

শিশির জড়ানো গলায় বলল, "কী বাবা? মজুরি নেবে তো এখানে কেন? ভুলুবাবুর কাছে যাও। ওই ভ্যাখো, ভুলুবাবু বসে আছে।"

বললাম, "কী বাবরু? চিনতে পারছো?"

বাবরু আমার দিকে তাকাল না। শিশিরের উদ্দেশে কাতর ভঙ্গীতে বলল, "বাবুমশাই!"

শিশির মিটিমিটি হেসে বলল, "কী?"

বাবরু বলল, "কথাটো মোনে আছে তো বাবুমশাই? পয়সা লয়, কিছু লয়—খালি সাড়ে চারহাত মাটি বাবুমশাই—আপনার পায়ে ধরি। সাড়ে তিন হাতেই চলত। তবে কিনা মাথার পেছনে আধহাত পায়ের পেছনে আধহাত জায়গা লাগবে। ক্যান কী, দুদিকে দুই ফেরেশতা এসে দাঁড়াবে। তেনাদেরও জায়গা চাই।"

শিশিরের এক প্রহরী বাবরুকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে গেল। আর সেই মুহূর্তে একটা ঘৃণা আমাকে পেয়ে বসল। শিশিরকে ঘৃণা? বাবরুকে ঘৃণা—তার এই অদ্ভুত জেদের জন্য? কিংবা পৃথিবীটাকেই ঘৃণা?

জানি না। সব কিছুকে, এমন কী নিজেকেও ঘৃণা করার জন্য আমি হুইস্কির বোতল শেষ করে দিচ্ছিলাম।...

একটু উপসংহার আছে।

সে-বছর সেই শরতেই নদীর উজানে পঞ্চবার্ষিক যোজনার অনবদ্য কীর্তি একটি ড্যামের অবস্থা বিপন্ন দেখে তার সবগুলি দরজা খুলে দেওয়া হয় এবং সারা মহকুমায় নাবাল অঞ্চল আচমকা ভেসে উজাড় হয়ে যায়। শিশিরের ফার্মও ভেসে গিয়েছিল। তার কৃষিযন্ত্রপাতি বহু দূরে একে একে উদ্ধার করা হয়। সদ্য রাশিয়া থেকে আনা হার্ভেস্টার কম্বাইনটি তিনমাইল দূরের রেললাইনে গিয়ে আটকে ছিল। বানের জল নেমে গেলে সেটিও উদ্ধার করা হয়।

কিন্তু তার চেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল একটি প্রকাণ্ড হিজলগাছের কোটরে আটকে থাকা একটি কংকাল, শেয়াল-শকুনের ভুক্তাবশেষ।

ইন্দ্রাণী স্কুলের ময়দানে ত্রাণশিবিরে যখন ওই কংকালটি নিয়ে জল্পনা হচ্ছে, একবার জিগ্যেস করেছিলাম, "কংকালের শিরদাঁড়াটি কি বাঁকা ছিল?"

আমার এই অত্যদ্ভুত প্রশ্নে শিবিরে অট্টহাসির ধুম পড়ে গেল। শুধু কর্মক্লান্ত, ব্যতিব্যস্ত নিরন্তর অভিযোগের চোটে বিপর্যস্ত উন্নয়ন অফিসার মুখ তেতো করে বলে উঠলেন, "ধুর মশাই! স্কেলিটনের আবার সিধে বাঁকা কী? স্কেলিটন ইজ স্কেলিটন। পিস বাই পিস বোন।"...

তাহলে বাবরু শেষ পর্যন্ত মাটি পেল না! কেন পেল না বাবরু? সে তো মাটিকে ভালবাসত। মাটির গন্ধ শুঁকে আবিষ্ট চোখে পৃথিবীকে দেখত। তবু সে মাটি পেল না কেন? বেশি নয়, মাত্র সাড়ে চার হাত মাটি!

বৃষ্টিতে দাবানল

সেবার শরতে বনকাপাসিতে তিন দিন ধরে বৃষ্টি। বাউরিপাড়ার ক্ষেতমজুর নারাং (নারায়ণ>নারাণ)। একদিনের বৃষ্টিতেই বেকার এবং দ্বিতীয় দিন ক্ষুধার্ত হল। তার বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। ঢ্যাঙা, হাল্কা গড়ন, তামাটে রং, চৌকো চোয়াল, ছোট চুল, লম্বা নাক, চেরা চোখ, পাঁজরে কাঠি-কাঠি দাগ, আর চাঁছা পেট। এই নারাং বাঁজা ডাঙায় ভুঁইফোড় এক তাল গাছের মতো একলা। খুব সহজে তাকে চোখে পড়ে। এই নারাং দুবার দোকলা হবার চেষ্টা করেছিল। প্রথমবার বউটার খাওয়া দেখে দুঃখিত হয়ে নানান অছিলায় তাড়িয়ে দিয়েছিল। দ্বিতীয়বার বউটা কম খেত, কিন্তু চাউনিটা ও শরীলটা ছিল ভীষণ পিচ্ছিল এবং পিছলে যাবে-যাবে করতে-করতেই ছোট্ট স্টেশন বনকাপাসির সিগন্যালম্যান গোবরার সঙ্গে ভাগল। দুবারের দুঃখ নারাংকে আর বউমুখো করেনি।

এই বৃষ্টির নাম টিপটিপানি, আবহাওয়ার নাম গাজোল। আকাশ নির্ভাঁজ মেঘে ঢাকা, হাওয়া নেই। তাই বৃষ্টির ফোঁটা সোজাসুজি পড়ছে। যদি হাওয়া দিত এবং ফোঁটাগুলো একটু কাত হয়ে পড়ত, নারাংয়ের দাওয়ার মাটি অনেকটা ভিজত, তাহলে এই আবহাওয়ার নাম হত ডাওর। ডাওর বাড়লে তার নাম ঝাঁপি। সে খুব ভয়ঙ্কর।

ভয়ঙ্কর হলেও ঝাঁপিতে নারাংয়ের সুদিন। গাছ ভাঙে। সে ডালপালা

কুড়োয় এবং রোদ উঠলে বেচতে যায়। ঘর ধসে পড়ে। তাই সে কাজ পায় আর ডাওরেও নারাংয়ের মন্দ হয় না। পুকুর ভাসাভাসিতে মাছ ধরে বেচে লোকের গরুছাগলের জন্যে পাতা কেটে দেয় এবং চালডাল পায়। কিং গাজোল—গাজোলে ঝিমঝিম ভাব, আলস্য, যার বউ আছে সে গলা ধরে শুে থাকে। নারাংয়ের নেই!

নারাং স্টেশনে গেল প্রথমে। পর-পর দুটো রেলগাড়ি দেখল, মোট পে না। ছোট লাইনের ছোট গাড়ি। স্টেশন ছোট। একটা মোটে চা-বিড়ি দোকান আছে। পিছনে সামনে ডাইনে ফাঁকা মাঠ। ঝাঁপ ফেলে শুে গেছে। স্টেশনবাবুও আস্তে আস্তে কোয়ার্টারে গিয়ে দরজা বন্ধ করল সিগন্যালম্যান নবা শুওরের পাল ডাকিয়ে বউয়ের দিকে কেমন চোখে তাকাল নারাং সব দেখল।

দুজন যাত্রী নেমেছিল। তারা ছাতার তলায় কথা বলতে বলতে এগোল নারাং তাদের পিছন-পিছন এসে শুনল খিচুড়ি, মাংস এবং বউয়ের গল্প হচ্ছে সে আরও মনমরা হয়ে গেল। গায়ে টিপটিপ বৃষ্টি, ভেতরদিকে জ্বরভা নাইকুণ্ডলে প্রাচীন খেঁকি কেঁউ কেঁউ করছে. সে মনে মনে বলল—ও কিছু ন ও কিছু না!

গাঁয়ে ফিরে বারোয়ারিতলায় একবার দাঁড়াল নারাং। মাথার ওপর তি পুরুষের বট। পাকা ফল লাল টুকটুকে, মাটিতে পড়ে ছেৎরে গুঁড়োগুঁড়ে হয়েছে এবং সিমেন্টের চত্বরটা যেন বুড়ো বটেরই গুয়েমুতে একাকার। আ ডালপালার পাখপাখালিরও এই গাজোলজনিত আলস্য, ফলে ঠোকরাতে ঠো ওঠে না। গুম হয়ে বসে আছে, পাখি পাখিনীর পাশে। হায় নারাং, এ গাজোলে তোর কেউ নেই।

নারাং আশা নিয়ে ঘুরে শংকরার কামারশালের দিকে তাকিয়েই আশা মুখে পেচ্ছাপ করে দেয়। চোয়াল আঁটো হয়। মগজ রিরি করে। কার কামারের ঝাঁপ বন্ধ. হাপর টানার কাজটুকুও জুটল না, এবং শংকরার যুবতী ব মাথায় গামছা ঢেকে পা টিপেটিপে পুকুরঘাটে গেল। বউটার দলদলে গতর, পাছ টলছে; ঠোঁটে কী হাসি, এবং সামনাসামনি ঘাটে নেমেই সাঁতার দিতে থাকল।

নারাং দাঁড়িয়ে থাকে। কতক্ষণ পরে সেই বউটি ভিজে কাপড়ের মারাত্মক শব্দ করতে করতে নারাংয়ের পাশ দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ ঘুরে কেন ফিক কে হেসে যায়। বারোয়ারি বটতলায় অমনি মার মার শব্দে বজ্রপাত হল।

কাতর নারাং জলতে জলতে সেখপাড়ায় গেল। হৈদর মণ্ডলের ছেলে হৈবর বাড়ির সামনেকার ছোট্ট ফাঁকা জায়গা 'লাছ' (লন) থেকে তালপাতার ছাতা মাথায় দিয়ে কাকে যেন ডাকছে। নারাং দেখল, ওপাশের গোয়ালঘরের দেয়ালে হৈবরের বউ শুকনো গোবর-চাপড়ি ছাড়াচ্ছে কাস্তে দিয়ে এবং তার ডাঁটালো হাতের চুড়ি বাজছে, স্তনদুটো ভীষণ দুলছে, পাছা নড়ছে। হৈবর ডাকছে। এখন কি কাজের সময় ?

গরু ছাগলের জন্যে পাতা লাগবে নাকি আর শুধোনি হল না নারাংয়ের। এ এক আশ্চর্য সময়, এই গাজোল। এখন কিসের কাজ ?

'তিনদিনকার গাজোলে
মহিষ খ্যাপে হিজোলে
উকুন খ্যাপে মাথায়
টিকটিকিরা বাতায়…'

পরের লাইন লেখার যোগ্য নয়। আর বড় সরল মানুষ বনকাপাসির এই নারাং। লাজুক, অশৌখীন, নীরব শ্রমিক। মেয়েদের দিকে চোখ তুলে কথা বলতেই পারে না। সে তখন মাটিতে চোখ ফেলে এই নৈসর্গিক নাছোড়বান্দা উপদ্রব থেকে বাঁচার জন্যে হাঁটতে শুরু করল—দিশাহারা ও ভূতগ্রস্ত।

এরপর যখন সে তাঁতিপাড়ায় ঢুকেছে, আচমকা কার হাতের মাকু বন্ধ হল। অমনি একটা মেয়েলী খিলখিল হাসি বিদ্যুতের মতো দেয়ালের ওপারে ঝলসে উঠে আবার বজ্রপাত। নারাংয়ের মনে হল, সে দেখতে পাচ্ছে বাঁজা ডাঙার এক ঢ্যাঙা তালগাছের মাথা দাউদাউ জলছে। তারপরই স্তব্ধতা। এবং স্তব্ধতার ওপর বৃষ্টির টিপটিপানি মাকড়সার জাল দিয়ে নারাংয়ের মতো মানুষের বিশাল লজ্জা দ্রুত ঢেকে ফেলছে। চতুর্দিকে ধূসরতা। কিছু চোখে পড়ে না আর। নাকি পড়ে, বাঁজাডাঙার একলা তালগাছের মাথায় দাউদাউ আগুন।

অগত্যা নারাং ফিক করে হাসল। 'তাঁত বোনাবুনি মাকু চালাচালি··· তাঁত বোনাবুনি মাকু চালাচালি···। তাঁতির পাছায় লাল সুতো···তাঁতিনের মাথায় গামছা।'···

আর সেই সময় সল্লা দাইয়ের হাতে নতুন সরাঢাকা হাঁড়ি, হাতে কঞ্চি, কঞ্চি নাড়তে নাড়তে সে চেরা গলায় হাঁক দিচ্ছে : ধুল ফু-উ-ল, ধূ-ল-ল ফুল ! বাবাবাছারা মায়েরা দিদিরা সোনামুখীরা ! সরে-সরে যাও, সরে-সরে-এ-এ ! রাস্তা খাঁ খাঁ সুমসাম। লোকজন থাকলে তো সরবে। আর নারাং, নারাং

এখন লোকও নয় জনও নয়। দাউদাউ জলা ঢ্যাঙা তালগাছ। বনকাপাসিতে এই গাজোলে কে জন্মাল, তার ঠাহর নেই।

—ও নারাং, ও মুখপোড়া! বলি, সরবি না মরবি? হাঁক থামিয়ে সল্লা হেসে-হেসে বলে। কঞ্চি নাড়ে।

নারাং নড়ে না। কাদায় গোঁজের মতো দাঁড়িয়ে সরলার দিকে তাকিয়ে থাকে। তার কতটুকু পোঁতা আছে, নিজেই বুঝতে পারে না। নিজেকে ওপড়াতে যথাশক্তি টানাটানি করে।

—মিনসের বাওরের ডর নেই! ও মা, আমার কী হবে! সল্লা আবার হাসে। হাসতে হাসতে বলে আবার—নিনেংটে ডাকার আবার বাওর! বাওর (মন্দবায়ু) ছোঁবে না!

নারাং মনে মনে জবাব দেয়—আমি যদি ডাকা, সল্লা ডাকিনী।

কাছে এসে সল্লা দাই কঞ্চিটা মারার ভান করে নিজের কাজে এগোয়। নিজের মনে কথা বলে—কারণ, আধখেপী স্ত্রীলোক! আপনমনে রাস্তায় কথা বলা অভ্যেস আছে। লোক না পেলে গাছের সঙ্গে, ইতর প্রাণীর সঙ্গে, এমন কি আকাশের সঙ্গেও কথা সে বলে। সল্লার (সরলার) অনেক কথা। সল্লা বলতে বলতে যায়: মাস্টারের বউয়ের আর কাজ ছিল না! এই গাজোলেই বিয়োলি। হুঁ, এখন মজা করে কিনা মাস্টার মশায়ের গলা ধরে শুবি। খ্যাপা-খ্যাপতোর (ক্ষিপ্ততার) সময়, এই গাজোল!

এবং সে ফিক ফিক করে হাসে। পিছু ফিরে দেখে না পিছনে বজ্রাহত তালগাছ।

এই সল্লার বয়স বত্রিশ-পঁয়ত্রিশের মধ্যে। রোগা গড়ন। গুনতুটো চিমসে। ময়লা রং। খসখসে চামড়া। সব ঋতুতেই ঘামাচি হয়। ঘুঁটে হাতে আন-বাড়ি আগুন আনতে গিয়ে সেই ঘুঁটে দিয়ে গা চুলকোয়। বুক সম্পর্কে প্রচলিত লজ্জা তার নেই। কিন্তু তার মুখখানি সুন্দর। সরু নাক, চেরা চোখ পিঙ্গলবর্ণ, কপাল চওড়া বা টিপ্‌ কপালী, ঘন কালো চুল আছে মাথায়। দীঘির একবুক জলে সিঙাড়া বা পানিফল তুলতে তুলতে একবার সে এক বাবুবাড়ির নতুন জামাইয়ের দিকে তাকিয়েছিল, তাইতেই সেই জামাই (রাঢ়ের প্রবাদ বনেদী বাবুরা ভীষণ গাঁজাখোর) রাতদুপুরে সল্লার কাছে প্রেম নিবেদন করতে গিয়ে ধরা পড়েছিল। আজ অবশ্য সল্লার সেই বয়েস নেই, কিন্তু চাহনি আছে।

এই সল্লা কানে শোনে না, ঠসী। তাই প্রেম নিবেদন করতে হলে আগে ভালভাবে বক্তব্যটা তার কানে ঢুকিয়ে দিতে হয়। নৈলে সে গোলমাল করে।

এই সল্লা নিজেকে বলে, বনকাপাসির ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো। নয়তো জাড়ের রেতে এক মালসা আগুন। সে শরীল সম্পর্কে কৃপণ নয়। সে যতীন মাস্টার কিংবা থানার মধু দারোগাকে বুকের ওপর নিয়ে পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বলতে পারে : আমার আর সেদিন নেই! এই সময় সে ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে এবং মাস্টার বা দারোগা যেই হোক, হঠাৎ প্রচণ্ড তেঁতো টের পেয়ে নিজের শরীলের প্রতি বিক্ষোভে ফেটে পড়ে, কারণ—সত্যি, সরলার আর সেদিন নেই। এত খাটুনির মজুরি কানাকড়ি।

কিন্তু এই খ্যাপা-খ্যাপ্তোর গাজোল, এই দাউদাউ প্রজ্বলন, এইসব নৈসর্গিক উপদ্রব বনকাপাসিতে ঘটে থাকে। অগত্যা তাই সল্লা ঠসীই নিদান।

নারাং সল্লার পিছনে-পিছনে চলে আর সল্লা ধুল-ফুলের (আঁতুড়ের আবর্জনা) ঘোষণা দিতে দিতে মাঠে নামে। বৃষ্টি পড়ে ধানের পাতায়, গাছের পাতায়, পাতা থেকে মাটিতে আর জলে—টুপ টাপ, টিপ টাপ, টুপ টাপ···

বাঁজাডাঙার এক কোনায় ফণিমনসা ফেয়া কোঙাঝোপ মাদারগাছে ঘেরা একটা ছোট্ট জায়গা। তার নাম ধুলগাড়ি। খরায় মাদারগাছে লাল লাল ফুল ফোটে। বর্ষায় ফোটে সাদা কেয়াফুল। সেখানে জ্যৈষ্ঠে সাপসাপিনী জোড় বাঁধে। গাঁয়ের কত ছোটলোক বাড়ির কিশোরী মেয়ের কুমারীত্ব ঘোচে নির্জন দুপুরবেলায়। চুলে আটকে যায় খোলামকুচি, পিঠে কাঁটার জখম। মধ্যিখানে অজস্র হাঁড়ির টুকরো, বিবর্ণ ন্যাতা। বনকাপাসির অনেক জোড়বাঁধার প্রত্যক্ষ এমন প্রমাণ কোথাও নেই। একটা মানুষ দেখে বলা যায়, কারা জোড় বেঁধেছিল বটে—কিন্তু বিশ্বাস হয় না! মানুষ দেখলেই আর সব ভাল ভাল অজস্র ব্যাপার কি না সামনে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং জৈবতাকে বাঁচায়। কিন্তু ধুলগাড়িতে নারাং শুধু জোড়বাঁধার খেলা দেখে। দেখে দেখে গাজোলের হিজোলে মহিষের মতো খ্যাপে। শিং নাড়তে নাড়তে ধুন্ধুমার উপদ্রব সেই কালো বলশালী মহিষ এগিয়ে আসে আর এগিয়ে আসে। নারাং ফ্যাঁচ করে নাক ঝেড়ে ডাকে—এ্যাই সল্লা!

বনকাপাসির বড় সরল লাজুক অল্পভাষী আর গরীব মানুষ এই নারাং।···

সল্লা ভীষণ চমকে গিয়েছিল। হাঁড়িটা ফেলে সবে ঘুরেছে, নারাং তাকে ধরেছে। এই গাজোলে পরিত্যক্ত ইটভাটার শেয়ালরা হাঁসমুরগি ধরে, ছাগলের টুঁটি কামড়ায়। নারাং ধরেছে।

সল্লার পিঙ্গল চোখ দপ করে জ্বলে উঠেই নেভে। —অ, নারাং মুখপোড়া! তারপরই ব্যাপারটা এত হাস্যকর এত উদ্ভট লাগে তার, সে খিলখিল করে হেসে ফেলে। হাসতে হাসতে ভেঙে যায়, দোলে। তুই-ই। ও মিনসে, তুইও? আমার মরণ! ও নারাং, ই কী রে!

বড় সরল লাজুক সাত-চড়ে-রা-নেই মানুষ, সাতে-পাঁচে-না-থাকা নির্জন মানুষ, শুদ্ধ মানুষ নারাং। সল্লা হি হি করে হাসে। তার চুল খসে পড়ে। নারাংয়ের বুকে কিল মারে সকৌতুকে।—ওরে ডাকা! আমার কী হবে রে! তোরও পেটে-পেটে এই ছিল রে! সল্লা লুটিয়ে পড়ে হাসতে হাসতে।

আবার বলে—ছাড় ছাড়। অশুচি আছি। দীঘিতে ডুবতে যাব। উদিকে মেয়েটা একা আছে। ছাড় নারাং, খেপিস না!

নারাং জানে, আস্তে আস্তে কানের কাছে বললে সল্লা শুনতে পায়। এবার সে তাই করে। কাকুতিমিনতি করে বলে—সল্লা সল্লা···ব্যস, আর কী বলতে হবে, ভেবেই পায় না। সল্লা সল্লা করে চলে ক্রমাগত।

সল্লা আপোসের সুরে বলে—আরেকদিন হবে, আরেকদিন। ছাড় নারাং, ছেড়ে দে। আমি অশুচি আছি রে, তোর দিব্যি। বিশ্বেস না হলে দেখ্ না···

তারপরই সল্লা এক ধাক্কা মারে। কামার্ত নারাং পড়ে যায়। তখন সল্লা হাসতে হাসতে দৌড়ে পালায়। পালাবার সময় তাকে শূন্য বাঁজাডাঙায় গাজোলে এক পেত্নীর মতো দেখায়। আস্তে আস্তে নারাং ওঠে। গায়ে কাদা। চুলে কাদা। লাল চোখে তাকিয়ে সল্লার দৌড়ে যাওয়া দেখে সে। ঠোঁট কামড়ায়। ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে। দম আটকে যায়। পরিব্যাপ্ত ধূসরতার মধ্যে একলা বজ্রাহত তালগাছ মাথায় আগুন আর ধোঁয়া নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর দূরের হিজোলে খ্যাপাখ্যাপো কালো মহিষ শিং নেড়ে গর্জন করছে। তাঁতিপাড়ায় আচমকা মাকু বন্ধ হলে খিলখিল হাসি, আর শংকরার বউ থপ থপ ছলাৎ ছলাৎ ভিজে কাপড়ে হাঁটছে, হঠাৎ ফিক করে হেসে যায়, হৈবরের বউয়ের হাতের চুড়ি বাজছে, স্তন দুলছে, পাছা টলছে, বৃষ্টি পড়ছে টুপ টাপ টুপ টাপ টিপ টাপ টিপ টাপ···

রাগে দুঃখে নারাং অস্থির হয়ে গাঁয়ে ফেরে। বড় আশা করে সল্লাকে

ধরেছিল। সল্লা তো কাকেও ফেরায় না। খোঁড়া ভিখিরি ফৈজু ফকিরকেও এক দুপুরে সল্লার ঘর থেকে বেরোতে দেখেছিল সে। আর নারাং তো পরিপূর্ণ মানুষ।

নাকি সল্লা তাকে অবহেলা করল? তার শরীলটাকে? হুঁ, সল্লা ভেবেছে, নারাং যদি পুরুষ, তবে তার বউছাড়া জীবন কেন? এই দুর্দিনে ছোটলোকের মেয়েরা ভিক্ষে করে খাচ্ছে। গাঁ ছেড়ে পালাচ্ছে পেটের জ্বালায়। আর নারাংয়ের বউ জোটে না! হুঁ, সল্লা তাই ভেবেছে। ওরে আমার ঢলানি রে! ধানকাটার সময় হোক। তখন নারাং বউ আনবে।

কিন্তু এই গাজোলে! নারাং গভীর দুঃখে ভাবে, ই কী উপদ্রু রে বাবা! এখন কী করি, কোথা যাই! মোন বশ মানে না। ই কী থ্যাপাথ্যাপ্তো কাণ্ড!

অন্যমনস্ক নারাং গাঁয়ে ঢুকে কতকটা হাল ছেড়ে দিয়ে মনে মনে গান গায়:

'দেহর গিদের করিস নে লো
দেহ কি তোর সঙ্গে যাবে।
চিত হয়ে ভাসবি জলে
দাঁড়কয়োতে ঠুকরে খাবে।...'

আর এখন বনকাপাসি কী নির্জন! আরামে ডুবে আছে, সুখে। ঘরে-ঘরে না-জানি কত জোড়বাঁধার খেলা। গাছেরও কোটরে পাখপাখালি পোকামাকড় জড়াজড়ি গতরের ওমে শান্ত। আর নারাং একলা। নারাং জ্বলতে জ্বলতে ঘুরছে।

হঠাৎ নারাং দাঁড়াল। নিমবনের ধারে সল্লার বাড়ি। ভাঙা পাচিলের পারে সল্লার ঘর। ঘরের দাওয়ায় একটা বুড়ি ছাগল বাচ্চাকে মাই দিচ্ছে, পায়ের তলায় নাদি। এক ঝাঁক বাচ্চা নিয়ে ধাড়ি একটা মুরগি চুপচাপ বসে আছে। আর চৌকাঠে দুহাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে সল্লার মেয়ে। বিষ্টি দেখছে। উঠোনে জবা ফুল। লাউয়ের মাচায় লাউ ঝুলছে। মেয়েটার ফর্সা রং। পরনে ডুরে শাড়ি। একটু একটু দুলছে। নারাং তাকিয়ে থাকে।

বাড়ির কানাচে ধূর্ত শেয়াল যেমন তাকায়, এই গাজোলের দিনে।

মেয়েটার বিয়ে দিয়েছিল সল্লা। স্বামী ভাত দেয়নি, নাকি ইল্লুতে স্বভাব, আর বোবা। ঠসীর মেয়ে বোবা। দলদলে চেহারা, বড় বড় চোখ, শাড়ির আঁচল চেবায়, নয়তো বুড়ো আঙুল চোষে, অনর্গল লালা ঝরে, কষায়।

নারাং ভাবে।

সল্লা নাকি মেয়ের পেট পুড়িয়ে বাচ্চাটা মেরেছিল, কাপাসের শেকড়-বাটা খাইয়ে দিলে গর্ভপাত হয়। সল্লা দাই, অনেক রকম ওষুধ জানে। উঠোনে কতসব জড়িবুটির গাছ।

নারাং কানের লতি চুলকোয়।

মেয়েটার নাম জ্যোৎস্না। নাকি যতীন মাস্টার দিয়েছিল—মেয়ে এবং নামটাও। নারাংকে হঠাৎ ঘুরে সে দেখতে পায়। কিন্তু তাকিয়েই থাকে। তখন নারাং লম্বা পায়ে এগিয়ে দাওয়ায় ওঠে। তারপর হেসে বলে—ভালো তো? মা কই? তারপর বুঝতে পারছে না কি না সন্দেহ, তাই হাত নেড়ে নানান ভঙ্গী করে বলতে থাকে—গাজোল লেগেছে দেখছ? চালভাজা খাওয়ার সময়। ভাল্লাগে না? মা আসতে দেরী হবে, কী বলছ? মাস্টারের বাড়ি ছাঁদাপত্তর মিটিয়ে নেবে, তবে তো? ছাগলের পাতা লাগবে না? এনে দেব পাতা? ওই তো জামগাছ আছে। দেব? ও জোছনা, আমার কথা বুঝতে পারছ তো?

কী বোঝে, মেয়েটা হাসে শুধু। লালা ঝরে। চিবুক গলা ও বুকের কাপড় ভিজে যায়। এখন তার মুখে বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল। আঙুলের তলা দিয়ে পাপহীন সরলতারই স্রাব।

বনকাপাসির ফাঁড়িতে কোয়ার্টার নেই। চারদিকে উঁচু বারান্দাওলা বাংলো ঘরের মতো বিশাল ঘর, টিনের চাল। মাটির দেয়ালে পলেস্তারা, আলকাতরা ও চুনকাম আছে। চালের মটকায় দুধারে দুই সিংহ লেজ তুলে দাঁড়িয়ে ভিজছে, মধ্যিখানে বেখাপচা একটা টিনেরই ত্রিশূল। টিনে কবে আলকাতরা লেপা হয়েছিল। এখন মরচেধরা খয়েরি রঙ। সামনের বারান্দায় বড়ো টেবিল। পিছনে হাজত, একপাশে বড় কামরায় সার সার লোহার খাট, সেপাইরা থাকে। অন্যপাশে দুটো কামরায় একটায় এস আই, তিনিই ও সি, মধুবাবু থাকেন, অন্যটায় দুটো খাটে হাবিলদারজী আর এ এস আই গোপেন সরকার। মধুবাবুর ফ্যামিলি সদর থানার কোয়ার্টারে আছে। এ থানায় টহলদারি ডিউটি।

দুপুরের খাওয়ার পর মধুবাবু বারান্দার টেবিলে জরুরী ফাইল সই করছেন।

তেওয়ারী সেপাই স্পেশাল মেসেঞ্জার হয়ে কাটোয়া যাবে ফাইলটা নিয়ে। সে দাঁড়িয়ে আছে পাশে। গোপেন জমাদার ঘরে শুয়ে ঠ্যাং নাচাচ্ছে। হাবিলদারজী ডিউটিতে বাইরে। থানা সুমসাম চুপ। হাজতঘরে শুধু একজন গরুচোর কয়েদী। তাকে নিয়ে যাবে তেওয়ারী। শালা বেধড়ক পেঁদানি খেয়ে কবুল করেছে।

এই সময় আচমকা চেরা গলায় চ্যাচাতে চ্যাচাতে সল্লা তার বোবা মেয়েটাকে টানতে টানতে হাজির হল।

আর ঠিক এই সময় বৃষ্টিটাও যেন থেমে গেল। পশ্চিমে মেঘের খানিকটা সিঁদুরে হয়ে গেল, এবং একটা হাল্কা ক্লান্ত আলো গাছপালার মাথা ছুঁতে-ছুঁতে বারান্দায় এসে পড়ল। এই অবস্থায় তোলপাড় হয়ে মধু দারোগা খ্যাঁক করে গর্জাল—এ্যাই মাগী! চোওপ!

ভঙ্গী দেখে সল্লার চ্যাচানি থেমে যায় সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু মুখে উঁ উঁ উঁ উঁ চাপা কান্নার সুরটা থামে না। যে বিরাট শোকাবহ ঘটেছে নেপথ্যে, তার আবহসঙ্গীত। বোবা মেয়েটা আঁচল চুষতে চুষতে থানার দেওয়াল ও আসবাবপত্র, শেষে দারোগাবাবুকে দেখতে থাকে। দারোগা সই করতে করতে আড়চোখে তাকান। মেয়েটার চোখ সল্লার মতো কটা নয়, স্বাভাবিক। বড় চেরা চোখ। যতীন শালারই বা! চোখের তলায় খাঁজে কয়েক কুচি জল আর কোনায় পিচুটি লেগে আছে। আর, ঠোঁটের নিচে লাল দগদগে একটা রেখা। মধুবাবু ফাইল রেখেই বলেন—লোকটা কে?

পরক্ষণে খেয়াল হয়, দাই মাগীটা ঠসী। তখন ডাকেন—গোপেন! খিক খিক করে হাসেন। —গোপেন! রগড় দেখছ? কী কাণ্ড! এঁ্যা?

—হ্যাঁ সার, বাদলায় মাথা গরম করেছে কোন বাঞ্চোত! হাসতে হাসতে গোপেন জমাদার বেরোয়।

ফাইল নিয়ে তেওয়ারী বোবা মেয়েটার দিকে তাকাতে তাকাতে হাজতের দিকে চলে গেল। মধুবাবু টেবিলের তলা দিয়ে পা লম্বা করতেই সল্লা গুঁড়ি মেরে তা আঁকড়ে ধরে এবং মাথা ঠোকে।—এ্যাই সল্লা! ছাড়্, ছাড়্, বলছি! নাম বল্!

গোপেন বলে—কানে শোনে না সার!

—এ্যাই ছুঁড়ি, কে ধরেছিল তোকে?

ফের গোপেন বলে—বোবা সার।

—এই মরেছে! বলে অভিজ্ঞ মধু দারোগা এত জোরে হাসেন যে বারান্দার কোনায় খুঁটিতে বাঁধা রামখাসিটা মাথা নেড়ে ঘন্টা বাজাতে থাকে। তার মাথার কাছে কচি পেয়ারাপাতা ডালসুদ্ধ ঝুলছে।

মধুবাবু পা টেনে ছাড়ান। সল্লা টেবিলের তলায় ফুলে ফুলে কাঁদে, মেঝেয় মুখ। সে বলতে চেষ্টা করে—আমার বাপমরা মেয়েটা দারোগাবাবু, আমার অনাথ বোকাসোকা মেয়ে…মুখে বাক নেই দারোগাবাবু, সরল নিতুষী মেয়েটা…

—জ্বালাতন! মধুবাবু ভুরু কুঁচকে বিরক্তির সঙ্গে হাসেন। —গোপেন, মাগীকে ওঠাও তো। নাম জেনে নাও। আর…হঠাৎ চুপ করেন তিনি।

গোপেন সহজেই সল্লার একটা হাত ধরে টেনে বের করে টেবিলের তলা থেকে। সল্লা পুরো দমটা এতক্ষণে ছেড়ে জোরে কেঁদে ওঠে—লিমেগে পাপিষ্ঠি দারোগাবাবু, আপন-পর মা-মাসি বাছাবাছি নেই গো, বনকাপাসির পাঁটা দারোগাবাবু গো…

ফের ভুরু কুঁচকে তাকান মধুবাবু। তাঁকেই গাল দিচ্ছে না তো! পরে ফের খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসেন।

গোপেন ডাইরি খুলে পেনসিল বাগিয়ে ধরে। তারপর পায়ের বুড়ো-আঙুলে সল্লার পাছায় খোঁচা মারে। এই সময় গরুচোরের কোমরে দড়ি বেঁধে তেওয়ারী বারান্দা থেকে নেমে যায়। প্রাঙ্গণে আমগাছের তলায় বড় পাথর। তাতে বুটসুদ্ধ একটা পা রেখে লক্ষ্মণ সেপাই লাঠি ঠুকছিল হাঁটুর নিচের পট্টিতে। সে তেওয়ারীর সঙ্গে যাবে। তেওয়ারা গরুচোরের দড়ি তার হাতে দিলে হ্যাঁচকা টান মারে। গরুচোর আছাড় খায়। পাঁজরে লাঠির গুঁতো মেরে তাকে ওঠায় লক্ষ্মণ। জোর গলায় বারান্দার দিকে তাকিয়ে বলে—শালা! মাগী ধরলেও তো বুঝতাম একটা কম্ম করলি। নয়তো গরু!

এই কথায় থানাসুদ্ধ রোদ ঝকমক করে মেঘের ফাঁকে। বড় ঘর থেকে খাটিয়া ছেড়ে সেপাইরা উঁকি দিতে এসেছে দরজায়। মুখে চাপা হাসি। লক্ষ্মণ আর তেওয়ারীজী গরুচোর ও ফাইল নিয়ে চারা খেজুরগাছের আড়ালে রাস্তায় নেমেছে। মধুবাবু পা দোলান। বোবা মেয়েটির কাপড়ের তলায় এভিডেন্স খুঁজতে পেলে আর কিছু চায় না কলম। ডিরেক্ট এভিডেন্স। আনমনে দারোগা বলেন—ভুজঙ্গ ডাক্তারকে ডাকতে হবে।

ওদিকে গোপেন সল্লার কানের কাছে ঝুঁকে বলে—কে, কে?

সল্লা পিঙ্গল চোখে একবার মেয়েকে দেখে ফুঁপিয়ে বলে—কে?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। কে?

এবার সল্লা মেয়ের সঙ্গে বোবার ভাষায় ভঙ্গী করে। মেয়েটা ফ্যালফ্যাল করে তাকায় আর কাপড় চোষে। সল্লা কাঁদতে কাঁদতে বলে—মুখে বাক নেই, বলতে পারে না গো, হতভাগীর মরণ নেই। কে সব্বোনাশ করলে গো! এই গাজোলে কার মাথায় চিংরি পোকা (শ্রীহরি নামে পোকা) কামড়ালে গো!

বিকটমূর্তি গোপেন ধমকায়—চোওপ্! বিনিনামে মামলা হয় না!

সেই রুদ্র চাহনি দেখেই সল্লা ভড়কে কান্না থামায়। চোখ নাক গাল মুছে পা ছড়িয়ে বসে। শান্ত স্বরে বলতে থাকে—যতীন মাস্টারের বউটা বিয়োল। আঁতুড়ের কাজ সারতে মাঠে গেলাম। তা'পরে দীঘিতে ডুব দিলাম। মাস্টারের বাড়ি গেলাম। বললে, চাট্টি খেয়ে যাও—বেলা গড়িয়েছে। খেলাম। মেয়ের জন্যে একথালা ভাত দিলে, তাও নিলাম। তিন কাঠা চাল দিলে। পাঁচসিকে পয়সা দিলে। তাই সব নিয়ে ঘরে গেলাম। যেয়ে দেখি, মেয়ে আমার···ও দারোগাবাবু গো! আমার লিতুষী বাপহারা দুধের বাচ্চা গো!

আবার কেঁদে ওঠে সে। মধুবাবু হাই তুলে ওঠেন। —মাগীকে সামলাও গোপেন। নামটা জেনে নাও। ইয়ে—আমি এট্টুকুন গড়িয়ে নিই। যা হয় কারো।

তিনি পাশের ঘরে গেলে গোপেন সল্লার কানের কাছে মুখ এনে বলে—নাম বল্ না, নাম।

—হ্যাঁ, নাম। ···গোপেন আঙুল দেখায়।—রেপ কেস। ছ বচ্ছর।

সল্লা মাথা নাড়ে। দুবার নেড়ে মেয়ের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ ক্ষেপে লাফ দেয়। মেয়ের চুল ধরে গর্জায়—অত করে সাধছি, লোকটা কে চিনিস না হারামজাদী? তবু মুখে রা খুলল না—এত বড়টা কাণ্ড?

বলেই ঠাস করে এক চড। মেয়ে মুখ ঘোরায়। আর সল্লার আঁচল থেকে ক্ষুনি কয়েকটা ডিম পড়ে ভেঙে যায়। থলথলে সাদা ও লাল হলুদ তরল জিনিসগুলো সিমেণ্টের কালো মেঝেকে অশ্লীল করে ফেলে। গোপেন ক্ষেপে গিয়ে চেঁচায়—শালী ঘুষ দেবে! ঘুষের পিণ্ডি এনেছে!

সেপাইরা হো হো করে হাসে। সল্লা অপ্রস্তুত হয়ে মেয়ের চুল ছেড়ে দেয়। এবং সেই তরল জিনিসগুলো হন্তদন্ত হাতের চেটোয় তুলে আঁচলে রাখে। কাপড়টা পুরু, ময়লায় জমাট। ফুলে ওঠে।

যতটা পারে তুলে নিয়ে সে গোপেনের দিকে করুণ মুখে তাকায়। গোপেন

আবার হাসছিল। আবার কানের কাছে ঝুঁকে বলে—কী করে বুঝলি মেয়েকে নষ্ট করেছে? এ্যাঁ?

—মেয়ে যে সব দেখাল ছোটবাবু! ইশারা করে সব বললে!

—অ। তা, লোকটা কে?

—ইশারায় বলছে। মাথায় ঢ্যাঙা, আঙুলের মতো পাটকাঠি। কেমন করে এল, কেমন কী করল—কেমন করে পা ফেলে পালাল, তাও বলছে। বলছে, হাঁটু অব্দি কাপড় পরা।

—হুঁ, তোর কাকে সন্দেহ শুনি?

সল্লা তাকায়। মুখে দ্বিধার ভাব। ঠোঁট ফাঁক হয়ে থাকে। সরু সরু সাদা দাঁত দেখা যায়। সে আস্তে বলে—কাকে সন্দ করি বনকাপাসিতে? অমন লোক তো কত আছে ছোটবাবু! কিন্তুক···

—হুঁ?

সল্লা হঠাৎ জোরে মাথা দোলায়। বিড়বিড় করে বলে—না, না, না।

—এ্যাই সল্লা!

—উঁ?

—কী বলছিস?

সল্লা ফিসফিস করে বলে—ছোটবাবু, ধুলগাড়িতে ধুলফুল ফেলতে গেলাম। তখন···তখন ছোটবাবু, বাউরিপাড়ার লারাং আমাকে···আমার হাত ধরেছিল।

—নারাং বাউরি! বলিস কী?

—হাত ধরেছিল। ধাক্কা মেরে পালিয়ে গেলাম। আর পিছু ফিরে দেখিনি। আমার বড্ড ভয় হয়েছিল, ছোটবাবু! মনে ভাবি এখন—লারাংই বা···

গোপেন সোজা হয়ে বসে।—কাশিম! অনাদি!

অনাদি সেপাই হাই তুলে বলে—স্যার!

—তোমরা দুজনে যাও। শালাকে নিয়ে এসো।

গোপেন ডাইরি লিখতে শুরু করে। সল্লা ওর দিকে তাকিয়ে থাকে শুকনো গুগলি চোখে। একহাতে ধরা আঁচলে ডিম—এতক্ষণে রস চুঁইয়ে উরুর মধ্যে পড়ছে।···

সন্ধ্যার মুখে আবার টিপটিপানি শুরু হয়েছে। ঝোপেঝাড়ে পোকামাকড় ডাকছে! জোনাকি জ্বলছে থোকা থোকা। অদ্ভুত বাজনার মতো ট্রেন গেল স্টেশন ছেড়ে। কাজিপাড়ার মসজিদের মাথায় চড়ে নইম সেখ আজান দিল।

হরিহর রায়ের সিংহবাহিনী মন্দিরে ঘণ্টা বেজে আরতি হতে থাকল। ভাঙা ফুটো দালান, আর সারানো হয় না। ব্যক্তিগত সম্পত্তি। খিড়কির দিকে গভীর ডোবা আছে। তার পাশে বাঁশবন, আগাছার জঙ্গল। ঘণ্টা বাজলে জঙ্গলের বেলতলায় চকচকে মাটির বেদীতে মাটির সরায় ভাত তরকারি রেখে আসেন গিন্নিমা। একটা শেয়াল—শেয়ালরূপী দেবতা এসে রোজ খেয়ে যায়। যেদিন না খায়, বাড়ির মুখ শুকিয়ে যায়। দুপুর রাতে দালানের কার্নিস থেকে চুনবালি খসে পড়ে। ছেলেপুলের কাসি বাড়ে। রায়বাবুর বাত কটকট করে।

ভাতের সরা আর গামলায় জল রেখে প্রণাম করে গিন্নিমা তাড়াতাড়ি চলে যেতেই নারাং হামাগুড়ি দিয়ে বাঁশবন থেকে বেরুল। ভিজে বাঁশপাতায় খসখস শব্দ উঠল। বেদিটা গাজোলে কিনারায় ধসেছে কিছুটা। নারাং হাঁটু দুমড়ে জানোয়ারের মতোই চবচব শব্দে ভাত খায়। ডালভাত মাছভাজা তরকারি সব রকম। তারপর জল খায়। গলার কাছে জ্বালা, বুকে জ্বালা, ঠোঁটে নুনলঙ্কা ঠেকতেই হু হু জ্বলে যায়। অনেকটা কেটেছে। মানুষের দাঁতে নাকি বিষ থাকে। ঘা বিষিয়ে মরে যাবে না তো নারাং?

জল খেয়ে ঢেকুর তুলে সে চাপা আঃ উচ্চারণ করে। একটুখানি বসে থাকে ভিজে ঘাসের ওপর। তারপর চুপিচুপি বাঁশবনে গিয়ে ঢোকে।

বাঁশের পাতায় বৃষ্টির শব্দ। পোকামাকড় ডাকে। জোনাকি জ্বলে। নারাং চুপচাপ বসে থাকে। আস্তে ফের চুপিচুপি বলে—আঃ! কোথায় শেয়াল ডেকে ওঠে, প্রথম প্রহর শুরু। পেঁচা ডাকে তিনবার ক্র্যাও ক্র্যাও ক্র্যাও! বাঁশের বনে ক্যাঁচকোঁচ শব্দ—অন্যমনস্ক হাওয়া এল এতক্ষণে। রাতের গানের মধ্যে নারাং বসে থাকে, আসরের ভিড়ে লুকিয়ে। ছোট্ট ঢেকুর ওঠে আবার। আবার সে গোপনে বলে—আঃ!

কতক্ষণ পরে সে বেরিয়ে পড়ে। ঘরে ফিরতে সাহস হয় না। ভয় এবং লজ্জা। নিজের ঘরকেও এত লজ্জা এখন! এত লজ্জা করে বনকাপাসিকে—তাই জঙ্গল ও অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে বেড়ানো। বড় সরল নিতুবী মানুষ ছিল নারাং। মুখ তুলে কথা বলতেই পারত না। গতর ঘামিয়ে খাটত। অল্প কথায় জবাব দিত প্রশ্নের। সেই নারাং!

অন্যমনস্ক নারাং আনাচেকানাচে ঘুরে, কী ভেবে সন্নার বাড়ির কাছে যায়। আঃ ছি ছি ছি! বুক কেমন করে তার। বার বার জিভ কাটে আর মাথা দোলায়। আর টিপটিপ বৃষ্টির মধ্যে ভেসে আসে সন্নার কান্না। সুর ধরে দাই

মেয়েটি কাঁদছে। —আমার বোকাসোকা বাপহারা কচি মেয়ের এই সব্বোনা করে গেল রে! ওরে আমার দুখের মেয়ের গায়ে হাত দিতে মাথায় বা পড়ল না রে!···

নারাং মাথা দোলায়। পড়েছিল সল্লা, বজ্জঘাত হয়েছিল। আর শরী শরীল বড় গাণ্ডার! ই শরীল কিছু বাছে না সল্লা, বিষম উপক্রু! ব জ্বালা রে!···

—কে?

—আমি লারাং হুজুর, লারাং বাউরি।

—গোপেন! শালা এসেছে! হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ!

থানার বারান্দায় হ্যাজাগ জ্বলছে। মধু দারোগা আলো চুরমার করে হাসে গোপেন দৌড়ে বেরোয়। অনাদি আর কাশিম সেপাই হয়রান হয়ে এসে ত খেলতে বসেছিল। তারাও ছুটে আসে। এসেই বারান্দা থেকে লাফ দেয়।

নারাং ধরা গলায় বলে—আমার এট্টা কথা ছিল হুজুর!

আর কথা! অনাদির চড় তার কষার টাটকা ঘায়ে এবং কাশিমের বেটে গুঁতো পাঁজরে, নারাং অঁক করে পড়ে যায়।

পড়ে থেকেই সে করজোড়ে বলে—আমার এট্টা কথা···

চ্যাংদোলা করে তাকে তুলে আনে ওরা। দারোগা বলেন—শাল কাপড়টা আগে দেখে নাও কাশিম। এভিডেন্স! আর···ইয়ে, যা সব কর করো হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ!

নারাংয়ের কাপড় দেখাদেখি হয়। কাশিম বলে—বিষ্টি সার। তার ও সেই দুপুরবেলা—এখন সাতটা বাজে প্রায়। কোন চিহ্ন নেই।

গোপেন বলে—রঘুবীরকে ডাকো। তোমাদের কম্ম নয়। তার আচমকা হিংস্র হয়ে চেঁচায়—অশ্লীল শব্দ। ···একটা বোবা মেয়ে, বাচ মেয়ে। শালা পাঁটার পাঁটা! দাও শালাকে ব্যাবাক খাসি কইরা।

হাজতের ফাঁকা ঘরে উপুড় হয়ে পড়ে থাকে নারাং। দাঁতে দাঁত চাপে শরীল বিষম গাণ্ডার! হায় শরীল! তার সেই শরীল নিয়ে খেলা ক আইন। নারাংয়ের বজ্রাহত ঝলসানো চোখের কালো রঙ ফেটে গাজো টিপটিপ বৃষ্টির ফোঁটা অনর্গল টুপ টাপ টুপ টিপ টাপ, এবং বাইরেও।···

কালিকাপুরের বড় গোসাঞি

রাতটা ছিল জ্যোৎস্নার। ট্রেন থেকে নেমে বড়গোসাঞি দেখলেন, তিনি একা। ছোট্ট স্টেশন। নিচু প্ল্যাটফর্ম। বিদ্যুৎ নেই, এখনও কেরোসিনের আলো। ট্রেনটা আওয়াজ দিয়ে চলে যাওয়ার পর নিঝুম সুনসান খাঁ খাঁ চারদিক। দশটা অব্দি চায়ের দোকানটাও খোলা থাকে না। শীত ও কুয়াশার ভেতর প্ল্যাটফর্মের গোটাতিনেক বাতি ভুতুড়ে চোখের মতন জুগজুগ করছিল। টিকিট দেখার জন্যও রেলের লোকের গরজ নেই।

স্টেশনঘরের বারান্দায় খোলামেলায় সিগন্যালের আপ-ডাইন দুটো-দুটো চারটে হাতল। একচোখো লণ্ঠন নিয়ে কম্বলজড়ানো সিগন্যালম্যান সেই অবলুণ্ঠিত হাতল টেনে তুলে স্টেশনঘরে ঢুকে গেল। বড়গোসাঞি একটু কেসে সাড়া দিলেন। তবু লোকটা ফিরেও চাইল না। আসলে শীত মানুষকে নিজের খোলসে ঢুকিয়ে দেয়। সরীসৃপের মতন একটা দীর্ঘ হাইবারনেশন জীব-জগৎকে নিজের ভেতর টানে।

কিন্তু বড়গোসাঞির কাছে শীত কিছু নয়, রাত বিরেতও কোনও ব্যাপার নয়। রুগীর খবর হলে যদি কথা দেন যাবেন, তো যাবেনই। ঝড় হোক, বৃষ্টি হোক, শিল পড়ুক, যা কিছু ঘটুক। অবশ্য ট্রেন লেট করলে তাঁর কিছু করার নেই। পরনে গেরুয়া লুঙ্গি, গেরুয়া কাপড়ের পাঞ্জাবি, মাথায় গেরুয়া হনুমান টুপি—সেও পশমি নয়, আর গায়ে জড়ানো তুলোর কম্বল, কাঁধে ঝোলা, পায়ে বেঢপ গড়নের পামসু। এই দিয়েই অসংখ্য শীত কাটিয়ে দিলেন। এখন চুল দাড়ি গোঁফ পুরু ভুরু, সব সাদা। চামড়ায় ভাঁজের পর ভাঁজ, রোগা পাকাটি শরীর। কপালে সিঁদুরের ছোপ। গুজব আছে, বড় গোসাঞির শরীর পৃথিবীর সবরকম খারাপ জিনিস শুষে নিতে নিতে এমন অবস্থায় পৌঁছেছে যে যমও ওঁকে এড়িয়ে চলে। তান্ত্রিক প্রেতসিদ্ধ পুরুষ, শব নাকি যাঁর আহার, তাঁকে মৃত্যু ভয় পাবে, সেটা স্বাভাবিক।

মাইল দুই ধুলোর রাস্তা পেরিয়ে তবে রুগীর গ্রাম। দু'ধারে সদ্য ফসল-ওঠা ধূধু মাঠ শীতের জ্যোৎস্না ও কুয়াশায় কী এক অলীক ব্যাপকতা মনে হয়। রাস্তার ধারে হঠাৎ করে একটা ঝুপসি গাছ, কী গাছ বোঝা যায় না, টুকরো একেকটা জমাট অন্ধকারের মতন। সেখান থেকে একটা ছায়ামূর্তি ছিটকে বেরিয়ে এসে সামনে দাঁড়াল।

বড়গোসাঞি বললেন, কে গো ?

ছায়ামূর্তি ফিসফিসিয়ে অথবা সাপের হিসহিস শব্দে বলল, কী আছ দে !

না দিলে ?

কোপ খাবি।

বড়গোসাঞি হাসলেন। হুঁ কোপ না হয় খেলাম। কিন্তু পাবিটা কী ? একটা মড়ার খুলি, জড়িবুটি, আর বড়জোর কিছু খুচরো পয়সা। রুগী দেখে ফেরার পথে কোপ বসালে না হয় দুটো টাকাও পেতিস।

ছায়ামূর্তি স্থির। হাতে কী একটা দেখা যাচ্ছে, সেটাও স্থির।

মেয়েমানুষ পুরুষমানুষ সেজে আছিস ! বড়গোসাঞি আরও হাসতে লাগলেন। বড়গোসাঞির চোখ রে মা ! রাতবিরেতেও সব দেখতে পায়। তবে কথা কী, এ রাস্তা ধরলি কেন ? অ্যাঁ ? কোন দুঃখে মা ?

ছায়ামূর্তি যেভাবে গাছটার তলা থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসেছিল, তেমনি ছিটকে চলে গেল। তারপর শূন্য ক্ষেতে কেটে নেওয়া ধান গাছের মুড়োয় খড়খড় অপসৃয়মান শব্দ—কতক্ষণ, বহুক্ষণ। তাড়া খাওয়া প্রাণীর মতো পালিয়ে যাচ্ছে। দূর থেকে দূরে।

বড়গোসাঞি একটু অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পর পকেট থেকে বিড়ি দেশালই বের করলেন। জীবনে এই প্রথম এমন অদ্ভুত হামলা। নিঃসাড় হয়ে গেছে শরীরটা। কিন্তু মন—বড়গোসাঞির মনের সঙ্গে শরীরের সম্পর্ক বরাবরই যেন ছাড়া-ছাড়া, তাই মনে একটা ছটফটানি। বিড়ির ধুঁয়োর সঙ্গে কথা বেরিয়ে গেল, কোন আবাগির বেটি গো ? এতক্ষণে দূরে একচিলতে আলো দুলতে দুলতে এই রাস্তা ধরে আসছিল। বড়গোসাঞি আড়ষ্ট পা ফেলতে লাগলেন রাস্তার ধুলোয়। যে মানুষ জীবনে কখনও ভয় কী জানেন না, তাঁর হঠাৎ এখন ভয়—ভীষণ ভয়, যেন ওই আলোটুকু দেখতে পেয়েই। অথচ অতর্কিত ওই নৈশ হামলায় একটা মস্ত জয় বলতে গেলে। সেই জয়ের সুখ নেই। কী একটা কষ্টই, এই প্রচণ্ড ভয়ের সঙ্গে। কাঁদতে ইচ্ছে করে কেন, যে-মানুষ কখনও কাঁদেননি ! ঠাণ্ডা হিম পাথুরে আঙুলে চোখের কোনা মুছলেন। লণ্ঠন নিয়ে দু'জন লোক। তাদের হাতে লাঠিসোটাও। বড় গোসাঞিকে সঙ্গ দিতে আসছিল। হরিহর গোমস্তা পাঠিয়েছেন। জানেন কথা দিলে গোসাঞিজি আসবেনই আসবেন। এত ঠাণ্ডায় কষ্ট করে দুটি লোকই ঝুঁকে তাঁর জুতোর ডগার ধুলো জিভে ও মাথায় নিল। নিজেদের নামও

জানিয়ে দিল, শম্ভু আর বলাই,। শম্ভু বলল, মনিবের নুন খাই, নিন্দে করব গোসাঞিজি! তবে ঠেলায় না পড়লে তো বেড়াল গাছে চড়ে না।

বড়গোসাঞি আস্তে বললেন, কেন?

বলাই হাসছিল, অথবা শীতের কাঁপুনিতে ওইরকম মনে হয়। হুঁ হুঁ করে অদ্ভুত ভঙ্গীতে বলল, রুগীর অবস্থা সাংঘাতিক। সামলানো যায় না। গতিক দেখে গোমস্তামশাই বললেন, যেখানে খোঁজ পাস, খুঁজে নিয়ে আয়।

বুঝেছি। বড়গোসাঞি থামিয়ে দিলেন তাকে। তারপর ভাবলেন, কিছুক্ষণ আগের ঘটনাটা বলবেন। কিন্তু বলতে ইচ্ছে করল না। অন্তত এখনও মনের যা অবস্থা, স্থির হতে পারছেন না। সময়মতো অবশ্য সকলের সামনে বিশদ বিবরণ দেবেন ঠিক করলেন। কারণ এ তাঁর একটা জয়ের ঘটনা। এটা তাঁর পসার বাড়িয়ে দেবে আরও। গুজব রটবে অনেকরকমের। কেউ বলবে অমানুষের ব্যাপার, অর্থাৎ অশরীরী আত্মার হামলা। ভূতপ্রেত তাড়ানো যাঁর কাজ, তাঁর ওপর ভূতেদের মোটেও খুশি থাকার সম্ভাবনা নেই। সুতরাং হামলা তো হবেই। তার চেয়ে বড় কথা, ওই ভূত সেই ভূত, যে হরিহর গোমস্তামশাইয়ের মেয়েকে হাড়-জ্বালান জ্বালাচ্ছে বিয়ের পর থেকে। জামাই নিয়ে যাওয়ার নামই করে না।

অবশ্যি ভূতেরা কোপ বসানোর কথা বলবে কেন, কী আছে দে বলবে কেন, এগুলো রহস্য হলে তারও জবাব আছে। যার খুলি, সে ফেরত চাইতে এসেছিল। আর 'কোপ' কথাটার আধ্যাত্মিক মানেও হয়।…

বাড়িটা একতলা, পুরনো। রাতদুপুরেও বাইরের ঘরে একদঙ্গল লোক অপেক্ষা করছিল, বড়গোসাঞির কীর্তিকলাপ স্বচক্ষে দেখবে—যা এতকাল কানেই শুনেছে। এই সাদামাটা লৌকিক পৃথিবীতে কখনও-সখনও অলৌকিকের একটু আভাস যারা পেয়ে আসছে, তারা সেই অলৌকিককে পুরোপুরি দেখতে পাবে। মুখগুলো বড়গোসাঞিকে দেখে স্থির হয়ে গেছে। তুলিতে ধ্যাবড়া করে আঁকা বড়-বড় সব চোখ। সেই চোখে প্রাগৈতিহাসিক মানুষের যাবতীয় আদিম বিস্ময়। কীভাবে খবর রটে গিয়ে দেখতে দেখতে ভিড় জমে গেল বাড়ির সামনে। জ্যোৎস্নায় আর ঠাণ্ডায় পুরনো পৃথিবীর জরাজীর্ণ টেরাকোটা চিত্রিত মন্দিরের আদল কাপাশি গাঁয়ে এক শীতের নিশুতি রাতে ফুটে বেরিয়েছে। সবেতেই রহস্য জড়ানো এখন।

গোমস্তামশাই প্রণাম সেরে চোখে জল নিয়ে বললেন, জানা কথা, আপনি আসবেন। আর আসবেন বলেই যেন আজ সারাটা দিন যা করছে, হুলুস্থুল একেবারে। ভাঙচুর, গালমন্দ—অকথ্য। পালাতে চাইছে খালি। দশজন ধরে আটকানো যায় না, এমন অবস্থা।

বড়গোসাঞি একটু হেসে বললেন, এখন কীরকম ?

ঘণ্টাখানেক হল, শুয়ে আছে চুপচাপ।

খেয়েছে কিছু ?

হুঁ, দু'মুঠো মাত্র। তাও ফেলে ছড়িয়ে।

ভারিক্কি চেহারার একজন লোক রহস্যের ভঙ্গী করে বলল, গোসাঞিজি তলাটে পা দিয়েছেন। এইতেই আদ্ধেক জব্দ।

ভিড়টা শীতকাতুরে হাসতে লাগল।

বড়গোসাঞি বললেন, চলুন গোমস্তামশাই। রুগী দেখি।

হরিহর গোমস্তা বললেন, জল গরম করতে বলেছি। হাত-মুখ ধুয়ে একটু চ খেয়ে নিন আগে।

হচ্ছে। আগে রুগী দেখি, চলুন।

তিনদিকে সারবন্দি একতলা ঘর। টানা বারান্দায় থামের পর থাম। থামের আড়ালে মেয়েরা। মধ্যিখানে উঠোন। উঠোনের একধারে দুটো ধানের গোলা। অন্যধারে কুয়োতলা। সেখান থেকে শিউলির আবছা সুঘ্রাণ ভেসে এল। উঠোনে নেমে হরিহর গোমস্তা খুবই চাপা স্বরে বললেন, শুরু খিড়কির ঘাট থেকে। ওই দেখছেন খিড়কির দরজা। দরজার পর বাঁধানো ঘাট। পুকুর। ওই ঘাটে চুপচাপ বসে থাকত। হঠাৎ এক রাত্তিরে—এমনি জ্যোৎস্না ছিল, বুঝলেন ? দেখি, ওই দরজাটা খোলা। ঘাটে বসে আছে কেউ সাড়া দিল না। কাছে গিয়ে দেখি ঝুমা। তারপর জানেন ? হঠাৎ বিকট হেসে উঠে অকথ্য—

বড়গোসাঞি তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, রুগী কোথায় ?

প্রকাণ্ড সেকেলে পালঙ্কে রুগী শুয়ে ছিল চিত হয়ে। বুক অব্দি লেপ। চোখদুটো বন্ধ। একটু দূরে গাব্দাগোব্দা টেবিলের ওপর নকশাদার কাপড়ের ঢাকনা, তার ওপর সেজবাতি।

বড়গোসাঞি ঘরের ভেতরটা খুঁটিয়ে দেখছিলেন। বনেদি পয়সাওয়ালা পরিবার বলে ধারণা হল। পালঙ্কের আষ্টেপিষ্টে কারুকার্য।

প্রাচীন গ্রামীণ ছুতোররা খুব নিষ্ঠাবান আর পরিশ্রমী ছিলেন। নেটের ধপধপে সাদা মশারিটা খাটানো হয়নি দেখে বড়গোসাঞি বললেন, মশা লাগে না?

লাগে। গোমস্তামশাই আস্তে বললেন। কিন্তু বলে, দম আটকে যাচ্ছে। ছিঁড়ে ফালাফালা করার অবস্থা।

বড়গোসাঞি পালঙ্কের ধারে দাঁড়িয়ে রুগীকে দেখতে থাকলেন। বাইশের মধ্যে বয়স, পাতাচাপা ঘাসের রঙ, চোখের তলায় ছোপ, সুন্দর বলা উচিত, সেই সুন্দরের গায়ে অসুন্দরের ছায়া পড়েছে। আহারে! ঝুলির ভেতর বাঁ-হাত ভরে মড়ার খুলিটি ছুঁলেন।

তারপর ডানহাতের বুড়ো আঙুল বাড়িয়ে তার দুই ভুরুর মাঝখানে রাখলে সে চোখ খুলল।

চাউনি দেখে হরিহর গোমস্তা চমকে উঠলেন। এ কার চোখ?

বড়গোসাঞি ডাকলেন, মা রে! এই তাঁর ডাক। এই ডাকই মন্ত্র, লোকেরা জানে।

রুগী নিষ্পলক তাকিয়ে রইল। চোখের তারা কোনার দিকে—যেদিকে বড়গোসাঞি।

হরিহর গোমস্তা সস্নেহে, একটু ব্যাকুলভাবে বললেন, গ্যাখো, গ্যাখো—কে এসেছেন! ও ঝুমা! গ্যাখো তো, চিনতে পারো নাকি!

বড়গোসাঞি পালঙ্কে তার পাশে বসলেন। ভুরুর মাঝখানে আঙুল তেমনি রাখা। একটু হেসে বললেন, কী? কেমন বোধ করছিস রে মা? কথা বল্ আমার সঙ্গে। আহা, বল্ একটা-দুটো কথা।

তুমি কে?

আমি? বড়গোসাঞি হাসলেন। চিনতে পারছিস নে আমাকে? দেখিসনি কখনও?

নাঃ। কে তুমি?

কামরূপ-কামিখ্যের পাহাড়ে, সেই যে রে, মন্দিরের পেছনকার বটতলায় দেখা হল। প্রণাম করে বললি, আমার মোক্ষ হয় না কেন বাবা? আমি বললাম, আবার যখন দেখা হবে। তুই বললি, উত্তরে? আমি বললাম, না—পশ্চিমে। কোথায়? গঙ্গার ওধারে। হুঁ, তাহলে সত্যি দেখা হল!…

গোমস্তা-গিন্নি বেঁচে নেই। একটি মোটে মেয়ে। বিধবা পিসির হাতে

মানুষ। সেই পিসি এখন দরজা আগলে দাঁড়িয়ে আছেন। বারান্দায় মেয়েদের ভিড়। সবাই দেখতে চায়, ভেতরে কী ঘটছে। এখন এই সব রহস্যময় কথা প্রেতসিদ্ধ পুরুষ কালিকাপুরের বড়গোসাঞির মুখে শুনে তারা নিঃশব্দে ঠেলাঠেলি করে এগিয়ে মুখ বাড়াতে চাইছিল।

গোমস্তামশাইয়ের দিদি শক্ত মানুষ। পিঠে চাপ পড়ায় ঘুরে হাত চালালেন। চটাস করে শব্দ হল। গোমস্তামশাইও শব্দহীন গতিতে তেড়ে এলেন মারমুখী হয়ে। ভিড়টা ছত্রাখান হয়ে উঠোনে পড়ল। চড়টা পড়েছিল কার মুখে, বোঝা গেল না।

আচ্ছন্ন স্বরে প্রেতিনী বলল, তুমি আমাকে নিয়ে যাবে?

বড়গোসাঞি বললেন, ফিরে যাবি কামিখ্যে পাহাড়ে?

যেখানে খুশি।

তবে দেরি কেন রে মা? এক্ষুনি আয়, বেরিয়ে পড়ি।

সত্যি?

সত্যি না তো কি মিথ্যে? বড়গোসাঞি উঠে দাঁড়ালেন। আয়, উঠে পড়। আর—ঝুলির ভেতর থেকে মড়ার খুলিটি বের করে দেখালেন। আর এটার মধ্যে ঢোক। হুঁ—ঢুকে পড়।

প্রেতিনী সেইরকম চোখে মড়ার খুলির দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, ভয় করছে। বড্ড ভয় করছে। ওটা সরাও!

খি খি করে হাসলেন সিদ্ধপুরুষ। ভয় কিসের রে? নিজের জিনিসকে কেউ ভয় করে? এটা তো তোরই মাথা। এর মধ্যে তুই ছিলিস। এই ছাখ না, আমারও এরকম একটা জিনিস আছে। নিজের কপালে আঙুল ঠুকে দেখিয়ে দিলেনও।

তারপর 'ঢোক, ঢুকে পড়' বলে তার চোখের কাছে খুলিটা নিয়ে গেলে সে ধুড়মুড়িয়ে উঠে বসল। পরনে অগোছাল শাড়ি। খোঁপা ভেঙে একরাশ চুল এলোমেলো। গোমস্তামশাই হাঁকলেন, সরে যাও! সরে যাও সব। রাস্তা দাও।

ঠাণ্ডা হিম চাঁদটা এখন আকাশের মাঝখানে। উঠোন জুড়ে জ্যোৎস্না এখন আতঙ্ক। দরজায় বেরিয়ে প্রেতিনী চিক্কুর ছেড়ে কাঁদল হঠাৎ, আমি চলে যাচ্ছি-ই-ই! বড়গোসাঞি তার পেছনে, হাতে মড়ার খুলি। উঠোন পেরিয়ে যেতে যেতে মেয়েটার শাড়ি খসে গেল।

খিড়কির দরজার কাছে পৌঁছুলে গোমস্তামশাই হন্তদন্ত এগিয়ে দরজাটা খুলে

দিলেন। সামনে শানবাঁধানো ঘাট। দুধারে কলাগাছ কালো এবং ধূসর হয়ে আছে শীতের কুয়াশায়। কুয়াশা পুকুরের জলের ওপর পর্দার মতো টাঙানো। প্রেতিনী সেই পর্দাটা ফাঁক করে চলে গেল।

ঘাটের চত্বরে রেখে গেল হরিহর গোমস্তার মেয়েকে। বড়গোসাঞি বললেন, চলে গেল! গোমস্তামশাই, আপনার মেয়েকে এবার তুলে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিন। পায়ের তলায় শুকনো সেক দিতে হবে।…

রাতে ভাল ঘুম হয়নি বড়গোসাঞির। এত সহজে একটা রুগীর ভূত ছাড়ানো, এও একটা জয়। তবু গত রাতে মাঠের মধ্যে সেই হামলার কথাটা মন থেকে যাচ্ছিল না। কী একটা কষ্ট কাঁটার মতন খচখচ করে বিঁধেছে সারাটি রাত।

রাতচরা ভয়ডরহীন প্রেতসিদ্ধ তান্ত্রিক পুরুষ তিনি। কত অদ্ভুত-অদ্ভুত ঘটনা তাঁর জীবনে ঘটেছে। শহর গঞ্জ গ্রাম সবখান থেকে তাঁর ডাক আসে। একবার কাটোয়ায় গুণ্ডার পাল্লায় পড়েছিলেন। মড়ার খুলিটা বের করতেই দুই ছোকরা গুণ্ডা থ। বলেছিল, উরে ব্বাস! এ শালাও দেখি এক ধান্দাবাজ! তারপর হাসতে হাসতে চলে যায়। সেও একটা জয় বলে ব্যাখ্যা করা চলে। কিন্তু 'শালা' আর 'ধান্দাবাজ' বলায় খুব কষ্ট হয়েছিল বড়গোসাঞির। এ কষ্ট সে-কষ্ট নয়। পুরুষমানুষ গুণ্ডা হবে, রাহাজানি করবে, ছিনতাইবাজ হবে এবং বেগতিক দেখলে কোপ বসাতে চাইবে বা বসাবেও। কিন্তু মেয়েরা কোমল জীব। তারা কেন এমন হবে?

বড়গোসাঞির সংস্কারে প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়েছে গত রাতের ঘটনা। সকালে উঠে প্রাতঃকৃত্য করে চা খেতে খেতে খবর নিলেন, মেয়ে ভাল আছে। ঘুমিয়েছে। এখন রান্নাঘরে পিসিমার কাছে বসে স্বাভাবিক কথাবার্তা বলছে। হরিহর গোমস্তা খুশিখুশি মুখে বললেন, জানতাম পায়ের ধুলো দিলেই কাজ হবে। সে জন্যই তো শম্ভু আর বলাইকে পাঠিয়েছিলাম। যেখানে যে-অবস্থায় পাস, ধরে নিয়ে আয় গোসাঞিজিকে।

বড়গোসাঞি বললেন, মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন কোথায়?

টাউনে। খুব ভাল অবস্থা। জামাই কারবারি ছেলে। মস্ত ফ্যামিলি বলতে গেলে।

গোমস্তামশাই চাপা গলায় বললেন ফের, আসলে পাড়াগাঁয়ে মানুষ হয়েছে। টাউনের পরিবেশে মানিয়ে চলতে পারে না। তাছাড়া আমার বেহান একটু রগচটা স্বভাবের। বাড়িতে চার-চারটে বউমা। ভয়ে সিঁটিয়ে থাকে। বুঝলেন আশা করি।

হুঁ, সেটাই কথা। বড়গোসাঞি শ্বাস ছেড়ে বললেন। দেহে আত্মা আছে। আত্মা দুঃখ-কষ্ট পেলে দুর্বল হয়। তখন অশুভ শক্তি সহজে বাগে পায়। জামাইবাবু আসেন-টাসেন না আর ?

হরিহর গোমস্তা একটু চুপ করে থাকার পর বললেন, কিছু বুঝতে পারছি না। কী উদ্দেশ্য, কে জানে !

বড়গোসাঞি বললেন, সচরাচর একটা-দুটো দিন থেকে রুগীর অবস্থা দেখে তবে যাই। কিন্তু উপায় নেই। ব্রহ্মপুরে একটা রুগী দেখতে যেতে হবে। খুব সাংঘাতিক অবস্থা মেয়েটার। অবশ্যি এখনও বিয়ে হয়নি, ভাগ্যিস !

হরিহর গোমস্তা দুঃখিত ভঙ্গীতে একটু হাসলেন। একটা ব্যাপার বুঝি না। বলুন তো গোসাঞিজি, কেন এমনটা হয় ?

কী ?

এই ধরুন, খালি মেয়েদের ওপরই প্রেতশক্তির দৃষ্টি কেন ?

আহা, অবলা জাত ! বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না। কোমল মন।

কে জানে ! বলে গোমস্তামশাই নিজে ব্যাখ্যা করতে চাইলেন। আমার কিন্তু উল্টো ধারণা হয়। শোনেন তো বলি।

হুঁ, বলুন।

আপনি তন্ত্রসিদ্ধ পুরুষ। হরিহর গোমস্তা একটু কুণ্ঠিতভাবে বললেন। শুনেছি, তন্ত্রে শক্তিই মূলাধার। তিনি নারী। মহাকালী। অবশ্যি ওসব শাস্ত্র-টাস্ত্র আমার ভাল জানা নেই। তবে বিষয়ী মানুষ। সাংসারিক অভিজ্ঞতায় দেখেছি, মেয়েদের মন যেন শক্তই। আমরা যা সইতে পারি না, মেয়েরা তা হাসিমুখে পারে। অনেক মেয়ে দেখেছি, পুরুষমানুষের কান কাটতে পারে বিষয়বুদ্ধিতে। যেমন ধরুন, বেলপুকুরের নগেনের বউ। নগেনকে চিনতেও পারেন। নগেন মুহুরি। এখন বউয়ের দৌলতে বিরাট অবস্থা।

রোদ্দুর ফুটেছে দেখে বড়গোসাঞি আলোচনা চাপা দিয়ে বললেন, এখনই উঠতে হবে। নটা পাঁচে ট্রেন। কৈ, একবার মেয়েকে দেখে যাই, ডাকুন।

হরিহর গোমস্তা পা বাড়িয়ে হঠাৎ ঘুরলেন। বরং ভেতরে আসুন না!
রর ঘরে কেন? আপনি আমাদের আপনজন।

বড়গোসাঞি অগত্যা ভেতরে গেলেন।

উঠোনে সবে কয়েক খাবলা রোদ্দুর পড়েছে। কুয়োতলায় একটা মেয়ে
াড়ি-থালা নিয়ে ছাই ঘষছে। পাড়াগাঁয়ের গেরস্থ ভদ্রলোকের সকালবেলার
:সার যেমনটি হয়। জমিদারি আমলে গোমস্তাগিরি করে বিষয়সম্পত্তি ভালই
রে নিয়েছেন মনে হচ্ছিল বড়গোসাঞির। এই সময়টাই তাঁর মতো প্রেতসিদ্ধ
রুষের একটা সংকটকাল। কারণ রুগী এখন বেগড়বাঁই করলে আটকে
ড়বেন। পাওনাকড়িও আটকে যাবে। প্রথম দৃষ্টিতেই মনে হল, সংকট নেই।
কশোটা টাকা চোখ বুজে দাবি করা যায়। তবে পুরোটা পাবেন বলে মনে
় না। ঘোর বিষয়ী মানুষ হরিহর ঘোষ।

রুগী বড় চোখে দেখছিল। বড়গোসাঞি হাসলেন। কী রে মা? শরীর
মন এখন? বলে নিজেই নিজের মুখে জবাব দিলেন, ভাল আছিস। ভালই
কবি। চিন্তা কিসের? বাপের একমাত্র সন্তান। যা কিছু সবই তোর।
ন্নকষ্ট যার নেই, তার কষ্ট কী? শাস্ত্রে বলেছে অন্নই ব্রহ্ম। তুই তো
ন্নময়ী রে মা!

গোমস্তামশাই বললেন, প্রণাম করো মা! কালিকাপুরের বড়গোসাঞিজি!
া সিদ্ধপুরুষ।

রুগী রান্নাঘরের বারান্দা থেকে নেমে এসে নিঃশব্দে পায়ের ধুলো নিল।
়গোসাঞি মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন। তারপর খি খি করে
সলেন হঠাৎ।...এমন বড়লোকের মেয়ে তুই। তোর এ অবস্থা! আর কাল
ত্তিরে কী হল শোন্। তুইও মেয়ে, সেও একমেয়ে। মাঠের মাঝখানে রাস্তা
টকে বলে, কী আছে দে, নৈলে কোপ খাবি। এটাই তো সংসারের বড়
না। অন্নের ধান্দায়—আহারে!

রুগী শুনছিল। শুধু তাকিয়ে রইল।

গোমস্তামশাই অবাক হয়ে বললেন, সে কী! আপনার ওপরও?

হ্যাঃ। বড়গোসাঞি তাচ্ছিল্য করে বললেন। শেষে বাপ বাপ করে
লিয়ে বাঁচল!

গোমস্তামশাই বললেন, বড্ড বেড়েছে হারামজাদি। এবার শায়েস্তা না করলে
দেখছি!

চেনেন ? চমক খাওয়া গলায় প্রশ্ন করলেন তন্ত্রবাগীশ সিদ্ধপুরুষ।

চিনি। শক্ত মুখে হ'রহর গোমস্তা বললেন। আসলে পুলিশকে হাত কা ফেলেছে। ওদিকে মুরুব্বিও ধরেছে মনে হয়। আজকাল পাড়াগাঁয়ে শাসা বলতে তো কিছু নেই। আগের দিন হলে পঞ্চগ্রামী করে মাথা ন্যাড়া কর— আচ্ছা, দেখছি।

একটু হাসলেন বড়গোসাঞি। আপনাকে দেখতে হবে না গোমস্তামশাই আমিই দেখব'খন। বাড়ি কোথায়, কী নাম ?

সে খবর দেওয়ার আগেই গোমস্তামশাইয়ের বিধবা দিদি ঝাঁঝালো স্বরে ব উঠলেন, নিজের কথাটা আগে বলো ওঁকে। পঞ্চগ্রামী, মাথা-মুড়োনো, দেখছি টেখছি পরে কোরো।

বড়গোসাঞি তাকালেন হরিহর গোমস্তার দিকে। গোমস্তামশাই চটতে গি হেসে ফেললেন।—আর বলবেন না। আমাকেও পাঁচটাকা গচ্চা দিতে হয়ে একরাত্তিরে। তবে চেয়েই নিয়েছিল। কোপ মারবে বলেনি। ব্ল্যাকমেল— বলে চেপে গেলেন।

তাঁর দিদি বললেন, জব্দ করতে পারলে গোসাঞিজিই পারবেন। না ঠিকানা বলে দাও। অত ভয় কিসের ?

গোমস্তামশাই গলা চেপে বললেন, কপালীতলার কুঠো বাবুরামের বউ বাবুরাম লোকটা খারাপ ছিল না। রেলে গ্যাংম্যানের চাকরি করত কুষ্ঠব্যাধি হয়ে চাকরি গেল। কাটোয়ার ওদিক থেকে ভাগিয়ে এনেছি মেয়েটাকে।

বড়গোসাঞি দ্রুত বললেন, আর বলতে হবে না।···

তাহলে সেই ! ধুলোয় ধূসর রাস্তায় স্টেশনের দিকে যেতে যেতে ভাবছিলে বড়গোসাঞি। একটা বছরে কী অদ্ভুত পরিবর্তন ! জীবিতদের স্বভাবের সা মৃতদের স্বভাবের এখানেই তফাত। মৃতেরা একরকমই থেকে যায়। জীবিতর বদলায়। কপালীতলা স্টেশনের সিগন্যালপোস্টের কাছে শেষ হেমন্তের স্নিগ্ধ সন্ধ্যায় মুখ ফসকে অথবা ঝোঁকের মাথায় বলে ফেলেছিলেন, মরবি কেন মা এ বয়সে ? অন্ন জোটে না—কাজকর্ম করে খা। যদি তাও না জোটে মেরেধরে কেড়েকুড়ে খা—সেও ভাল। মরা ভাল না। মরলে ভূতপ্রেত

হবি। নিজে কষ্ট পাবি, অপরকেও কষ্ট দিবি। তার মানে আমাকেই ভোগাবি আর কী!

হাসতে হাসতে উপদেশ। ঝুলি থেকে মড়ার খুলিটাও দেখিয়েছিলেন। এই ভাখ, এ এক আবাসীর বেটি। কামরূপ কামিখ্যের নাম শুনেছিস? সেখানকার মেয়ে। অন্ন জোটে না বলে রাতবিরেতে উঠোনের গাছে ঝুলে পড়েছিল। যাক সে-সব কথা। আসল কথাটা হল, বেঁচেবত্তে থাকতে হলে বুদ্ধিশুদ্ধি চাই। স্টেশন থেকে বেরিয়ে রেললাইনের ওপারে খানিকটা হাঁটলে ছোট্ট নদী কপালী। তার পাড়ে উঁচু মাটির ওপর তেমনি ছোট্ট একটা বসতি। গ্রামসমাজের নিচুতলার মানুষজনের সংসার। নদীটার তলায় এই শীতের মাসে চাপ-চাপ বালি, আব্রুহীন লাগে। একচিলতে জল ছটফটিয়ে যন্ত্রণার মতন বয়ে যাচ্ছে। মনে পড়ল, গত বছর শেষ হেমন্তের সন্ধ্যায় হাঁটুজল ছিল। সেই জল পেরিয়ে খাড়া পাড়ে উঠে পায়ে চলা একফালি সরু পথ ঝোপজঙ্গলের ভেতর দিয়ে এগিয়ে কুঠো বাবুরামের বাড়ি। বাড়ি মানে একটা নিচু, হুমড়ি খেয়ে পড়া ঘর মাত্র। মাটির দেওয়াল, সিটিয়ে থাকা খড়ের চাল। উঠানে একটা পেয়ারাগাছ, পঞ্চমুখী জবাফুলের ঝাড়। লম্পের আলোয় অবাক হয়ে ফুলগুলো দেখতে দেখতে কেন মাথায় এসেছিল কে জানে, এইসব সুন্দর-সুন্দর জিনিস সত্ত্বেও পৃথিবীতে অন্নকষ্ট নামে একটা ঘটনা আছে। সেই কষ্ট রেললাইনে মরতে নিয়ে যায় মানুষকে। অবশ্য কথাটা কুঠো বাবুরামকে খুলে বলেননি। শুধু ইশারায় সাবধান করে দিয়েছিলেন তার বউসম্পর্কে। তখন মেয়েটি অজ্ঞান। কোমলতা মৃত্যুর আবেগ সামলাতে পারে না। অনেক চেষ্টার পর জ্ঞান ফেরাতে পেরেছিলেন। দুটো টাকা জোর করে গছিয়ে দিয়েছিলেন।

ট্রানজিস্টারের গানবাজনা কানে এল বড়গোসাঞির। সরু রাস্তার শেষে পৌঁছে থ হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। পেয়ারাগাছটা আছে। পঞ্চমুখী জবাঝাড়টাও আছে। কিন্তু ছোট্ট ঘরটাতে এখন টালির চাল। তকতকে নিকোনো দাওয়া। ঝকঝকে উঠোন। উঠোনে চট বিছিয়ে বিক্ষত দুটি পা ছড়িয়ে বসে বাবুরাম ট্রানজিস্টার বাজাচ্ছে। বড়গোসাঞি মনে মনে বললেন, ভাল। খুব ভাল। মুখে অভ্যাসমতো ডাকলেন, মা রে!

ঘর থেকে বেরিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে গেল বাবুরামের বউ, এক হেমন্তশেষে যে সিগন্যালপোস্টের কাছে মরবে বলে দাঁড়িয়ে ফুঁসছিল। বড়গোসাঞি বললেন, মা রে কেমন আছিস?

বাবুরাম ঘুরে চেনার চেষ্টা করছিল, ট্রানজিস্টারের আওয়াজ কমিয়ে দিয়ে। তার বউয়ের পরনে ডোরাকাটা হলুদ-কালো শাড়ি। ছুটে এসে বড়গোসাঞির পায়ে লুটিয়ে পড়ার মতো প্রণাম করল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে আস্তে বলল, জানতাম, বাবার দেখা পাব। তাই ঘরে আছি।

বলে ঘর থেকে একটা মোড়া এনে বাবুরামের অনেকটা তফাতে রোদ্দুরে রাখল।

বড়গোসাঞি বসে বললেন, বাবুরাম, আমি কালিকাপুরের গোসাঞিজি। সেই যে গতবছর সন্ধেবেলা—

বাবুরাম গোঙানো গলায় বলল, চিনেছি।

তারপর সেখান থেকেই ঝুঁকে দুটি বিকল হাত বাড়িয়ে নমো করল।

ওষুধ দিয়েছিলাম। খাওনি বোঝা যাচ্ছে। বড়গোসাঞি বললেন। কেন রে বাবা? বিশ্বাস হয় না?

বাবুরাম ভুতুড়ে কণ্ঠস্বরে বলল, কালরোগ গোসাঞিঠাকুর। কিছুতে কিছু হবে না।

তার বউয়ের মুখটা নিচু। পায়ের বুড়োআঙুলে উঠোনের খটখটে শক্ত মাটিতে আঁক কাটছে। বড়গোসাঞি একটু হেসে বললেন, গিয়েছিলাম কাপাসির গোমস্তামশাইয়ের বাড়ি, তার মেয়েকে দেখতে। আসলে মেয়েরা যতক্ষণ অবলা হয়ে থাকে, ততক্ষণ দুঃখকষ্ট লাঞ্ছনা। রুখে দাঁড়ালেই সব চলে যায়। ইশারায় বলে দিলেও তো সবাই বোঝে না—কেউ কেউ বোঝে। এই আমার কথাই ভেবে ছাখ না রে মা। আমি কামরূপ-কামিখ্যের লোক। তোদের দেশে প্রায় দেখতে দেখতে বিশ-বাইশবছর কেটে গেল। ছিলাম বরগোহাঞি, হয়েছি বড়গোসাঞি। বেশ—ভাল। কিন্তু নিজের মেয়েটাকেই বোঝাতে পারিনি। উঠোনের গাছে ঝুলে—তো এই ছাখ্, এখনও তাকে সঙ্গে করে ঘুরছি।

বড়গোসাঞি ঝুলি থেকে মড়ার খুলিটি বের করলেন। ধরা গলায় ফের বললেন, কষ্ট পাওয়া মেয়েগুলোর সব কষ্ট এর মধ্যে চালান করে দিই। গোমস্তামশাইয়ের মেয়ের গুলোও দিয়েছি। এর মধ্যে অনেক কষ্ট ঠাসা। হাসতে লাগলেন বড়গোসাঞি। অবশ্য তাঁর এই হাসিতেও কষ্ট আছে। হাসির সঙ্গে কান্নার ওতপ্রোত শব্দও খুঁটিয়ে শুনলে টের পাওয়া যায় হয়তো।

খুলিটা দেখে প্রাক্তন গ্যাংম্যান অদ্ভুত হাসতে লাগল। তার বউ খুব আস্তে বলল, ক্ষ্যামা দেবেন বাবা!

বড়গোসাঞি খুলিটা ঢুকিয়ে রেখে বললেন, আসব জানতিস বললি!

ক্ষ্যামা দেবেন। ভুল হয়েছিল।

ছেড়ে দে। গাড়ির সময় হয়ে এল। উঠি।

এইসময় এক ঝাঁক মেয়ে এল, কলকলিয়ে আসা পাখিরই ঝাঁক। কারুর
াখে, কারুর মাথায় ছোট-বড় পুঁটুলি। সল্লাদি, যাবে না নাকি গো আজ?
ড়ির সিগন্যাল পড়েছে হুই দ্যাখো। বলে জবাব না শুনেই হন্তদন্ত নদীর
ক ঝোপঝাড়ের ভেতর চলে গেল।

বড়গোসাঞি নিমেষে বুঝলেন ওরা চাল-চালানী মেয়েরা। বললেন. আয়
় মা! কারবার বন্ধ রাখতে নেই। যাবি তো, আয়। সিগন্যাল দিলে কী
বে, গাড়ির সময় আছে।

াবুরামের বউ সল্লা—সরলা একটু হাসল। আজ থাক্। কত ভাগ্যে
লেন। বসুন। নতুন এনামেলের হাঁড়ি আছে ঘরে। চালডাল দিচ্ছি।
াকুড়তলায় মায়ের থানে গিয়ে রান্না করুন।

বড়গোসাঞি প্রাণ খুলে হাসলেন। কেন রে মা? তোর সোয়ামির অসুখ
ল পাকুড়তলার থানে গিয়ে রাঁধব? উঠে দাঁড়িয়ে নদীর ওপারে সিগন্যালের
কে তাকালেন একবার। ফের বললেন, ব্রহ্মপুর এই গাড়িতে না গেলেই নয়।
ালে দুমুঠো খেয়ে যেতাম। তান্ত্রিক হলে মড়ার মাংসও খেতে হয়, আর এ
তা অন্ন।

বাবুরামের বউ পেছন-পেছন আসতে লাগল। বাবা, রাগ করেননি
তা?

সাবধানে থাকিস রে মা! খুব রটে গেছে। গোমস্তামশাই বলেছিলেন—

সে নিজে কী? লোকদের ঠকিয়ে সর্বস্বান্ত করে পয়সা করেনি?

নদীর পাড় ঢালু বেয়ে নামার এময় ঘুরে দাঁড়ালেন বড়গোসাঞি। হলুদ-
ালো ডোরাকাটা শাড়ি, বাঘিনী দেখাচ্ছে। দুচোখে জিঘাংসা। শেষ
মন্তের দিনশেষে সিগন্যালের কাছে নিজের অজ্ঞাতসারে হিংস্র এক প্রাকৃতিক
ক্তিকেই কি জাগিয়ে দিয়েছিলেন প্রেতসিদ্ধ তান্ত্রিক? এখন তাকে সামলায়
ক? আইন আছে। থানাপুলিশ আছে। সরকারবাহাদুর আছেন। সবই
াসলে নিমিত্ত মাত্র—ভড়ং। মানুষ কতকিছু দিয়ে নিজেকে ঢেকে রাখে।
থচ জীবজগৎ চলেছে আপন নিয়মে। কে কাকে সামলায়. পারে সামলাতে?
ছু বললেন না কালিকাপুরের বড়গোসাঞি। কিছু বলারও নেই।

ঝিরঝিরে ছুটফাটিয়ে চলা জলধারাটুকু ডিঙিয়ে গিয়ে পেছনে ফের শুনলে ক্যামা দেবেন বাবা! তারও পেছনে ট্রানজিস্টারের জোয়ালো আওয়া পৃথিবীর কান ঝালাপালা করে দিচ্ছে।

মহারাজা

মহারাজা কে ভাই?

মহারাজা তখন একটা সাইকেলের সামনের চাকার লিক খুঁজছিল তার মাথার ওপর চেনে বাঁধা হুকে সেই সাইকেল সামনে পা তুলে হ্রেষাধ্বনি করা ঘোড়ার ঢঙে ঝুলছিল। এনামেলের বড় একটা গামলায় ময়লা জল জলে টিউব ডুবিয়ে লিক খুঁজে সে খড়ির চৌকো চিহ্ন দিচ্ছিল। ধীরেসুস্থে মাথা একটুখানি ঘুরিয়ে চোখের কোণায় লোকটাকে দেখে নিয়ে সে বলে কেন?

আওয়াজটা ভারি। এখনই ঘুমভাঙা মানুষের। আর মহারাজার চোখের তলায় ফুলো ভাব, যা সারাক্ষণ তাকে ঘুমভেঙে ওঠা দেখায়। কিন্তু তার গলার ওই ছোট্ট আওয়াজে বাড়তি কিছু আছেই। খাঁচার বাঘ গরগর করে ওঠার মতো। নাকি পোড়ো পুরনো ঘরের দরজা খোলার মতো। আগন্তুক তাকে দেখে ভড়কে যায়। যে ছিমছাম চটুল ধূর্ত বাবুপনা সে বয়ে এনেছিল, তখনই উবে যায়। সে একটু হাসবার চেষ্টা করে। বলে, আপনি মহারাজা?

হুঁ। কী?

কথা ছিল। বলে লোকটা শার্টের পকেট থেকে সিগারেট বের করে। মহারাজার দিকে এগিয়ে দেয়।…আমি ঘোষহাটির সুলেমান। সাবরেজেস্টারি আফিসে দলিলপত্তর লিখিটিখি। দেখেও থাকবেন। আপনাদের এখানে চেনাজানা অনেক আছে। হেঁ হেঁ…নিন ভাই। শুধু আপনার সঙ্গেই চেনা ছিল না।

সুলেমান মুহুরির সিগারেটের প্যাকেট দেখে নিয়ে মহারাজা বলে, খাইনে। বলুন।

সুলেমান মুহুরি স্বভাবত চতুর মানুষ। জমিজমা সম্পত্তির ব্যাপারে কত ঘড়েল তাকে নাড়াচাড়া করতে হয়। দেখে-দেখে মানুষের অনেকখানি সে

বুঝে নিয়েছে। মহারাজাকে সামলাতে কতটা কী করতে হবে, সে জানে। কিন্তু মন জানে না। যে মামলা নিয়ে এসেছে, তা স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির ব্যাপার নয়—একেবারে অন্যরকম।

ভেবেছিল, বেশিক্ষণ বসা যাবে না এখানে। ঝটপট আঁচ বুঝে কেটে পড়তে হবে। কিন্তু বলুন শুনে টুলে বসে পড়ে সে। পিঠ থাকে রাস্তার দিকে। বিকেলের রোদ ঘরবাড়ি আর গাছপালার মাথায় চড়চড় করছে। রাস্তায় ছায়া। এ রাস্তা জাতীয় সড়ক নম্বর চৌত্রিশ। বাস চলছে। লরি চলছে। রিকশা চলছে। সাইকেল চলছে। আর মানুষ। আর বিবিধ আওয়াজ। আর বিড়ি সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধের সঙ্গে মিশে পেটরোল-ডিজেলের গন্ধ। শালা শান্তিই ঘুচে গেছে মানুষের জীবন থেকে! সুলেমান মুহুরি তেঁতো গেলার মুখ করে বলে, আপনার বন্ধু মাখন আমাকে চেনে। ওকে নিয়ে আসব ভেবেছিলুম। নেই। অগত্যা কপাল ঠুকে সোজা চলে এলাম। যা হয় করুন, ভাই।

মহারাজা এবার ওঠে। ছোঁড়াটা কখন গেছে বীণাপাণি স্টোর্স থেকে সলিউশন আনতে। গাড়ি চাপা পড়ল নাকি? একবার রাস্তার দিকে ঝুঁকে দেখে নেয় সে। তার একটা হাত যেখানে পড়েছে, সেখানে ছোট্ট একটুকরো আলকাতরা মাখানো টিনে সাদা হরফে লেখা আছে: 'এখানে সাইকেল সারান হয়।' তার তলায় আরও বড় হরফে 'মহারাজা।' নিজের হাতেই লিখেছে। সে ঘুরে সুলেমান মুহুরিকে দেখে। লোকটার বয়স চল্লিশ-বিয়াল্লিশ হবে। চুলে পাক ধরেছে। হাড়জিরজিরে চেহারা। পানের ছোপে দাঁতগুলো কালো। ঠোঁটের মাঝামাঝি শ্বেতকুষ্ঠের মতো সাদা দাগ। দাড়িগোঁফ অন্তত দিন কামায়নি। দাড়ির খোঁচাগুলো স্রেফ সাদা। ঘিয়ে রঙের টেরিলিনের শার্টের বুকপকেটে নোট বই আছে। দুটো কলম আছে। উস্কোখুস্কো চেহারা। চেহারায় ঝড়ঝাপটার ছাপ আছে। আর ঝড়ঝাপটা না খেলে এমন করে তা মহারাজার কাছে কেউ আসে না। ওর কাঁধে ময়লা একটা ব্যাগ ঝুলছে। ব্যাগটা কাগজপত্তরে ঠাসা। পায়ের ওপর পা তুলে বসে দুই উরুর মধ্যে হাতটা রেখেছে। বাঁ-হাতে একটা নতুন ছাতা। এখনও মোড়কবন্দী। ডান হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। মহারাজার চোখে চোখ রাখতে না পেরে নিজের আঙুল দুটোর দিকে দৃষ্টি নামায়। মহারাজা বলে, ওয়াইফ? বলেই মুখটা ফিরিয়ে রাস্তার দূরের দিকে ছোঁড়াকে খুঁজতে থাকে।

অমনি সুলেমান মুহুরি বাসরঘরের দরজায় লাজুক বরের মতো রাঙা হ
বলে, আপনি জানেন তাহলে ? হুঁ—জানার কথা বইকি। ঢেকে-চে
রাখতে চাইলে কী হবে ? আজকাল কিছুই আর চাপা থাকে না।

মহারাজা মাথা দুলিয়ে বলে, জানিনে। আমি কেমন করে জানব, বলুন

চমকে গিয়ে সুলেমান বলে, তবে ?

মহারাজা একটু হাসে।...আপনাকে দেখে মনে হল। তাছাড়া কেনই
আসবেন ?

খোঁচা-খোঁচা দাড়িতে হাত বুলিয়ে সুলেমান হেঁ হেঁ করে একটু হাসে
তারপর গম্ভীর হয়ে যায়। বলে, মনে তো হবেই। মানুষের শিখতে দিন য
ভাই ! বেশ কাটাচ্ছিলাম। হঠাৎ ওই বদখেয়াল চড়ে বসল মাথায়। অনে
বারণ করেছিল ! শুনলাম না। শেষ বয়সের কথা ভেবেই পা বাড়ালাম। তো

কোথাকার মেয়ে ?

সোনাডাঙার।...সুলেমান প্রাণ খুলে দেবার ভঙ্গীতে বলতে থাকে।
তিন বোনের ছোট বড় দুটির বিয়ে হয়ে গেছে। ছোটর বেলায় প্রা
হাভেতে অবস্থা হয়ে এসেছিল। শেষ সম্বলটুকু আমার শ্বশুর বেচতে এল
সঙ্গে আমার ওয়াইফও ছিল। কথায় কথায়...হেঁ হেঁ, আমারও শালা বে
খারাপ হয়ে গেল। তো ভাই, প্রথম-প্রথম বেশ শান্তিতে কাটল। ভাবল
ঘোষহাটি ছেড়ে আপনাদের এখানেই বাড়ি-টাড়ি দেখব। থাকব। রো
কাঁহাতক পাঁচ মাইল ঠ্যাঙানো যায়। তো তারপর ক্রমশ অশান্তি শুরু হল
হুট করতেই ঝগড়াঝাটি। চেঁচামেচি। বাপমা তুলে শাপান্ত। শেষে একদি
রাগের মাথায় চড় মেরে বসলাম। না খেয়েই কাজে চলে এলাম। ফি
গিয়ে দেখি, বাপের বাড়ি চলে গেছে। মজার কথা, গয়নাগাঁটি সব রেখে এ
কাপড়ে গেছে। এ হল গত মাসের কথা। তারপর গত পরশু অব্দি বারদশে
হাঁটাহাঁটি করেছি। বুঝিয়েছি। সেধেছি। মেয়ের যেমন গোঁ—বাপের
তেমনি। শ্বশুর শালা আবার বলে কি জানেন ? আমার মেয়েকে লাঞ্ছনা
একশেষ করেছ। ডিভোর্সের মামলা হবে। শুনুন কথা। আমি ডিভো
দেব, না মেয়ে হয়ে ও ডিভোর্স দেবে ? সে রাইট ওর আছে ?

সুলেমান রাগে হাঁসফাঁস করে। বকের মতো মুণ্ডু বাড়িয়ে রাস্তায় থু
ফেলে। নিভে-যাওয়া সিগারেটটা জেলে নেয়। তার হাতের কাঁপুনি দেখতে
পায় মহারাজা। সে ফের ঝুলন্ত সাইকেলটার কাছে গিয়ে বসে। বাতি

টিউব থেকে রবারের টুকরো কাটতে থাকে। বলে, বয়েস কত আপনার ওয়াইফের ?

সুলেমান প্রেমিকের গাঢ় স্বরে বলে, বাইশ-টাইশের বেশি নয়। একেবারে ছেলেমানুষ। বুদ্ধিসুদ্ধি তেমন থাকলে কি মুখের ভাত ফেলে পালায় কেউ ? দেখতে শুনতেও পাঁচটার একটা। অন্য কোন দোষ নেই, বুঝলেন ? শুধু মেজাজ আর বোকামি।

এই সময় মহারাজার ছোঁড়াটা আসে। সলিউশানের কৌটো দিয়ে সুলেমান মুহুরিকে দেখতে থাকে। মহারাজা বলে, এত দেরি কেন রে ? বাবার বিয়ে দেখছিলি নাকি ?

ছোঁড়াটা দাঁত বের করে বলে, ইসমাইলদারা মারামারি করছিল।

কোথায় ?

হোটুবাবুর গদির সামনে।

হল নাকি কিছু ?

উঁহু। মিটে গেল।...ছোঁড়াটা হতাশভাবে হাই তুলে হাফপেন্টুলের বোতাম খুঁটতে থাকে।

দুটো চা আন।...মহারাজা বিরহী মুহুরির দিকে ঘোরে।...চা খাবেন তো ?

সুলেমান গলে গিয়ে বলে, খাবো। এই ! পয়সা নিয়ে যা বাবা !

থাক।

না ভাই ! আমিই না হয় দিলুম। এই যে। নে বাবা ! মহারাজাবাবু পান খান তো ?

মহারাজা মাথা নাড়ে। ছোঁড়াটা পয়সা নিয়ে চলে যায়। সুলেমান বলে, অনেকের অনেক বড় বড় কেস উদ্ধার করেছেন। এবার আমারটা করুন, ভাই ! এতে কোর্টকাছারি থানা পুলিশের হাঙ্গামা যদি হয়, সে দায় আমার। তবে সে চান্স নেই। লড়বে কী দিয়ে বলুন ? মুখে যাই বলুক, আমি তো দেখলুম, কচুপাতা তুলছে কোঁচড়ভরে। দেখে কী যে কষ্ট হল ! দুবেলা মাছ-মাংস দুধ-ঘি খেয়ে অরুচি ধরেছিল যেন। একেই বলে, মানুষকে কখনও কখনও ভাতেই কামড়ায়। তাই না ?

মহারাজা তেমনি ভারি গলায় বলে, আজকাল ওসব লাইন ছেড়ে দিয়েছি। পুলিশ কড়া হয়েছে। আপনি বরং আপনাদের গাঁয়ের মাথাটাথা কাউকে একবার পাঠান। ট্রাই করুন। মিটে যাবে।

সুলেমান দমে গিয়ে বলে, সে কি আর না করেই আপনার কাছে এসেছি ! এখন বল বল বাছুর দল। নিদেন কথা, মহারাজাবাবু ! এ মামলা আপনাকে নিতেই হবে। খরচ যা নেবেন, নিন।···

এই নিয়ে দুবার মহারাজাবাবু। মহারাজা বুঝতে পারে, লোকটা সম্ভবত জমিজমার দলিল লিখতেই ব্যস্ত থেকেছে। তার বাইরের খবরাখবর বিশেষ রাখেনি। এতেই মুশকিলে পড়ে গেছে। আর সেই মুশকিলের আসান পেতে কার মুখে শুনেটুনে তার কাছে এসে পড়েছে। শুনেই চলে এসেছে নিশ্চয়। নয়তো প্রথমে 'সেলামালেকুম' আওয়াজটা দিত। জাত-ভাই তুলে কথা পাড়ত। তবে এও ঠিক, সবাই তাকে মহারাজাবাবু বলেই ডাকে। মিলিটারি থেকে ফেরার পর কে জানে কেন লোকে তাকে বাবু বলতে শুরু করেছিল। প্রথম কিছুদিন বাবু সেজে থাকত বলে হয়তো। ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবি আর পায়জামার ঢঙে চিকন ধুতি পরত। মুখে স্নোপাউডার মাখত। সেন্ট ছড়াত রুমালে। সারাদিন এই বাজারে এখানে-সেখানে ইয়ারদের সঙ্গে আড্ডা দিয়েই কাটাত। যুদ্ধের গল্প করত। তখন খুব কথা বলার অভ্যেস ছিল তার। ক্রমশ টের পেয়েছিল, তার দাম দিনে দিনে বেড়েছে। অতএব তার কথার দামও বেড়েছে। তখন সে কম কথা বলতে শুরু করে। খোলামেলা হাসিকে অনেকটা গুটিয়ে আনে। যা বলে, তা করার হিম্মত হলে মানুষের চেহারায় দুর্গের আদল ফুটে ওঠে। তার ভেতরে ঢোকা কঠিন। দূর থেকে দেখে লোকে ভয় পায়।···

এত সব ইয়ার বন্ধু, তবু মাঝেমাঝে দুর্দিনও গেছে মহারাজার। পুলিশের চাপ এসেছে। ইয়াররা তখন কে কোথায় গা ঢাকা দিয়েছে। মহারাজা মিলিটারিতে কিচেনবয় ছিল। নেহাত মিলিটারি কথাটার খাতিরেই সে আক্কেলসেলামি দিয়ে কোনরকমে পার পেয়েছে। তারপর কিছুদিন বেশ ভাল ছেলে হয়ে এটা-ওটা নিয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা করেছে। চুড়ি সাবান ফুলেল তেলের ছোট্ট দোকান করেছে। কখনও ছোটখাট রকমের আলুর কারবার। কখনও মরশুমে আমকাঁঠাল চালানদারি। তারপর মাস দুই কসাই হয়ে খাসির মাংস বেচত। বাজারের শেষে বাঁকের মুখে নীচু বকুল গাছ। আর ডালে অমনি হুকে কাটা খাসি ঝুলিয়ে রাং সিনা গর্দান টুকরো টুকরো করত। মুখটা ছিল তখনও এমনি গম্ভীর। কিন্তু পোষায়নি শেষঅব্দি। বাকিতে মাংস বেচে পকেটের নগদ টাকা বের করে গাঁয়ে-গাঁয়ে ঘুরে খাসি কেনার অনেক হুজ্জত।

বাকিতে খেয়ে লোকে রটাত, মাংসে ভেজাল চালায় মহারাজা। দুচারজন তার হাতে পিটুনি না খেয়েছিল, এমন নয়। কিন্তু বিরক্ত হয়ে ছেড়েই দিল অবশেষে।

কিন্তু একটা কিছু আইনমাফিক নিয়ে থাকতে হবে। আর হাঙ্গামাবজ্জত ভাল লাগে না। তাই সাইকেল মেরামতের কাজ নিয়েছে। সে নিজে ছোট-খাট সারাইয়ের কাজ করতে পারে। বড় আর জটিল কাজের জন্যে একজন মিস্তিরি রেখেছে। আজ সে আসেনি। তাই বলে কাজ বন্ধ রাখা যায় না। লিক সারাতেই একগাদা সাইকেল জমেছে সকাল থেকে। ছোঁড়াটাও খুব খেটেছে। এক কৌটো সলিউশান শেষ দুপুর হতে-হতে।···

সুলেমান মুহুরি ততক্ষণে আরও দমে গেছে। খরচের কথা শুনে মহারাজা যেন আরও গম্ভীর হয়ে গেল। পকেটে যা আছে তার বাইরে হাঁকলেই হয়েছে। টাকাটা নিজের নয়। সবে বর্ষা নেমেছে। জমি বিক্রির বাজার এখন একটু মন্দা। ভাদ্র-আশ্বিনে বাজার উঠবে। অভাবী লোকের তখন দম যায়-যায় অবস্থা। নিজেকে বাগ মানাতে পারে না। বেচে দেয় সবুজ ধানসুদ্ধ ক্ষেত। বর্ষায় চাষ দেবার সময় ভেবেছিল, চার-পাঁচটা মাস কোনরকমে সাঁতরে পার হয়ে যাবে। পারে না। সময় তখন কাছিমের মতো হাঁটে। আর সুলেমানদের তখন দলিল লিখতে-লিখতে আঙুল ব্যথা। পকেট ভারি হয়ে ওঠে। এখন পকেট প্রায় খালি বললেই চলে—বিশেষ করে সুলেমানের। বউ পালিয়ে যাওয়ার পর থেকে এই অবস্থাটা আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে।

তবে বেশি সুখ সইল না মাগীর, বাপের জন্মে তো দেখেনি চোখে। বাপ কিনা বেগুন বেচে খায়। আবার বড়াই করে বলে, আমরা খান্দানী মিয়াঘর। বলে—খোদার মার খাচ্ছি। নৈলে কি এ বাড়ির মেয়ে তুমি পেতে? ঘোষ-হাটিতে মেয়ে দিয়েছি—এতেই আত্মীয়কুটুম্বের মধ্যে বদনামের শেষ নেই। দেখলে তো বাবাজী? বিয়েতে রাগ করে কেউ এলই না!

এল না ওটা বিশ্বাস করেনি সুলেমান। এসে বেগুনপোড়া চুষত নাকি? বিয়ের বরযাত্রীবাবদ খাওয়া-দাওয়া সব খরচ তাকেই দিতে হয়েছে। শ্বশুর এক পয়সা ঠেকায় নি। কোত্থেকে ঠেকাবে? এই বর্ষায় ঘরের খড়ের চালের যা অবস্থা। বাপবেটি রাত কাটায় কীভাবে সুলেমান টের পেয়েছে। অথচ মাগীর রাজশয্যায় ঘুম হল না! ভূতের কিল একেই বলে।···

সুলেমানের তেঁতো মুখের সামনে হাফপেন্টুল পরা ছোঁড়াটা এসে চায়ের

গেলাস ধরে। তখন মিষ্টি হাসে সে। না হেসে উপায় নেই। গুণ্ডাটাকে রাজী করাতেই হবে। সে অন্যদিক থেকে চেষ্টা করে। বলে, যাকৃগে। কাজের কথা তো হচ্ছে। মহারাজাবাবুর বাড়িটা এখানে কোথায় ভাই ?

মহারাজা চায়ের গেলাসে চুমুক দিয়ে আচমকা বলে, দেখুন—দুশো টাকা লাগবে।

আর দুশো টাকার ঘা খেয়ে সুলেমান মুহুরির হাতের গেলাস নড়ে ওঠে। তার মুখে হাসি ছিল। এখন সেটা কালো-কালো কয়েকটা দাঁত হয়ে ওঠে। হ্যাঁ, গুণ্ডা তো এমনি হয়। তোমার-আমার মতো হলে সে গুণ্ডা হবে কেন ? এই মহারাজা নাকি এগাঁ ওগাঁ গিয়ে জমিজমা দখল করে দেয়। সঙ্গে ক'জন মাত্র চেলা থাকে। বোমা নিয়ে যায় ব্যাগভর্তি। বন্দুক পিস্তলও নাকি থাকে। আজকাল লোকে গাঁয়ের লাঠিয়ালদের ডাকে না। লাঠির কারবার উঠে গেছে। বোমার কারবার আজকাল। মাঠের আলে দাঁড়িয়ে দুমদাম বোমা ফাটালেই অন্যপক্ষ পালিয়ে বাঁচে। গাঁয়ের দুষ্টরা বোমা চিনেছে। পাইপগান পিস্তল চিনেছে। লাঠিয়ালের বদলে গুণ্ডা কথাটা এসে বসেছে। আগের দিন হলে সুলেমান এ শালার কাছে আসত না। পাড়ার যোয়ান ছেলেদের জুটিয়ে চলে যেত সোনাডাঙা। দিনদুপুরে হাসমতের মেয়েকে ধরে নিয়ে আসত। কিন্তু সোনাডাঙার অবস্থাও গেছে বদলে। উঠতি মাস্তান জুটেছে কিছু। তাদেরও নাকি বোমা-পিস্তল আছে। সেই ভয়েই মহারাজার কাছে আসা। কিন্তু দুশো টাকা !

সে করুণমুখে বলে, দুশো ? বড় বেশি হয়ে গেল না মহারাজাবাবু ?

ওসব কাজ আজকাল করিনে। নেহাত বলছেন, তাই।···মহারাজা উঠে গিয়ে জলন্ত বাল্বটা সুইচ টিপে জেলে দেয়। ফের বলে, পুরোটা অ্যাডভান্স লাগবে। সঙ্গে আপনাকেও থাকতে হবে। ব্যস। এক কথা। বলুন।

জাতীয় সড়ক নম্বর চৌত্রিশের চেহারা বদলেছে ততক্ষণে। ছায়া ঘন হয়েছে। আলোর ছটা ঝিলিক দিচ্ছে। সবরকম আওয়াজ আরও গম্ভীর হয়েছে। আর ওদিকের বাঁক থেকে মোটরগাড়ির জোরালো আলো এসে মহারাজাকে ঝলসে দিয়ে যাচ্ছে। তখন সুলেমানের মনে হচ্ছে, শালা আর কসাই। খাসি কেটে মাংস বেচার কথাটা তাহলে ঠিকই শুনেছে। তো এমনিতেই জবাই হয়ে আছে সুলেমান মুহুরি।

প্রায় চোখ বুজেই সে বুকপকেট থেকে নোটবই বের করে। তারপর কাঁদো কাঁদো মুখে বলে, তাই সই। কিন্তু···

কী বলতে চায় বুঝে মহারাজা কথা কাড়ে।…বেইমানী করিনে। কাজ না হলে ফেরত দেব।

দুখানা একশো টাকার নোট বের করে সুলেমান। টাকাটা লক্ষীর খাতে যাচ্ছে। কোনরকমে ঘরে ফিরিয়ে আনতে পারলে দেখা যাবে। দরজায় তালা দিয়ে রাখবে। পাশের বাড়ির দজ্জাল বুড়িটাকে পাহারায় বসাবে। আগের দিনে পালিয়ে যাওয়া বউ ধরে আনলে ওই ঝুলনবাড়িই তাকে বশ মানাবার দায়িত্ব নিত। এখনও বুড়ি কমজোর হয়নি। নিজের বেটার বউদের হেসো দেখিয়ে জব্দ রাখে। ব্যাপারটা তাকে বলে কয়েই এসেছে সুলেমান। বুড়ি বলেছে, আমি এখনও মরিনি। একবার এনে জিম্মা দে। দেখবি ঠিক হয়ে যাবে বাপের বেটি। চুল পাকিয়ে ফেললাম না?

যদি ফলিডল-টল খায় রাগের বশে?

বুড়ি বলেছে, ফলিডল খাওয়া মেয়ে নয়। আমি বউমানুষ চিনি।

যদি গলায় দড়িটড়ি দেয়?

ঝাঁটা মার্! দেবে কখন? তুই এনে তো দে।…বুড়ি পান খেতে খেতে ফোকলা দাঁতে হেসেছে। মেয়েমানুষ পুরুষের গায়ের জোরে বশ। তুই যে মেয়েমুখোর হদ্দ।

সুলেমান নোটদুটো মহারাজার হাতে গুঁজে দেয়। মহারাজা হাওয়াই শার্টের বুকপকেটে রাখে। তারপর বলে, বলুন—কবে যাবেন?

টাকা দিয়ে সুলেমান বদলে গেছে। চঞ্চল ধূর্ত আর সাহসী চেহারা। ফিস্‌ফিস্ করে বলে, আজ রাতে পারেন না? এমনভাবে বলে, যেন টাট্টু ঘোড়া। শ্যামলা মুখে রক্ত জমেছে। চোখদুটো জ্বলছে। আলোয় কালো দাঁতগুলোও ঝিকমিক করছে।

মহারাজা একটু ভাবে। তারপর বলে, ঠিক আছে। আপনি ততক্ষণ চেনাজানা কোথাও বসুন। ন'টা নাগাদ ওই চায়ের দোকানে আসবেন। আমি থাকব।…

কোণের দিকে দড়িতে প্যাণ্ট ঝুলছে। লুঙি রেখে প্যাণ্টটা পরে নেয় মহারাজা। এখন তাকে সত্যিকার ভদ্রলোক দেখাচ্ছে। চিরুনী বের করে চুল আঁচড়ায়। তার চেহারাটি সুন্দর। মিলিটারিতে থাকার সময় বয়স ছিল মোটে ষোল-সতের। গোরারা পাছায় চিমটি কাটত। বর্মার এক বাঁশের জঙ্গলে সে এক গোরার বুকে কুকরি বসিয়ে দিয়েছিল। ভাগ্যিস, তখনই

আচমকা আপানীরা হামলা করল। ওদের ঘাড় দিয়েই গেল খুনখারাবিটা। ফ্রণ্টে গুলিগোলার মধ্যে ট্রেঞ্চে-ট্রেঞ্চে রুটি বিসকুট আর চকোলেট দিয়ে আসত সে। খুব ভালবাসা পেত। কিন্তু সে ভালবাসার গতিক ভাল ছিল না। মিলিটারিতে থাকার সময়ই তার মানুষের ওপর দৃষ্টিটা খারাপ হয়ে যায়।

এমন কুদৃষ্টি নিয়ে জীবনে থিতু হয়ে বসা যায় না। তিরিশ বছর বয়স হয়ে এল। ঘরে বুড়ি মা ছাড়া আর কেউ নেই। না ভাই না বোন। বাবা ছিল পোস্টমাস্টার। এলাকাটা চোর ডাকাতের। খুনখারাবি লেগেই আছে। বেচারা পোস্টমাস্টার ডাকাতের হাতে মারা পড়েছিল। তখন মহারাজার বয়স মোটে পাঁচ। তখনও মহারাজা হয়নি, সবাই জানত খোকা বলে। মায়ের সঙ্গে ভিক্ষে করে বেড়াত। পরে পেটের জ্বালায় মা নিকে করে। সৎবাবা লোকটা ছিল দরজী। স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিল। ক্লাস এইটে স্কুলের ছেলেরা থিয়েটার করেছিল। তাতে একটা ছোট্ট পার্ট করে ধন্য হয়েছিল খোকা। দু নবর মাত্র সংলাপ। সেলাম করে বলতে হবে, আদেশ করুন মহারাজা। তারপর, আসি মহারাজা এবং প্রস্থান এর পর সে পাকাপাকি ভাবে মহারাজা হয়ে যায় এখন বোঝে, পার্টটা খুব হাস্যকর হয়েছিল।

সৎবাবা অকালে মারা পড়ল। মা আবার ফিরে এল নিজের বাড়িতে। অত বড় ছেলে আর ভিক্ষে করবে কী! মা ভিক্ষে করে ফের। মহারাজা মনের দুখে ঘর ছেড়েছিল। ঘুরতে-ঘুরতে মিলিটারিতে। মিলিটারি তাকে শক্তিমান করেছিল। যুদ্ধমানুষের ইজ্জত কাড়ে—আবার উল্টে ইজ্জত উপহার দেয়। মহারাজা তার জীবনে দেখেছে। যুদ্ধের আওয়াজ তার কানে লেগে আছে। হাতবোমা ফাটিয়ে চোরা পিস্তল ছুঁড়ে সে মানুষের যুদ্ধের শক্তি অনুভব করতে চায়।

একদিন তার বড় সাধ ছিল, রংরুটের দলে ভর্তি হবে। সুযোগও তার গিয়েছিল। হঠাৎ যুদ্ধ থেমে গেল। কিচেনস্টাফ বরখাস্ত বিলকুল। তার সেই সাধ মেটেনি। এখন সে নিজেও অন্য রকম হয়ে গেছে। আর কিছু ভাল লাগে না। ক্লান্তি আসে সহজেই। হঠাৎ-হঠাৎ মনে পড়ে যায় সে ভিক্ষে করে বেড়াত মায়ের সঙ্গে। আর অমনি চোয়াল শক্ত হয়েছে। রাস্তায় বোমার আওয়াজ দিতে দিতে দলবল নিয়ে অকারণ ছুটেছে। লোককে ভয় পাইয়ে দিয়েছে। লোকে ভেবেছে, কাদের সঙ্গে হাঙ্গামা হচ্ছে নিশ্চয়। পরে মহারাজা

সঙ্গীদের নিয়ে হাসাহাসি করছে। ভয় না পাইয়ে দিলে সুবিধে হবে না। সঙ্গীরা বলেছে, জয় মহারাজা!

এই ছোঁড়াটা তার ছেলেবেলার প্রতীক। প্রাণ ভরে ভালবাসে, তাই। জুতো জামা প্যান্ট কিনে দিয়েছে। ছোঁড়াটা বাজারের রাস্তায় ঘুরে মানুষ হচ্ছিল। বাবা-মায়ের খোঁজখবর জানে না। বাসস্ট্যাণ্ডে নাকি জন্ম।······

খোকা!

উ?

সত্যদা সাইকেল নিতে এলে দিবি কেমন? আমি আসছি।···মহারাজা পা বাড়ায়। ফের ঘুরে বলে, এবেলাও বাড়ি থেকে খাবারটা এনে দিবি ভাই। ঘুরে আসি।······

ঘোষহাটি পশ্চিমে, সোনাডাঙা পুবে। রাস্তাঘাট কাঁচা ওদিকে। বর্ষায় কাদা জমেছে। মাঠেও চাষ পড়েছে। জলকাদা প্রচুর। অতএব আলপথই ভাল। ঘন ঘাস গজিয়েছে। ভয়টা শুধু সাপের। সুলেমান মুহুরির টর্চ আছে। সাপের কামড়ে এখন মরতে চায় না সে। কিন্তু তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে। পায়ের সামনে টর্চের আলো ফেলছে সারাক্ষণ। তার পিছনে মোট তিনটি লোক। সুলেমানের সংশয় ঘুচছে, না চেঁচামেচি বড্ড হবে। গাঁয়ের গুণ্ডাগুলো এসে পড়লেই বিপদ। এই তো মোট তিনজন—মহারাজা বাদে অন্য দুজনে নেহাত ছোকরা। পারবে তো শেষঅব্দি?

দু মাইল দূরত্বের মাঠ পেরোলেই সুলেমানের সেই শ্বশুর গাঁ। মাঠের মাঝামাঝি একটা কাঁদর। গ্রাম আর মাঠের বাড়তি জল ঝেঁটিয়ে নিয়ে চলেছে ভাগীরথীর বুকে। চৌত্রিশ নম্বর জাতীয় সড়কে ব্রীজ রয়েছে। তার তলায় এই কাঁদর ছোটখাটো নদী হয়ে গেছে।

কাঁদরের জলের হিসেব মুহুরি জানে! বার দশেক এই জল মাপতে হয়েছে তাকে। পাড়ে বটগাছ। সেই গাছের নিচে পৌঁছে মহারাজা বলে, প্ল্যান ছকে নিই তপু, বোস। ইস্মাইল, এবার একটা সিগারেট দে। টানি!

মুহুরি দ্রুত সিগারেট বের করে আহ্লাদে। এরা যেমন বাঘ, এদের দলে তারও এক বাঘ হতে ইচ্ছে করে। বলে, গাঁয়ের শেষে বাড়ি। সব তো বলেইছি। উঠোন খোলা তিনদিকে—পাঁচিল ধসে গেছে। একদিকে ঘর।

যা গরম পড়েছে, বাইরেই বাপবেটি শোবে। কিংবা বাপ শোবে বাইরে, বেটি ঘরে। গরমের ভয়ে দরজা দেবে না। ঘরে জানলা-টানলা তো নেই। ছোঁ মেরে মুরগী ধরার মতো···বুঝলেন তো?

মহারাজা টের পায়, লোকটার আর সবুর সইছে না। লোকটা খিকখিক করে হাসছেও। পালিয়ে যাওয়া মুরগীর গলায় ছুরি চালাতে ওর হাত নিসপিস্ করছে। ঘুরঘুটি অন্ধকারে মহারাজা নিঃশব্দে হাসে। আকাশেরতারা ঢেকে চাপ চাপ মেঘ ঘুরছে। বৃষ্টি হলে ভালই। দূরে বিদ্যুৎ ঝিলিক দিচ্ছে। বাতাস ধরে আসছে যেন। সে চাপাগলায় বলে, তপু, ইসমাইল, শোন! সুলেমানমিয়া বরং গিয়ে শ্বশুরকে ডেকে ওঠাবেন। ওনার ওয়াইফও তখন ঘরে থাকলে বেরোবে। তারপর আমরা যাব। কেমন? ···

সুলেমান একটু ভেবে বলে, তা মন্দ হবে না। তবে চেঁচামেচি হলে···

মহারাজা বলে, চাক্কুটাক্কু দেখলে চুপ করে যাবে দেখবেন। অনেক তো দেখলাম।······

কাঁদরে একবুক জল। আগে মুহুরি সব খুলে আণ্ডারপ্যাণ্ট পরে নেমে যায়। হাত ছয়েক চওড়া। ওপারে হাঁচড়পাঁচড় করে উঠে টর্চের আলো দেখায়। স্রোত আছে—তবে তীব্র নয়। গঙ্গায় জলের চাপ বেড়েছে, হয়তো তাই। তিনজন 'গুণ্ডা' আণ্ডারপ্যাণ্ট পরে নেমেছে। চাপা গলায় কীসব বলছে আর হাসাহাসি করছে। সুলেমানকে নিয়ে বরাবর ঠাট্টাতামাশা করছে, সেটা সুলেমান বুঝেছে। কিন্তু করে নে শালারা! তোদের হাতে সব ছেড়ে দিয়েছি। তারপর যে গাছের বাকল সেই গাছে লাগবে। তখন তোদের ধার কে ধারে?

বাকি এক মাইল পেরোতে ঝিরঝিরে বৃষ্টি নামল। মুহুরির হাতে ছাতা আছে। ছাতা খুলে মহারাজাকে ডাকে। মহারাজা বলে, ঠিক আছে চলুন!

মালমসলা ভিজে যাবে না?

বোমা-টোমা এনেছে ভাবছে। বোমা। কী হবে? মহারাজা শুধু বলে, না।

গাছপালার মধ্যে ঢুকে বোঝা যায় গ্রামে এসে পড়েছে। মহারাজারা ভিজে একাকার হয়েছে। তবু হাসাহাসি ভোলে না। আকাশে মেঘের ডাক বারে বারে। বৃষ্টি বাড়ছে যেন। কয়েক পা এগিয়ে সুলেমান টর্চ বন্ধ করে। ফিসফিস করে বলে, ওই যে! আপনারা ঘরের ওপাশে আসুন। ভিজবেন না।

বাড়িটা অন্ধকার আর বৃষ্টিতে ঠাহর হয় না। ডানদিকের ছাঁচতলায় মহারাজাদের রেখে মুহুরি খোলা উঠোনে দাঁড়ায়। বিদ্যুতের ছটায় ছাতা

াথায় মূর্তিটা ভারি অদ্ভুত লাগে। তারপর তার মিষ্টি সশ্রদ্ধ ডাক শোনা যায় -কিন্তু বোঝা যায় না, কী বলে ডাকছে।

তারপর পাল্টা আওয়াজ শোনা যায়। এবং আলো জ্বলে। আলোটা করোসিন কুপি। মহারাজা উঁকি মেরে দেখে, বারান্দায় মশারি থেকে এক ড়ো বেরিয়েছে। মুহুরি তার মুখোমুখি। বুড়ো ঘোলাটে চোখে তার দিকে াকিয়ে আছে। হতভম্ব যেন। তারপর মশারির একটা পাশ দিয়ে বেরিয়ে াসে কেউ—চোখ জ্বলে যায় মহারাজার। আলথালু চুল, জামাবিহীন শরীর, াড়িটা কোনমতে পেঁচানো আছে। বেরিয়েই চেরা গলায় চেঁচিয়ে ওঠে, াবার এসেছ তুমি? ছোটলোক! জানোয়ার! বেরিয়ে যাও—নয়তো াক ডাকব। দালাল! শয়তান! লোচ্চা!

মুহুরি পাল্টা চোখ রাঙিয়ে বলে, চলে এস এক্ষুনি। তোমাকে নিতে াসেছি।

মুহুরির বউ পাশ থেকে একটা কাঠ কুড়িয়ে নেয়। তারপরই মেরে বসে। ়লেমান গর্জে ডাকে, মহারাজাবাবু! কপালে রক্তের ছোপ তখনই। সে ঁড়িং বিড়িং নাচতে থাকে। তখন মহারাজা যায়। তপু আর ইসমাইলও ায়। দুজনের হাতে ছোরা। আহত মুহুরি ফুঁ দিয়ে বুড়োর হাতের লম্ফ নিবিয়ে দেয়। তারপর ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। কোথায় বাজ পড়ে। ধস্তাধস্তির াওয়াজ ওঠে। একটি মেয়েলি চিৎকার উঠেই থেমে যায়। তারপর মহারাজা াকে, চলে আসুন।

মুহুরি টর্চ জেলেই নিবিয়ে দেয়। বাঘ অমনি করেই শিকার ধরে এবং বয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু তার বউ চুপ করে গেছে কেন সে বুঝতে পারে না।

বুড়ো ভাঙা গলায় হাঁউমাউ করে চেঁচায় এতক্ষণে। বৃষ্টি আর মেঘের াকে সে-আওয়াজ ঘুমন্ত মানুষের শোনা সম্ভব নয়।

মুহুরি একলাফে আগু নিয়েছিল। টর্চ সাবধানে জেলে সে আগের মতো পথ দেখায়। মহারাজা তার বউকে দুহাতে বুকের কাছে তুলে শুইয়ে রাখার ভঙ্গীতে নিয়ে চলেছে। সন্দিগ্ধ মুহুরি বার বার পিছু ফিরে বলে, হুঁশ আছে তো? দেখবেন আবার। মরেটরে যায় না যেন।

মহারাজা ধমক দেয়। চলুন না!

কাঁদরের ধারে গিয়ে সে মুহুরির বউকে দাঁড় করিয়ে দেয়। এতক্ষণে মুহুরি টের পায় মুখে রুমাল জড়িয়ে রেখেছিল। রুমাল খুললে তার বউয়ের আটকানো

কান্না বেরিয়ে পড়ে। মুহুরি মেঘের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গর্জায়—খবর্দার! চো—
—প! জবাই করে ফেলব।

তারপর সে হাত বাড়িয়ে হাত ধরতে গেলে লাথি খায় এবং আছাড়ও
একেবারে কাঁদরের জলে পড়ে যায়। টাল সামলাতে পারেনি। বৃষ্টিটা থেমেছে
তপু আর ইসমাইল হি হি করে হাসে। সুলেমানের ব্যাগসুদ্ধ ডুবেছে। (
বিড়বিড় করে কী বলছে। মহারাজা গম্ভীর গলায় মুহুরির বউকে বলে, নামুন
নয়তো আবার...

মুহুরির বউ পালাতে চেষ্টা করে। অমনি মহারাজা তাকে দুহাতে তেমা
করে তুলে নেয়। তবু মুখে রুমাল গোঁজে না। বউটি হাত পা ছোড়ে। মুহু
জল থেকে চেঁচায়—ডুবিয়ে মারুন শালীকে। আমার হুকুম! খুব ব
দিয়েছে মাগী!

ইসমাইল আর তপু নেমে গিয়ে বলে, গাঁয়ে আলো দেখলাম দাদু
উঠে পড়ুন।

ওরা তিনজন পাড়ে ওঠে। বটতলায় দাঁড়িয়ে সুলেমান মুহুরি জ
সবখানে টর্চের আলো ফেলতে গিয়ে টের পায় কলকব্জা বিগড়েছে। জলে ডু
গিয়েছিল টর্চটা। অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। কাঁদরের জলে কী সব শ
হয়। সে দাঁতে দাঁত চেপে বলে, কী হল মহারাজাবাবু?

এক বুক জলের ওপর মুহুরির বউয়ের চোখ দুটো চকচক করছে। কি
তখন আশ্চর্য শান্ত।

দূরে গাঁয়ে আলো দেখা যাচ্ছিল। ওরা চারটি মানুষ হনহন করে মা
পেরোচ্ছে। মহারাজা মুহুরির বউয়ের একটা বাহু ধরেছে এবার কিন্তু বাং
পাচ্ছে না। জাতীয় সড়ক নম্বর চৌত্রিশে ওঠার আগে খেলার মাঠ। এদিকটা
কোন আলো নেই। হঠাৎ বউটি ছিটকে মহারাজার পা দুটো জড়িয়ে মাথ
ঠুকতে থাকে। সবাই দাঁড়িয়ে পড়ে। মহারাজা একটু হেসে বলে, আঃ! কী
হচ্ছে! আমার পা ধরে কিছু হবে না ভাই! ধরতে হলে আপনার স্বামী
পায়ে ধরুন। মেয়েছেলেকে ঘরকন্না না করে জো পার নেই!

মুহুরি বউ কান্নাজড়ানো গলায় ফুঁসে ওঠে। ও জানোয়ার! অমানুষ
ওর সঙ্গে আমি আর ঘর করতে পারব না। আপনারা জানেন না, ও
কেমন লোক।......তারপর আবার কেঁদে ওঠে। বলে, আপনি আমাকে
বাঁচান।

মুহুরি আবার মেঘডাক ডাকতে যাচ্ছিল, মহারাজা তাকে থামিয়ে বলে, কেন ভাই ?

কেন ? বউটি আকাশের দিকে মুখ তোলে।···খোদা জানেন, যদি মিথ্যে বলি, জাহান্নামে যাব। ও আমাকে বেশ্যাগিরি করতে বলে। পয়সাওলা লোক এনে ঘরে বসিয়ে খাওয়ায়। আর······আর···কেন জানেন ? ও পুরুষ নয়।

সে হাঁপায়। সুলেমান মুহুরি কয়েক মুহূর্ত কাঠ। তারপর নড়বড়ে ভেজা ধুতিজড়ানো ঠ্যাং নেড়ে গর্জায়, লাথি মারব। মুখে লাথি মারব।···অশ্লীল গাল দিতে থাকে সে।

বউটি কান্নার দম টানে। বলে, ও আমাকে কিরে দিয়ে বলেছে—আমার কথা যদি কাকেও বলিস, অকাট কিরে রইল—তুই আমার মাগ নোস, মা। বিচার করুন আপনারা। বিচার করুন। আর, কেন আমি পালিয়ে এলাম ? সে রাতে আমাকে কার সঙ্গে শুতে বলেছিল, জিজ্ঞেস করুন—খোদা আপনাদের ভাল করবে।···সে ফের কান্নায় ভেঙে পড়ে। শয়তান জমিজমার লোভে আমার ইজ্জত বেচতে চায় !

মহারাজা এতক্ষণে ভারি গলায় বলে, কী বলছে রে শালা ? জবাব দে।

সুলেমান পাথরের মূর্তি সঙ্গে সঙ্গে।

মহারাজা এক পা বাড়িয়ে ফের বলে, কী রে ? মুখে রা নেই কেন শালার ? অ্যাই ইসমাইল ! ওকে শুইয়ে দে' তো এখানে—দেখি। তপু চাকুটা দে।

সুলেমান মুহুরি আচমকা একবার লাফ দেয়। লাফ দিয়ে বউয়ের দিকে আঙুল তুলে বলে—তালাক তালাক তালাক। তিন তালাক।

তারপর ঠিক তাড়াখাওয়া জন্তুর মতো প্রাণভয়ে মাঠ পেরিয়ে দৌড়ে পালিয়ে যায়।

মহারাজার মা দরজা খুললে মহারাজা বলে, বাকসো খুলে একটা কাপড় বের করো তো মা !

কেন রে ?···তারপর বুড়ি অবাক !···ও কে ? কে ও ?

অত কৈফিয়তে কাজ কী তোমার ? কাছে নিয়ে শোও। ক্ষিদে আছে কিনা জেনে নাও। আর শোন, সোনাডাঙার হাশমত মিয়ার মেয়ে। যেন বেইজ্জতী না হয়।

তুই কোথায় যাচ্ছিস ?

দোকানঘরে শুতে।

বুড়ি ভাল করে দেখে নিয়ে একটু হেসে বলে, ভালঘরের মেয়ে বলে তো মনেই হয়েছে। খোকা, একে তুই কোত্থেকে আনলি বাবা ?

মহারাজাও হাসে।···আনলাম। বরাবর সবার জন্যে ধরে আনি, এবার নিজের জন্যে! মহারাজার ঘরে মহারাণী থাকবে না ? তিন তিনটে সাক্ষীর সামনে সদ্য তালাক খেয়েছে বেচারা। একশোটা দিন পালতে হবে। এই একশোটা দিন আমি দোকান ঘরেই শোব।

তখন বুড়ি চিবুকে হাত রেখে সস্নেহে বলে, কেঁদো না। তোমার নাম কী মা ?

ভয়

শুকনো কাঠ কণ্ঠনালীতে ঘৃণার তেতো স্বাদ নিয়ে সে ফিরে আসছিল নির্জন সভ্যতাবিহীন মেঠো পথে।

সূর্য ডুবে যাবার পরও যে আশ্চর্য সুন্দর এক আলো এদেশের মাঠে বেশ কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়ায়, দিন যেন চলে যেতে যেতে কী মনে পড়ে যায় বলে একবার পিছু ফেরে এবং আড়চোখে খুঁজে নিতে চায় কিছু ফেলে গেল নাকি—সেই ধূসর শান্ত আলোয় অবশেষে তার সব ক্ষোভ জ্বলেপুড়ে গিয়ে এক দীর্ঘপ্রশ্বাস বেরিয়ে গেল। ফুলে ওঠা শিরাগুলো ঢিলে হল আবার। মুখ উঁচু করে সে তেজী ঘোড়ার মতো তাকাল সামনের দিকে। লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটতে থাকল। রহস্যময় এবং পরিব্যাপ্ত করুণা সেই দিনশেষকে নিশ্চয় বলে থাকবে—'এখন এখানে সবই ক্ষমা করা যায়', বিনা প্রতিবাদে সে তাই মেনে নিল এবং জনৈক ষষ্ঠী দত্ত আর তার রোগা ছেলেটিকে ক্ষমা করে দিল।

আর তার মনে এখন দুঃখ নেই, অভিমান নেই, ঘৃণা নেই। সে এখন শান্ত সজ্জন নির্বিকার আর উদাসীন মানুষ। একটা উঁচু মোটা আলপথে যেতে যেতে দুধারে ঊষর ক্ষেত, ক্ষয়াখর্বুটে কাশঝোপ, বোবা রোগা দুএকটা গাছ আর কোন সন্ন্যাসীর মতো ধীরগামী শেয়াল, কিছু পাখি—যারা অবচেতনায় নৈঃশব্দ্যে

ড় যায় গভীর ও সুদূরতায়, দেখতে দেখতে কখন সে এসে পড়ল এক সরু
ীর ধারে। তখন করতলের রেখাগুলো একেবারে আবছা হয়ে গেছে।
পায়ের নিচের আচমকা এই নদী তাকে যতটা না অবাক করল, নদীর
নায় কী এক নড়াচড়া অতর্কিতে তাকে তার বেশি ভয় পাইয়ে দিল।
ীতে এখন মোটামুটি অস্পষ্টতা—যা অন্ধকারের প্রথম স্তর। দূরের ঢাকের
ব্দর মতো ওই অন্ধকার, যেখানে যে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলল। নদীর কিছু ভাটির
ক জঙ্গল আছে। বাঘ শুওর হায়েনার উপদ্রব শোনা যায় মাঝে মাঝে। সে
টু কেঁপে উঠল। চোখের সামনে পলকে পলকে হলুদ লাল নীল ভয়ের
লিক, আর তার উরু দুটো অবশ হয়ে গেল। ওটা একটা প্রাণী, তাতে ভুল
ই। ঝিরঝিরে একফালি স্রোতে আবছা শব্দ উঠছে—সম্ভবত জল খাচ্ছে
ণীটা। তার মনে হল, জল খাওয়া শেষ হলেই ওটা টের পেয়ে যাবে যে
একজন সত্যিকার মানুষ দাঁড়িয়ে আছে এবং একটা কিছু ঘটবেই।
শালা মানুষ! আবার কথাটা তার মাথার মধ্যে ভেসে উঠল। মানুষকে
র জন্তুরা তো কম দুঃখে ঘৃণা করে না! তার ঠাকুর্দার কাছে শুনেছে:
র জন্তুরা বাসা ছেড়ে বেরোবার আগে মনে মনে ঈশ্বরকে বলে নেয়—যেন
ায়ের সামনে না পড়ি হে বিধাতা পুরুষ।

তার মনে অভিমানটা ঠেলে এল আবার। খা, খেয়ে ফেল্ এই শাল
ষকে! এ মানুষের কোনও দাম আছে? সবসময় ঠকে ঠকে গো-ঠকা হয়ে
দছে! মহুলার গোহাটে দত্তদের বাবা-বেটায় মিলে আজ যা ঠকান ঠকাল,
া লেখাজোকা নেই। গাঁয়ে ফিরলেই তো রাত পোহালে আবার চোখে
খ পড়বে। তার আগে ভগবান, তুমি এই অমূল্য নিধিদুটোকে গেলে অদ্ধ
া দাও।

নদীটার খাত আন্দাজ হাত পঁচিশ চওড়া। সুতোর মতো এই নদী,
ছে দূর উত্তরের বিশাল বিল থেকে, মিশেছে আরেক বিশাল বিল পেরিয়ে
বারে গঙ্গায়—তার কাছেই এক শহর, কাটোয়া। জীবনে এই প্রথম সে
মতো শহর দেখে এল। তার ঠাকুর্দা বলতেন—'কাটোয়া? হেথা কুথা?
তো বদ্দমানের কোলে।' ছড়ার মতো নেচে নেচে এই কথাটা সারা
বেলা সে উচ্চারণ করেছে। আজ সেই পুরনো স্বপ্নের অন্তর্গত শহর থেকে
াংসে ফিরে আসছে সে—কিন্তু কী রামঠকান ঠকেই ফিরছে এতক্ষণ।
া বাপেবেটায় রেলগাড়ি চেপে 'কাঁথাচাপা ধকড়চাপা···কাঁথাচাপা ধকড়চাপা'

শুনতে শুনতে ঘুর পথে গাঁয়ে পৌঁছে গেল! শালা মানুষ! লে, খেয়ে লে আমাকে! তাও বাপঠাকুর্দার নাম থাকবে—খেল তো বাঘেই খেল। আর কি না মরদজনা যে, সে বাঘের হাতে মরবে না তো কি বিছানায় লেজেগোবরে হয়ে মরবে? হুঁ, ঘরে বউ ছেলেপুলে এল না এ জন্মে। নয়তো আরো কয়েকপুরুষ গল্প করে বলে বেড়াত—আমার বাবা বাঘের হাতে মরেছিল বটে!

সে অবশ উরু নিয়ে এইসব কথা ভাবছিল। পা তুললেই জন্তুটা টের পাবে, তবে সেজন্যেও নয়—আসলে তার নড়াচড়ার শক্তিই ছিল না। 'বাঘছাঁদ' বলে একটা কথা আছে। মানুষের পায়ে অদ্ভুত অদৃশ্য এক ছাঁদ জড়িয়ে যায় ফাঁসের মতো। যেমন নাকি অজগর সাপের দৃষ্টি লেগে হরিণের বাচ্চা যায় আটকে। দম বন্ধ করে সে প্রতিমুহূর্তে প্রতীক্ষা করতে থাকল অন্ধকার খাত থেকে কয়েকটা ধারালো নখ তার এই বাইশবছরের চাপাআশাআকাঙ্ক্ষা সুখদুঃখ ভরা পুরুষবুককে ফেড়ে ফেলবে। এবং তার বোবায়-ধরা গলা থেকে পৃথিবীর উদ্দেশে আর একটিও কথা ছুঁড়ে দেওয়া যাবে না।

কিন্তু হঠাৎ অন্ধকার খাতে সব নড়াচড়া আর ছলছল জলের শব্দ গেল থেমে।

একপলকের জন্যে সেইমুহূর্তে তার চোখে পড়ল সুতলি নদীর ওপারে সরু এক ফালি চাঁদ।

নিচের সজীব সত্তা পাখি উড়ে যাওয়া বেত-লতার মতো সরল ও আকাশ-মুখী হল।

একটা কিছু পিছু ফিরল। সঙ্গে সঙ্গে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল বালিহাঁসের ঝাঁক—ওয়াক্ ওয়াক্…আঁক ওয়াক্…

কেউ গোপন ভয়ে ধরাপড়া গলায় আধোআধো চেঁচিয়ে উঠল—কে! কে ওখানে?

মুহূর্তে তার বিভ্রমের হলুদ মৌতাত ছিঁড়ে তাকে পথ দিল সামনে। খুব স্পষ্ট আর ভরাটস্বরে সে বলে উঠল—মানুষ!

নিচে অন্ধকারে খিলখিল হাসি কেউ অকপটে হাসল। —মরণ! আমি কি অমানুষ বলেছি নাকি?

উঁচু পাড় থেকে দৌড়ে নামে সে বিপুল জলের বেগে। নিচের মূর্তিটা একটু সরে দাঁড়ায়। আগে সে হাঁটু ভাঁজ করে বালিতে বসে এবং দু হাতে আঁজলা করে জল খায়। আঃ! খিদের পেট খালি—জল বুকে খিল ধরিয়ে দেয়। সে কাশতে থাকে।

—মানুষের গলায় জল আটকাল নাকি!

শান্তভাবে ঘুরে শোনে সে। তারপর হাফ শার্টের পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মোছে। উঠে দাঁড়িয়ে বলে—তা, এই 'তিনসাঁঝের' বেলায় মেয়ে মানুষের একাদোকা যাওয়া হবে কোথা শুনি!

—বাবলতলি কাপসা।

—আমি যাব পলাশগা।

শুনেই মূর্তিটি খিলখিল করে ফের হাসে।—ওই 'যেথা মাগীরা মোড়লী করে মনসেরা বাঁদর?'

মেয়েটির জিভ তো বড্ড ধারালো। পলাশগা নিয়ে প্রচলিত ছড়াটা দিব্যি শুনিয়ে দিল। একা মেয়ে, গলার টানে মনে হয় যুবতী, আর টানটান শরীর, সাহসের তুলনা হয় না! এই নিরালা মাঠঘাটে একা পাড়ি দিচ্ছে ভরা সন্ধ্যাবেলা, বুকের পাটা দেখে তাক লেগে যায়। সে বলে—মুখ আছে বলার, বলুক। তবে কি না, এমন জায়গায় এমন সাহস ভালো না! কত রকম ভালমন্দ মানুষ থাকতে পারে।

—পারে বইকি। তবে আমিও কি না সৈরভী। কাপসার 'সাতভেয়েদের' নাম শোনা থাকলে ভালো, বেশি বলব না। সৈরভী তাদেরই বোন।

বুকটা ধাড়স করে ওঠে। ওরে বাবা! এ তল্লাটে 'সাতভেয়েদের' নাম শুনলে সাপও সুড়সুড় করে গর্তে ঢুকে লুকোয়। ডাকাতকে ডাকাত, লাঠিয়ালকে লাঠিয়াল। জাতে সদ্গোপ। অল্পস্বল্প জমিজমাও আছে। এক দঙ্গল দুধেল গরু মোষও আছে। বিশাল সব চেহারা, মোষের পিঠে চেপে বিলেজঙ্গলে যখন যায়, মনে হয় কোন রাজা কী সেনাপতি চললেন যুদ্ধে। তাদের বোন! হুঁ, তাছাড়া আর কার সাধ্যি থাকবে এমন ঘোর সন্ধ্যায় একা নির্জন মাঠে পথ চলতে?

—কী? মানুষের যে বোবা ধরে গেল। যাবে তো, পা ফেলুক আগে-আগে। ভয়ে ভিরমি গেল নাকি!

একটু চাপা হাসে সে। বড় বাচাল এই সাতভেয়েদের বোন। —না, ভয় কিসের? আমি তো কোন দোষের দোষী নই। সাতভেয়েদের বোনকে এখনও চোখেও দেখি নাই। এখনও দেখি না। দেখলে কথা ছিল বটে।

আলো জ্বেলে দেখার সখ হয় নাকি?…আবার হাসে সে। আঙুল তুলে চাঁদের ফালি আর নক্ষত্র দেখায়।—ওই ঝিলিকটুকুতেই দেখে নেওয়া যায়—তবে কি, চোখ থাকলেই হল। কই, পা ফেলুক।

পা বাড়ায় সে। ওপাড়ে উঠে গেলে সামনের পথ ও পৃথিবী অনেকট স্বচ্ছ লাগে এবার। মেয়েটি বাচাল, কিন্তু তার গলায় সুর আছে। খাি মনে হয়, চারু মাষ্টারের বেহালা। পিছনে সেই নিঃশব্দ বেহালা নিয়ে হাঁে সে। কয়েক পা চলে বলে—তা সাতভেয়েদের বোনের এমন করে আ হচ্ছে কোত্থেকে ?

—তার আগে শুনি, মানুষটা কাদের ?

মানুষটা কাদের মানে, জাত কী বা বংশ-পরিচয় কী। একটু হকচকিে গিয়েছিল প্রশ্নে। কিন্তু সামলে নিয়ে বলে দেয়—দত্তদের।

—ওরে বাবা! পলাশগাঁর দত্তরা যে পয়সাওয়ালা মানুষ! তা হে রেলে না চেপে এমন হাঁটাপথে ক্যানে ? ক্যানে এমন খালি পা ?

কী দৃষ্টি চোখের! পা খালি, তাও দেখতে পেয়েছে। সে আনমনে জবা দেয়—আর বোল না। আত্মাকালীর মন্দিরে ঢুকলুম, তো ফিরে দোরগোড়া এসে দেখি, অমন নতুন জুতোজোড়া লোপাট।

হাসতে লাগল পিছনে সে এক আবহসঙ্গীত। —ওম্মা! তাই নাকি ? ত আত্মাকালীর মন্দির তো সেই কাটোয়ায় ?

—হুঁ। তা ছাড়া আর কোথায় ?

—শহর জায়গা। আবার কেনা গেল না ?

—গেল না। রেলের টাইম হয়েছিল, তাড়াহুড়ো দৌড়ে টিশিনে গেলুম তো রেলও ছেড়ে দিলে। তখন রাগ হল। রাগের বশে হাঁটা শুরু করলুম ···বলে মুখ উঁচু করে চাঁদের ফালিটা দেখতে দেখতে শুকনো হাসে সে।

—খুব রাগী মানুষ তো তা হলে!

—তুমিই বল না, রাগ হয় আর না হয়। তার ওপর ষষ্টিদত্ত···

—কে, কে ? ষষ্টি দত্ত ? ওই যার বাড়ি এড্ডো আছে—টিপলে গান বেরোয় ?

অজ্ঞতা দেখে হাসে সে।—এডিও।

—ওই হল, এডিও।

ষষ্টি কাকা আর তার ছেলে গোপাল করল আরেক কাণ্ড। গোহাটে একট ভাল গরু কিনতে···

—কাটোয়ায় গোহাট কোথা ? সে তো মহুলার ঘাটে।

এ তো সব খবরই রাখে দেখা যাচ্ছে। ঢোক গিলে বলে—মানে, আগে

মহুলা গিয়ে গরু দেখা হল। পছন্দ হল না। তো ষষ্টিকা বললে—কাটোয়া হয়ে যাই একবার। তাই গেলুম। কেনাকাটা করবে বলল।

—তাই বটে। তারপর?

—আর বোলো না। আপন কাকা কী বলব বলো? পয়সাকড়ি সবই তো ওনার কাছে ছিল। ওই যে বললুম, মন্দিরে ঢুকলুম—আর ভিড়ে ওনাদের হারিয়েও ফেললুম!

খুব হাসতে লাগল আবার।—ওম্মা! জুতো হারাল, আবার কাকাও হারাল!

—হ্যাঁ!

—তাপরে?

—তাপরে আর কী! না খাওয়া না দাওয়া—শালা এই মাঠে মাঠে চলে আসছি!

একটা মিঠে—যেন মৃদু করুণ মূর্ছনা বেহালায়, চাপা প্রশ্বাস শোনা যায় পিছনে।—আহা! তাহলে তো খুব কষ্ট মানুষের!

—আমাকে অমন মানুষ-মানুষ করা কেন? আমার নাম কৈলাস।

—আমার মরণ! পরপুরুষের নাম ধরে ডাকতে আছে নাকি? তাতে আমার ভাশুরের নামে নাম।

একটু চুপ করে থেকে সে বলে—সাতভেয়েদের বোনকে তাহলে দুটো কথা শুধোই?

—একশোবার। কথা বলতে বলতে হাঁটলে পথ পলকে ফুরিয়ে যায়।

—শ্বশুরবাড়িটি কোথায় হচ্ছে?

—পাঁচগাঁর হাট।

—তা শ্বশুরবাড়ির লোকেরা এমন করে ছাড়লে? এই সন্ধেবেলা একাদোকা?

—যার দাদারা সাতভেয়ে, তাকে যমেও ছোঁবে না।

—তাহলেও একটা নিয়ম তো আছে! ঘরের বউ!

—তোমার বুঝি সন্দ হচ্ছে?

—হচ্ছে।

—কী হচ্ছে, শুনি?

—সোয়ামীর ওপর রাগ করে পালিয়ে আসছ না তো?

একটু চুপ করে থাকে—তারপর ধরা গলায় তুতিনবার 'তা' শব্দটা উচ্চারণ করার পর হঠাৎ ফুঁপিয়ে, ফুঁসে ওঠে—যদি আসি! আসবোই তো। এসেছি। হুঁ—ভাত দেবার ভাতার লয়, কিল মারার গোঁসাই! না খেয়ে না খেয়ে পিত্তি পড়ে জ্বর হবে, আর ওই খাটুনি। বলো, কেউ পারে এ সোমত্ত বয়সে?

—হুঁ, পারে না! কতরকম সাধআহ্লাদও থাকে মেয়েদের।

—আর সাধ আহ্লাদ! আজ একবছর বিয়ে হল—না পেলুম না একখানা ভাল কাপড়, না একটা বেলাউস! না দিলুম পায়ে আলতা! শুধু পেট পেট করে···সামলে নিয়ে আবার বলে—আমার বড় কষ্ট, কাকে বলি গো!

—দাদাদের বলনি কেন? তাহলে তো ভালই শাস্তি দিয়ে আসত।

হিসহিস করে বলে—বলব। এ্যাদ্দিন বলিনি! এবার গিয়ে বলব। তারপর কী হবে, বুঝতে পারছ?

—পারছি, তুমি বলো।

এক অদ্ভুত হাসিকান্নায় মাখামাখি করে কথাগুলো বলা হয়। শ্বাসপ্রশ্বাসে প্রতিহিংসার আবেগ ঝরে। মনে হয়, অন্ধকারে জোনাকির মতো তুই চোখ আদিম হিংসায় রিং রিং করে জ্বলছে। —সাতভেয়েদের বোনের গায়ে হাত! সারা পাঁচগুীর হাট জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে আসবে না? হড়কা বানের মতো, খরার হা হা আগুনের মতো গিয়ে তছনছ করে দেবে না সব সুখের সংসার! আমার দাদারা হাঁক ছাড়লে পিথিমি থরথর করে কাঁপে। আমার দাদারা পাহাড় হয়ে ধসে! হুঁ, তাদের বোনের গায়ে হাত? তাদের বোনকে না খেতে দিয়ে-দিয়ে মেরে ফেলা?

আবেগে ফুঁপিয়ে কাঁদে সে। পথে থেমে যায়। তুহাতে মুখ ঢেকে হু হু করে কাঁদতে থাকে অন্ধকারে। ওর কষ্টকে অনুভব করতে পারে সে—দত্তবাড়ির কৈলাস। আর সান্ত্বনা দিয়ে বলে—কেঁদো না! যার অমন সাত সাতটা পাহাড় দাদা, তাকে কাঁদা মানায় না!

কান্নার মধ্যেই ফুঁসে ওঠে মেয়ে। কী মানায়, শুনি?

মুখ টিপে হাসে সে, দত্তবাড়ির কৈলাস। —হাসি।

একটু চুপ করে থেকে বলে—সাতভেয়েদের বোনের শরীলটা কি অক্তমাংসে গড়া লয়? সাতভেয়েদের বোনের মোন কি পাথর?

—না, তা লয় বটে।

—তবে?

—তবে কী···অন্যমনস্ক দত্তবাড়ির কৈলাস ঘোড়ার মতো মুখ তুলে নক্ষত্র দেখতে দেখতে বলে—তবে কী, এই নিরালা সনঝেবেলা সব মিথ্যেমিথ্যি লাগে। সব কষ্ট দাগ কাটে না। বলো, এই আঁধার যেমন—তার দাগ কি শরীলে লাগে? আমার তো লাগে না।

একথায় অমন দুর্দান্ত ও মহাপরাক্রান্ত সাতভেয়ে যারা, তাদের আদরের বোনটি খুব শান্ত হয়ে যায় হঠাৎ। আস্তে, ধীর উচ্চারণে, অস্ফুটস্বরে বলে—না, তা লাগে না বৈকি!

কৈলাস, সে দত্তবাড়ির, উঁচু মুখে কয়েকটি পা বাড়িয়ে প্রায় পাশে গিয়ে বলে—এই যে আমি, দত্তদের আদরের ছোট ছেলে, না খাওয়া না দাওয়া কষ্ট করে হাঁটছি। কিন্তু বাড়ি গিয়ে উঠলেই কতরকম ভালমন্দ খেতে পাব। আরামে ঘুমোবার বিছানা পাব। চাকরবাকরকে ডেকে বলব, পা টিপে দে। মাথার কাছে চাবি টিপব, কলের গান বাজবে। শুনতে শুনতে ঘুমোব। ···স্বপ্নাচ্ছন্ন বিহ্বল কণ্ঠস্বরে সে বলে যায়, যেন এই সৈরভীর থেকে অনেকটা দূরে চলে যায় ভেসে, অন্য এক জগতে। সে ঢোক গিলে ফের বলে—তখন আর মোনেও থাকবে না যে একটা দিন বড্ড কষ্টে কেটেছিল। আর তুমি···

—হ্যাঁ, আমিও উঠোনে পা দিয়ে ডাকব, দাদা! এক দাদাকে ডাকলেই সাত-সাতটা মুখ সাড়া দেবে। তা' পরে···

—তা পরে তুমিও বাসি পেটে কত ভালমন্দ খাবে, ঘুমোবে।

সৈরভী, দোর্দণ্ড প্রতাপ সাতভেয়েদের বোন, হঠাৎ ফিক করে হাসে। —কিন্তু একটা কথা মোনে থাকবে আমার, চিরটা কাল।

—কী?

—মুখে কি বলতে পারি? বুঝে লাও, তুমি তো পুরুষ মানুষ।

—বুঝলুম। আমারও থাকবে।

অনেক চাপা সুখে সেই এক-বোন-পারুলের মতো সৈরভী বলে ওঠে—পথ তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে গিয়েছিল এক নিরালা সনঝেবেলায়, হাজার কোশ রাস্তা দণ্ডেই শেষ। এখন আমি বাঁয়ে ঘুরি, তুমি যাও ডাইনে।

দত্তকুলোদ্ভব কৈলাস থমকে দাঁড়ায়। ফালি চাঁদটা কখন হারিয়ে গেছে। নক্ষত্রের আলোয় কিংবদন্তীখ্যাত আলপথ শেষ হয়েছে সামনে পায়ের কাছে। কাঁচা সড়ক চলে গেছে ডাইনে বাঁয়ে পলাশগাঁ থেকে বাবলতলী-কাপসা। আর হঠাৎ এই সন্ধ্যারাতের পথটা সাপের মতো ফোঁস-ফোঁস করে নড়ে ওঠে। পা

বাতাসাতে গা কাঁপে। বোবা ধরে যায় গলায়। জিভ শুকনো খড় হয়ে ওঠে। শেষ হয়ে গেল এক্ষুণি এক্ষুণি সবটুকুই? সৈরভী, এই নামের সৌরভ ঝাঁঝালো হয়ে, মৌমাছির মতো, মগজে ভনভন করে। না জানি সাতভেয়েদের বোনের কেমন মুখ, কেমন ওই শরীল, গন্ধতেলের শিশির মতো নিটোল, নাকি ধুতরো ফুলের মতো পলকা হাল্কা, নাকি দুপুরবেলার দেখা দূরের কাশবনের মতো চুলের ঝারি নেমেছে পিঠে, গা ছমছম করা বন্যতা?

—কী হল গো দত্তবাড়ির ছেলে, থমকালে ক্যানে?

—উঁ? না, ভাবি।

—কী ভাবো গো?

—রাত পোহালে রোদ্দুরে চিনতে পারব, নাকি পারব না, তাই।

—ও, এই কথা। কেমন হাসে সৈরভী, চারুবাবুর বেহালা বাজে।

—তুমি কিছু ভাবো না, সৈরভী?

—হুঁ, ভাবি। শুধু এই কথাটা ভাবি, পরকে ঠকাতে গেলে নিজেও ঠকতে হয়।

কৈলাস দু পা এগোয় সাহসে—ই কথাটার মানে?

—মানে? জানিনে মানে। বলেই আচমকা সৈরভী বাঁয়ে ঘোরে। প্রায় পিছলে চলে যায় দূর থেকে দূরে। পলকে পলকে অন্ধকারে মিশে যেতে থাকে মূর্তিটি।

আর কৈলাস একবার চেঁচিয়ে ডাকে—সৈরভী!

কোনও সাড়া আসে না। নিজের ডাকটা নিজেকেই ঠাট্টা করে। হুঁ, কুখ্যাত মহাবলী সাতভেয়েদের বোন, তাই এমন নিদয়া মেয়ে! বেশি উদ্যোগ করলেই কে জানে দাদাদের নাম ধরে ডেকে ফেলবে। সর্বচর লোকগুলো কখন কোথায় থাকে বলা যায় না, কৈলাস ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

কিন্তু কথাটার মানে বলে গেল না। পরকে ঠকাতে গেলে নিজেও ঠকতে হয়। এই বাক্য তাকে এখন ধোপার পাটে ভিজে কাপড়ের মতো আছাড় মারতে থাকে। সে মনে মনে ছটফট করে, বাঁয়ে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে। ইচ্ছে করে মেয়েটাকে দৌড়ে গিয়ে আটকায়, তীব্র কণ্ঠস্বরে এই প্রথম প্রহরের জনহীন অন্ধকার ফালাফালা করে বলে—ই কথাটার মানে বলে যাও, নয় তো ছাড়ব না, আমার জীবন মরণ সমিস্তে! কিন্তু ও যে সাতভেয়েদের বোন! পলকে সাপিনী হয়ে ছোবল দিতে দেরি করবে না।

আর ক্রমশ একটা অদ্ভুত ভয় তাকে চেপে ধরতে থাকে। কোনও অসম্মান

করে বসেনি তো ওর? কোন পলকা হাল্কা টুকরো কথায় মনের চাপা ইচ্ছে কি লোভের গন্ধ বেমক্কা ছড়িয়ে যায়নি তো? সাতভেয়েদের রাজ্য চারদিকে ছড়ানো। তাই বুক কাঁপে। জীবনে বেঁচে থেকে সাধআহ্লাদ নিয়ে সবাই কাটাতে চায়, এ জীবনটায় তো সুখও বড় কম নেই। এবং গুরুতর অস্বস্তিতে সে বিড়বিড় করে মনের ভেতর: ক্ষ্যামা করে দিও সাতভেয়েদের লক্ষ্মী বোনটি, অলেয্য কিছু বললে। পরক্ষণে ফের স্বগতোক্তি করে: তবে কী, মানুষকুলে জম্মো, যুবো বয়েস! ইচ্ছেকে এমন নিরালা পথে বাগ মানাতে পারে কে? যদি না পেরে থাকি, ক্ষ্যামা দিও লক্ষ্মীটি।

আরও অদ্ভুত ভাবনায় আক্রান্ত হয় সে। যদি হঠাৎ এখন সাতভেয়েরা কেউ এসে পড়ে বলে—এ্যাই শালো! আমাদের যোবতী বোনটিকে একা পেয়ে কী মন্দ কথা বলেছিস? মুষড়ে পড়ে কৈলাস। করযোড়ে মিনতি করতে থাকে, মনে মনে—দাদারা, তাকে আমি ভুলেও মন্দ কথাটি বলি নাই।

তারপর সেই গুরুতর ভয়-ভাবনার খোঁচা খেতে খেতে সে এবার ডাইনে কাঁচাসড়কে প্রায় তাড়াখাওয়া শেয়ালের মতো দৌড়তে শুরু করে। সৈরভীর উল্টোদিকে সে প্রাণভয়ে পালাতে থাকে—যেন বিস্মৃতিতে। যেন এমন আশ্চর্য ঘটনা কোনদিন ঘটেনি তার জীবনে, যেন এমন বিপর্যয়কর আত্মসম্মান রক্ষার জন্যে কখনও আর তাকে অপ্রস্তুত হতে হয়নি।

অনেকটা গিয়ে একবার হাঁফ নেবার জন্যে দাঁড়ায়। হুঁ, সাতভেয়েদের মানী বোন এককাপড়ে পাঁচগাঁর শ্বশুরবাড়ি থেকে এমন করে পালিয়ে এল, তার সাক্ষী রইল সে—এটাও তো সাতভেয়েদের কাছে দস্তুরমতো আপত্তিকর ঘটনা। ওদের পারিবারিক খিটকেলের জলজ্যান্ত সাক্ষী কি না কৈলাস! সহজে ছেড়ে দেবে না শালারা! এবং এটা আবিষ্কার করতেই ফের সে প্রাণভয়ে দৌড়তে শুরু করে।

কিন্তু খানিকটা গিয়েই সে ফের থামে: তবে কি না, সে কৈলাস দত্ত-বাড়ির। ঢুঁড়ে হন্যে হোক না সাতভাই ডাকাত, পলাশগাঁর দত্তবাড়িতে কোন শালা কৈলাস নেই। আছে ষষ্ঠীচরণ আর তার ছেলে। আছে তাদের জ্ঞাতিপাতি। কৈলাস সেথা নেই, থাকবার কথাও নয়। এক কৈলাস আছে বটে, সে জেতে বাউরি—তার বাবার নাম রক্ষাকর বাউরি, থাকে ঢেলাইচণ্ডীর ওদিকে বাউরিপাড়ায়, পলাশগাঁয়ের পুবে ঝাড়া ক্রোশটাক মেঠোপথ। সেই কৈলাস গরু চেনে এবং সেই কৈলাস আজীবন রাখাল।

তবু মন খচখচ করে। কথাটার মানে কী? 'পরকে ঠকাতে গেলে নিজেও

ঠকতে হয়!' রক্ষাকর বাউরির ছেলে কৈলাস মুখ উঁচু করে এবার সকাতরে চেরা গলায় গান গেয়ে ওঠে :

রাধে লো তোর আঁধার ঘরে বেড়াল ঢুকেছে এ এ…এ
দই খেয়েছে ভাঁড় ভেঙেছে মজা লুটেছে…এ…এ…এ

তারপরই হঠাৎ থেমে যায়। তার মনে হয়, একটা এরকমই আঠালো পিছল ও ভিজে ব্যাপার ঘটতে পারত, ঘটল না। শরীল ফাটিয়ে বটগাছের আঁকুর গজাবার কথা ছিল, গজাল না। সম্ভাবনাগুলো খালি অন্ধকার মাঠের আকাশে ওড়াউড়ি করে পালিয়ে গেল, নামল না। কৈলাস কান পেতে যেন পাখার শব্দ শুনতে শুনতে প্রচণ্ড বেগে রুখে ঘুরে দাঁড়ায়, উল্টোদিকে। কতক্ষণ এভাবেই দাঁড়িয়ে থাকে। শুধু দাঁড়িয়ে থাকে।…

তখন সৈরভী রাস্তায় যেতে যেতে ঢোক গিলছে। ছাড়াছাড়ি হতেই খুব দৌড়েছে, তাই হাঁপাচ্ছে। সে নিজেকে বলছে, হুঁ, তোর বড় ডর সৈরভী। অমর্ত বাগ্দীর মেয়ে তুই, কাঁকড়াগুগলি খাওয়া শরীল—তাকে বড় ডর। কী জানি, যদি এই শরীল ফাটিয়ে মুখিয়ে ওঠে তেজী নিষিদ্ধ বটের আঁকুর! তাই অমন পটাপট মিথ্যে বললি দত্তবাড়ির ধনীমানী ছেলেটাকে!

তবে কথা কী, পাঁচগুীর হাটে শ্বশুরবাড়ি, এটা মিথ্যে না। ওরা হাড়মাস কালি করে ফেলেছিল, সেও মিথ্যে না। সৈরভী হাসতে গিয়ে হঠাৎ টের পায়, আজ তাকে কী পরাক্রান্ত সুখ থেকে কেউ যেন অবিশ্বাস্য জোরে সরিয়ে নিল এবং সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত কাঁপাকাঁপা আঙুলে মাথায় এক ফালি ঘোমটা টানে সে। তারপর ঘুরে দাঁড়ায় উল্টোদিকে। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। শুধু দাঁড়িয়ে থাকে।…

বোধ

খবর পেয়েই ছোটবাবু খোলা ছাদে উঠে গিয়েছিল। তারপর নাগাদ দুপুর তাঁকে মোড়ায় বসে বন্দুক সাফ করতে দেখা যাচ্ছিল।

একটা বাঁধের ওপর ছোটবাবুর একতলা দালান আর খামারবাড়ি। চার-

পাশে সবুজ ধানের মাঠ। সোনামুখি নদী থেকে মহুয়া বিল অব্দি একনজরে দেখা যায় ছাদ থেকে। জলের ওপর পাখিদেরও দেখা যায় ঝাঁক বেঁধে উড়তে। কোথাও মেছুনী কাঁধে জাল নিয়ে চলেছে। কোথাও দু-একজন চাষা হুমড়ি খেয়ে ধানের ক্ষেতে পড়ে আছে সারা দিন।

তার ওপারে রেললাইন। দুপাশে টানা কাশ-কুশ-শরবন নিয়ে শহরের স্টেশনে চলে গেছে। এই ছাদটা থেকে রাতের দিকে অত দূরের সিগনাল পোস্টে লালনীল আলো জলজল করতে দেখা যায়। সরকারী বনদপ্তর ওদিকে রাতারাতি একটা বনভূমি গজিয়ে না তুললে শহরও দেখা যেত এক সময়।

এইটে ভাবতে কেমন ঘোর লাগে। ছোটবাবুর খামারবাড়ির চারপাশে এক যুগ আগে একটা সত্যিকার বনভূমি ছিল। হিজলভাঁট-কাঁটাবাবলা আর বহু মাইল জোড়া কাশ-কুশ-শরের বিস্তীর্ণ জঙ্গল। হরিণ ছিল। বাঘ ছিল। ছিল বুনো শুয়ার, ময়াল, পাহাড়ী অজগর আর বুনো মানুষদের ডেরা। তারও আগে এই লাটটা নাকি দ্বারকা-সোনামুখি-শঙ্খিনী নদীর করধৃত শ্বেতপদ্মের মত স্বাভাবিক জলাধার। পলি জমে জমে বছরের পর বছর ওই অরণ্যকে সৃষ্টি করেছিল।

অরণ্য নির্মূল হল এখানে। ওখানে বনদপ্তর হিসেব কষে পত্তন করল নতুন এক অরণ্য। এবং সত্যিকার অর্থে যা বিভীষিকাময় হিংস্রতায় পূর্ণ নয়।

এখানেও নয়। এখন ফসলের মাঠে শরৎকালীন রোদ দেখতে দেখতে ছোটবাবুর কেবলই মনে হয় উৎসব আসন্ন।

আর সেই আসন্ন উৎসবের মুখে খবরটা হাওয়ার আগে ছুটে এল। ছোটবাবু ব্যস্তভাবে বন্দুকটা সাফ করতে থাকল। ছাদ থেকে চারপাশে সতর্ক লক্ষ্য রেখে মনে মনেও নিজেকে প্রস্তুত করে নিল সে।

অনেক দিন আগে একবার এমনি হানা দিয়েছিল। অনেক ফসল নষ্ট হয়েছিল তাতে। জখমও হয়েছিল বেশ কয়েকজন—তাদের মধ্যে দুজন পরে মারা গিয়েছিল। খামারবাড়ির অদূরে এই বাঁধের ওপর চাষীদের বসতিগুলিতে তাই একটা দারুণ উৎকণ্ঠা ছড়িয়ে পড়েছে। মেয়েরা ঘর থেকে বেরচ্ছে না। পুরুষেরা হাতে অস্ত্র নিয়েও মাঠে নামতে সাহস পাচ্ছে না। সে এক মূর্তিমান মৃত্যু—স্বয়ং যমরাজের বাহন। ঈশান কোণে শঙ্খিনী নদীর আশেপাশে দেখা গেছে। সেখান থেকে পালিয়ে-আসা লোকগুলিই খবর এনেছিল। তার আগে এসেছিল ওর মালিক। বেঁটেখাটো কালোকুচ্ছিত লোকটা বলেছিল—একটুও

টের পাই নি এমনি করে ক্ষেপে যাবে। তাহলে ওকে বাথানে নিয়ে যেতাম ছোটবাবু। কবে-কবে ও মা হবার বয়স পেয়ে গেছে কে জানত!

তার মুখেই শোনা গেছে, ইতিমধ্যে জনাদশেক জখম হয়ে গেছে ওদিকটায়। আর সবচেয়ে মুশকিল হচ্ছে ও আগের সেই মোষটার মত মেয়ে-পুরুষ বাছে না। শিশুদেরও রেহাই দেয় না। বিশেষ করে লাল জামা-কাপড় দেখলে তো পৃথিবীকে শিঙের আঘাতে টালমাটাল করে ফেলে।

একটা মদ্দা বলবান মোষ দরকার। লোকটা সেই তল্লাসে বেরিয়েছে। যাবার পথে খবরটা এলাকার বড়কর্তা ছোটবাবুকে দিয়ে গিয়েছিল।

একেবারে সোনালী রঙ। শিঙ দুটি ঘোর বাঁকানো। হৃষ্টপুষ্ট ভাজা একটা কুমারী মোষ। ছোটবাবু বন্দুকে এক জোড়া কার্তুজ ঠেসে ছাদ থেকে এক সময় নেমে এল। বারান্দায় মৌটুসী পা ছড়িয়ে বসে রয়েছে। জানু অব্দি খোলা। শাড়িটা ঠিক মত পরতে পারে না আজও। অত সুন্দর ব্লাউসটারও বোতাম খোলা।

মৌটুসী বন্দুক সাফকরা সেই কালিঝুলিমাখা ন্যাকড়াগুলি নিবিষ্ট মনে চিবুচ্ছিল। ছোটবাবুকে দেখে একবার চোখ তুলে হাসল।

অভ্যাসমত তেড়ে মারতে গিয়ে ছোটবাবু হঠাৎ থামল। এই হাসিটা কেমন আশ্চর্য লাগে। জীবনে যে কোনদিন একটুও কাঁদতে জানল না—সে নিশ্চয় মানুষ নয়। তার হাসি তো অর্থহীন। স্মৃতির ভেতর দিকে গিরিবালাও নিঃশব্দে অস্ফুট হাসছে অকারণ। রাণীচকের পৈতৃক দালানবাড়িতে সেই ছবিটা আজও দেয়ালে টাঙানো আছে। কতবার ভেবেছিল এখানে নিয়ে আসবে। শিয়রে ঝুলিয়ে রাখবে। অথচ রাণীচক গেলেই যেন রাজ্যের কাজ এসে তাকে অন্যদিকে ঠেলে দেয়। মনে থাকে না।

গিরিবালা মরে গেলে এই বাঁধগুলি তৈরি হয়েছিল। ফলে সে ছোটবাবুর ফসলের মাঠ দেখে যেতে পারে নি। দেখেনি জীর্ণ প্রাচীন দালানবাড়ির ক্ষয়-ধরা সত্তা কেমন করে এই দূর হিজলের মাঠে নতুন গড়ে ওঠার রূপ পেল। ঐশ্বর্যে সাহসে সুখে অপরূপ হয়ে উঠল। অনাবাদী দুর্গম অরণ্য দেখে গিয়েছিল গিরিবালা—যার থেকে একটি কানাকড়িও আয় নেই রায়পরিবারের উত্তর-পুরুষের অংশে। গিরিবালা দারিদ্র্যকে দেখেছিল শুধু। মাতাল লম্পট জুয়াড়ি ছোটবাবুকে ঘৃণা করতে করতে শেষ মুহূর্তে একবার স্বীকার করে গিয়েছিল—তোমাকে ভালবাসতাম। ও আমার মুখের ঘৃণা; মনের নয়। হয়ত আজ

সুখের দিনে সে তার সেই গোপন ভালবাসাকে ছোটবাবুর ফসলের মাঠের মত—প্রতিটি ইচ্ছার শিশিরবিন্দু দিয়ে সাজিয়ে দিত।

একটা নেপথ্য কাঁটা ফুটে থাকা এটুকু। ছোটবাবুর সব মনে পড়ে।

মৌটুসী হবার পরেই গিরিবালা ধসেপড়া দালানের এক কোণে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিল। মা-মরা মেয়ে। দেখাশোনার কেউ নেই। ছোটবাবু তখন জঙ্গলের মাঠে ফসলের স্বপ্ন দেখছে। কোর্ট-কাছারি শহর দলিলদস্তাবেজ নিয়ে ব্যস্ত। হামাগুড়ি দিয়ে মাটি ইট-কাঠের টুকরো খেয়ে মানুষ হচ্ছিল মৌটুসী। একদিন দেখেছিল সে আস্ত একটা সাপ ধরে মুণ্ডুটা চিবোনর তালে। ভাগ্যিস সেটা হেলে সাপ। কিন্তু প্রচণ্ড ক্রোধে ক্ষিপ্ত ছোটবাবু তাকে তুলে আছাড় মেরেছিল। বেশ কিছু সময় চুপচাপ পড়ে ছিল মৌটুসী। মরে যায় নি, এই এক আশ্চর্য। এক সময় চোখ খুলে তার উদ্ভট হাসি। ঘোর নিঃশব্দ। শুধু চোখের হাসি। সে কাঁদতেই জানে না।

ছোটবাবু কাঁদতে পারে নি। তাই দারুণ জোরে সেও হেসে উঠেছিল সেদিন। প্রাচীন বিবর্ণ দালানের ফাটলধরা ছাদে তার অট্টহাসির প্রতিধ্বনি এখনও যেন কান পাতলে শোনা যায়।

এই হাসিটা ছিল এক আবিষ্কারের।

মৌটুসী যেন প্রকৃতির এক অদ্ভুত তামাশা। জীবন যে এমন অসংলগ্ন কিম্ভূত কিছু হয়, তার কোন সাক্ষ্য নেই। ওই কেঁচোটাও সহজাত বৃত্তি বশে চলাফেরা করতে জানে। আক্রান্ত হলে ছুটতে জানে। সর্বোপরি সে তার শত্রুকেও চিনতে জানে। শামুক, পিঁপড়ে, সাপ, বিছে, কাঁকড়া⋯প্রাণী যত নীচু স্তরেরই হোক, পরিস্থিতিতে সাড়া দেওয়া তাদের সহজাত ক্ষমতা। এমন কি অ্যামিবাও নির্দিষ্ট নিয়মে চলার জন্য সতত প্রস্তুত। কিন্তু মৌটুসী? ওর আহার নেই, নিদ্রা নেই, আপন-পর ভেদ নেই—একেবারে সকল সম্বিতের বাইরে যেন। কোনও নিয়ম তার জন্যে সৃষ্টি করা হয় নি। জোর করে খাইয়ে দিতে হয়। ঘুম পাড়িয়ে দিতে হয়। চিনিয়ে দিতে হয় কোনটা কী। কারণ একটা সাপ আর এক টুকরো বিস্কুটে কী পার্থক্য তা সে বোঝে না।

এমনি করে নিয়মহীনতার মধ্য দিয়ে বয়স পাচ্ছিল মৌটুসী। ফ্রক ছেড়ে শাড়ি পরার সময়ও তার জীবনে এল। অথচ নির্বিকার। ডুবে যাবার ভয়ে খালের জলে নামতে নিষেধ করা হয়েছিল। একদিন দেখা গেল, ঠিকই নেমেছে। তারপর উঠে আসছে শাড়িখানা জলে খুইয়ে। ছোটবাবু ছুটে গিয়ে ছড়ির

আঘাতে তার সারা শরীর ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়েছিল। তখন ওই উদো কোত্থেকে একটা কাপড় জড়িয়ে দেয়। হাত ধরে টেনে নিয়ে আসে। মারধরের সময় উদোটাই যা বাঁচায়। হয়ত উদোর ভাষাটা মৌটুসী এই সবের মধ্য দিয়ে কিছু বুঝে থাকবে। ক্রমশ দেখা যাচ্ছিল—উদো বুঝিয়ে দিলে কিছু করা-না-করার তফাৎটা মৌটুসী একটু-একটু বুঝেছে। ছোটবাবু খানিক আশ্বস্ত হয়েছিল। মাঠের দিকে চলে গেলে আগের মত মৌটুসীর সম্পর্কে উৎকণ্ঠায় থাকতে হত না তাকে। জানত—উদো তার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখেছে।

মৌটুসীও যেন উদোর মুখোমুখি কেমন পোষা প্রাণীর মত গুটিয়ে যায়। ছোটবাবু ভেবেছিলেন ওটা ভয়। মারধর যার কাছে অর্থহীন ব্যাপার, আদর-সোহাগও যে বোঝে না, উদো হয়ত তার কোন গোপন চেতনা-কেন্দ্র আবিষ্কার করেছে,—সেখানে উদো রীতিমত একটা সাড়া সৃষ্টি করে থাকবে। আর সেই সাড়াটাই ভয়ের আকারে দেখা দিচ্ছে।

না! এর বেশী কিছু বোঝে নি ছোটবাবু। কিন্তু বুঝতে হল ক্রমে-ক্রমে।

টাটকা খাঁটি দুধ পাবার জন্যে গুটিকয় গাভী পুষেছিল ছোটবাবু। পরে দেখা গেল খামারবাড়ির লোকজনের খিদে মেটানোর পরও বাড়তি থেকে যায়। শহরে চালান দেওয়া যায়। পয়সা আসে। এবং পয়সাকে যে অবহেলা করে নি সে, তার প্রমাণ এই দূর প্রান্তরে বসতি, ফসলের মাঠ, মামলামোকর্দমা।

উদো ওই পরিচর্যার ব্যাপারেই ছোটবাবুর হাতে আসে। মা-বাপ নেই. তিনকূলে কেউ নেই। পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। যার খুশি একপেট খাইয়ে দিয়ে তাকে পাহাড়প্রমাণ কাজের বোঝা চাপালে সে পিছপা নয়। নির্বিবাদে খাটে। মারধোর হজম করে। খানিক কাঁদে। তারপর গা-গতর ঝেড়েমুছে বড় বড় দাঁত খুলে হাসে। হাঁটলে মনে হয় আস্ত ভালুক থপথপ করে চলেছে।

অর্থাৎ কোনও কোনও দিকে ওই মৌটুসীর যোটক।

উদোর শরীরও আস্তে আস্তে ভয়ালদর্শন হয়ে উঠছিল। এখানে হিজলের মাঠে প্রচুর বিশুদ্ধ হাওয়া-বাতাস। রোদ-বৃষ্টি-ঝড়ে দুর্বার বন্যতা। নিরাবরণ এই ব্যাপকতা মানুষকে শক্তি দেয় প্রতিরোধের। নদীর গাঢ় গেরুয়া জল পাগলা মোষের গতিবেগ নিয়ে আষাঢ়ে যে প্রচণ্ড স্রোত সৃষ্টি করে, মানুষের শরীরে তার কিছু রেখে যায় যেন। তারপর শরৎকালের স্বচ্ছ-হয়ে-ওঠা জলের প্রান্তে দাঁড়িয়ে নিজেকে মনে হয় কোন এক সার্বভৌম সম্রাট।

ঠিক তাই-ই। ছোটবাবু যেমন ভাবে নিজেকে।

উদো তার সার্বভৌমত্বটুকু ছোটবাবুকেও জানাতে ব্যস্ত হচ্ছিল যেন। ডাকলে সে ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁড়াচ্ছিল—বামুন, ওদিকে আমার কাজ রয়েছে না?

ছোটবাবু বরং কৌতুক অনুভব করছিল। টের পাচ্ছিল এটা ঠিক অবাধ্যতা নয়। বয়সের দেমাক। ছোঁড়াটা যৌবনে পৌঁছেছে এবার।

তবু সবটা বোঝার বাকী ছিল।

কদিন আগে ছোটবাবু দেখেছিল—খড়ের স্তূপের এক প্রান্তে উদো আর মোটুসী খুবই ঘনিষ্ঠভাবে বসে রয়েছে। মোটুসীর একটা হাত উদোর কর্কশ কুঞ্চিত পিঠে—অন্য হাত দিয়ে সে ধানের কচি থোড় বের করে চিবোচ্ছে কোঁচড় থেকে। উদো হাতমুখ নেড়ে কী সব বোঝাচ্ছে তাকে।

স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল ছোটবাবু।

চুপিচুপি সরে এসেছিল। কী জানি কেন ক্রোধটা খুব দানা বাঁধছিল না। বরং কী একটা অভিমান তাকে গিরিবালার স্মৃতির দিকে ঠেলে দিচ্ছিল। সারাটা রাত ছোটবাবু ঘুমোতে পারে নি।

এ যেন চুপিচুপি একটা গুরুতর দুষ্কর্ম লালন করার ব্যাপার—যার আবরণ তুলে দেখতে নিজেরই ভয় করে। দিনের পর দিন যা পরিণতির পথে চলেছে। তা শুভ কি অশুভ ঠিক টের পাচ্ছে না।

ছাদ থেকে নেমে এসে ছোটবাবু তখন খামারবাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। ডাকল—ও উদো, উদো!

উদো সাড়া দিয়ে বলল—এই তো আছি।

বড় বড় দাঁত খুলে সে হাসছে। ছোটবাবুর গা জ্বলে গেল দেখতে দেখতে।—দাঁতগুলো ঢাক দিকি ব্যাটা! একটা মোষ ক্ষেপেছে শুনেছিস?

—হ্যাঁ।

—বাইরে-টাইরে বেরোস নে। আর দেখিস, মোটুসীও যেন বেরোয় না।

উদো মাথা নাড়ল।

বন্দুক হাতে ছোটবাবু বেরিয়ে গেল।

বাঁওড়ের দিকে চলতে থাকল সে। সকালে আরশাদ শিকারীকেও খবর দেওয়া হয়েছে। তাক করে বন্দুক ছুঁড়তে তার জুড়ি নেই।

প্রশস্ত নালার আকৃতি জায়গাটা। বর্ষায় জল জমে। এখন শুকিয়ে গেছে। ঘন ব্যানা আর কাশ গজিয়েছে নরম মাটিতে। কাশফুলের ওপর চক্রাকারে

ছোট ছোট পাখি উড়ছে। কাঁটাবাবলার ডালে বসে একটা শামুকখোল পায়ে ঠোঁট ঘষছে। এই শরৎকালে ঘাস আর ভেজামাটির অদ্ভুত গন্ধ ছড়ায় চারপাশে। যতদূর চোখ গেল, ছোটবাবু আরশাদ শিকারী অথবা ষোষটাকে খুঁজছিলো।

হঠাৎ সুমুখে কাশঝোপটার ওপর করকর করে একঝাঁক পাখি উড়ে গেল। তারপরই ঝোপটা ভীষণ নড়তে থাকল। ছোটবাবু চমকে উঠেছিলো। মাত্র হাতদশেক দূরে সেই সোনালী রং-এর ষোষটা থমকে দাঁড়িয়েছে মুখোমুখি।

পলকে সমস্ত শরীরে যেন মূর্চ্ছার মতো একটা দুরন্ত ঘূর্ণি ছোটবাবুকে অস্থির করেছে। চোখ বুজে মাথার মধ্যবিন্দু লক্ষ্য করে ঘোড়া টিপল সে। জলন্ত বারুদের চিৎকারে হিজলের মাঠ প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে দিল চারপাশে। এই শব্দটাই নিজেকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে।

ষোষটাও ভয় পেয়ে গেছে। শিং উঁচু করে ধানের ক্ষেত ভেঙে ছুটে চলেছে সোজাসুজি। ছোটবাবু অনুসরণ করল। এই অনুসরণে হিংস্রভাব কিন্তু প্রকট ছিল না।

খালের পারে খামারবাড়ি।

ছোটবাবু দেখল ষোষটা ওদিকেই চলেছে। তার বুক কেঁপে উঠল দেখতে দেখতে। মৌটুসী কি গেট খুলে বাইরে বেরিয়েছে?

খাল পেরিয়ে ষোষটা বাঁধে উঠেছে ততক্ষণে। খামারবাড়ির সুমুখে ঢালু জমিটায় ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তারপর ছোটবাবু দেখল উদো একটা প্রকাণ্ড কাটারি হাতে ছুটে এল।

ছোটবাবু চিৎকার করতে গিয়ে হঠাৎ থামল। অদ্ভুত একটা সূক্ষ্ম কৌতুকের বোধ মাথার ভিতরদিকে সাপের মতো ফণা তুলে কাঁপছে। বিষধর সাপ।

ফের সে ডাকবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু উদোর কোপ খেয়ে ষোষটা পিছিয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। পরক্ষণেই সে দারুণ গর্জন করে ছুটে গেল শিং নেড়ে। উদোকে তুলে ছুঁড়ে ফেলল পেছনদিকে।

ছোটবাবু বাঁধের উপর থেকে দেখতে দেখতে কেমন নিরাসক্ত হয়ে পড়ছিল যেন। তার ডেকে বলতে ইচ্ছা করছিল—ওটা মা হবে রে উদো, ওকে কেন মারতে গেলি মিছেমিছি? এই শব্দগুলি তার জিভে খসখস করছিল। অনুশোচনা হচ্ছিল, বন্দুক ছোঁড়ার জন্য। কি দরকার! ওর মালিক শ্রীগধিরই একটা মদ্দা ষোষ জোটানোর চেষ্টা করছে। শান্ত হয়ে যাবে সোনালী ষোষটা।

খুব ক্লান্তি বোধ করছিল ছোটবাবু। চোখের সুমুখে উদোকে ছুঁড়ে ফেলতে দেখে তার মনে হল, উদো তার কৃতকর্মের ফল পেয়েছে। ছোটবাবু হঠাৎ যেন ক্ষেপে যাচ্ছিল এসব ভাবতে। দারুণ অশ্লীলভাবে গালাগালি করতে ইচ্ছে হচ্ছিল তার। কিন্তু আরো একটু এগিয়ে সে দেখল, উদো মোটেও কাবু হয়নি। বরং সেও হিংস্রভাবে গর্জন করে পেটটা এক হাতে চেপে ধরে ফের কাটারি তুলেছে।

—একটা জানোয়ার, পাষণ্ড, শয়তান! দাঁতে দাঁত চেপে ছোটবাবু কথাগুলি বলল।

দ্বিতীয় আঘাতে মোষটা নিদারুণভাবে আহত হল। এবার সে এত জোরে গর্জন করে উঠল যে কানে তালা ধরে যায়।

তারপর ছোটবাবু যে দৃশ্য দেখছিল, মুহূর্তের জন্য পাথর হয়ে গিয়েছিল। মৌটুসী গেট খুলে ছুটে আসছে। শরীরের আবরণ খসে গেছে। উন্মাদের মতো মৌটুসী ঠিক জন্তুর ভাষায় চাৎকার করে মোষটার সুমুখে এসে দাঁড়িয়েছে। উদো সরে গেছে তফাতে। রক্তাক্ত শরীরে হাঁফাচ্ছে জিভ বের করে। মোষটাও কাবু হয়ে পড়েছে। মাথা নীচু করে এবার সে মৌটুসীর দিকে ছুটে গেল। ছোটবাবু বন্দুক তুলেছিল। মাছিটার সঙ্গে একাকার করে দেখল মিলনোন্মত্তা জন্তুকে। সে ঠিক করতে পারছে না কিছু। ট্রিগারে হাত রেখে নিশ্চল হয়ে গেছে। তার সমস্ত সত্তায় মৌটুসী ও মোষটা এক হয়ে গেছে লক্ষ্যে।

পরমুহূর্তে বন্দুকের আওয়াজ। পেছন থেকে আরশাদ শিকারী বলল—কী ব্যাপার? কার্তুজ ভেজা ছিল নাকি? ভাগ্যিস ঠিক সময়ে এসে পড়েছিলাম

ছোটবাবু শুধু ঘাড় নাড়ল।

সুমুখে সোনালী মোষটা পড়ে রয়েছে। তার পাশেই উদো। দুজনেই রক্তাক্ত শরীরে হাত পা ছড়িয়ে নিজ নিজ বীভৎসতাকে প্রকট করছে।

মৌটুসী দাঁড়িয়ে আছে দুটি মৃতদেহের মাঝখানে তেমনি স্তব্ধ। ছোটবাবু তার হাত ধরে টানল।—ঘরে আয়।

চলতে চলতে হঠাৎ থেমে মেয়ের মুখের দিকে তাকাল সে। মৌটুসী—সেই জড়ভরত মেয়ে বোধ-বিবেকহীন মৌটুসী—নাকি অন্য কেউ? ছোটবাবু নিষ্পলক দেখতে থাকে। আর তাই লক্ষ্য করে আরশাদ শিকারী চাপা স্বরে বলে—আপনার বেটি কাঁদছে।

সাজ ভেসে গেছে

'আজ্ঞে সার, নাম মইলোবাস, নিবাস সাকিন মাদারহাটি, পোস্টোআপি গোকরোণ, থানা কান্দি, জেলা মুচ্ছিদাবাদ...'

—'ভাল। কী চাই?'

—'আজ্ঞে. সাহায্যো!'

—'সাহায্য? কেন? কিসের?'

—'আজ্ঞে সার, বেউলোর দলের।'

ব্লকের সরকারী সমাজ শিক্ষা সংগঠক ভুরু কুঁচকে তাকান।—'আবার কী?'

সঙ্গে এসেছে মতি চৌকিদার। সবিনয়ে হেসে বুঝিয়ে দেয়, 'বেউলানখি পালা সার। পেচণ্ড বান-বন্যেয় সাজের বাকসোপেঁটরা সব ভেসে গিয়ে দেখুন না, দরখাস্তে অঞ্চলপ্রধান সব নিকে দিয়েছেন। মইলোবাস, দরখা আগে দাও সারকে।'

অফিসার বাবুটি কলকাতার মানুষ। সবে চাকরি পেয়ে এই অখণ্ডে জায় এসেছেন। খিকখিক করে হাসেন।—'তাই বলো। তা কী নাম বললে যে

—মইলোবাস স্যাক, সার।'

অফিসার তাকান লোকটির দিকে। বছর বিয়াল্লিশের মধ্যেই বয়স সম্ভব বিশাল শরীর। গায়ে ময়লা হাতাগুটানো রঙীন পানজাবি, পরনে মালকো ধরনে ধুতি—এলাকার মাটির হলদে ছোপলাগা, পায়ে রবারের ফাটাফু স্যাণ্ডেল এবং কাঁধে তেমনি শ্রীহীন ঝোলা। লোকটার গায়ের রং তামা খাড়া মস্তো নাক, বড় বড় কান, টানা চোখে হতচকিত বিহ্বলতা, কপ তিনটে ভাঁজ। একমাথা বাবরী চুল। তিনি ফের হাসেন—'তুমি তো শি তাহলে। আর্টিস্ট! হ্যাঁ?'

মতি হাসে। মইলোবাসও সাহস পেয়ে হাসে। মতির সলাতেই এসে মতি বলে—'হুকুম পেলে এক আসর গেয়ে দেবে, সার। কিন্তু পেচণ্ড বানে...

মইলোবাস যুগিয়ে দেয়—'সাজ ভেসে গিয়েছে।'

অফিসার আরামে হেলান দিয়ে বলেন—'তো মইলোবাসটা ... বলো তো?'

পিছন থেকে তৃতীয় একজন, সে একেবারে তরুণ, কালো বেঁটে ও
চ্ছিত চেহারা, পরনে ধুতি ও নীলচে হাফশার্ট, ব্যাখ্যা করে দেয়—'নাম
র মণ্ডলা বখ্‌শ। অশিক্ষিত লোক সব। কেউ ডাকে মৌলবাস, কেউ
ংলোবাস।'

—'তুমি কে?'

—'আমি সার বাহাদতুল্লা। দলে বৈয়ালি করি।'

—'এ্যাঁ?'

এসব আঞ্চলিক টার্ম ভদ্রলোকের জানবার কথা নয়। মতি সব ব্যাখ্যা
রে। বৈয়ালি বা বইয়ালি করা মানে প্রম্প্‌ট করা। বাহাদতুল্লা অল্পস্বল্প লেখা-
ড়া জানে। সে পালার হাতেলেখা মস্তো খাতা থেকে প্রম্প্‌ট করে আসরে।
খন তাকে মাথায় হারিকেন চাপিয়ে আলো দেয় যে তার নাম নগেন
গা। আঙুলে সিঙ্গি মাছের কাঁটা ফুটে জ্বর হয়েছে বলে আসতে পারে নি।
নের জল নেমে গিয়ে খালে-জলায় এখন বেশ মাছ হচ্ছে।

দরবার করতে আরও সব এসেছে। যে বেউলো সাজে, তার গায়ের রং
লো। হাল্কা গড়ন। মুখে মেয়েলি ছাঁদ। বছর পনের-ষোল বয়স হবে।
ম অমূল্য, জাতে বাউরী। আর লখিন্দর? সে না এসে পারে? দল-দল
রেই তার বউ পালিয়েছে। তালাক দিতে হয়েছে। কারণ শ্বশুর লোকটা,
রাজী সম্প্রদায়ের। তাদের কাছে গানবাজনা হারাম—নিষিদ্ধ। বিয়ের
াগে জামাই দলের নিছক 'সাপোর্টার' ছিল। হঠাৎ আগের লখিন্দর খুনের
মলায় জেলে ঢুকল। ঢুকল তো ঢুকলই। ফিরতে বুড়ো হয়ে যাবে। তখন
াজো নতুন নথাইকে। লখিন্দর বা নথাই হবে সুপুরুষ—ঢলঢল রূপলাবণ্য,
সরে তাকে দেখাবে দ্বারকানদীর আদিম বিশুদ্ধ আকাশের সেই প্রকৃত চাঁদ
যাদারহাটির ধরণী তহশিলদার আজও বিশ্বাস করেন, সেই চাঁদে আমেরিকান
রাশিয়ানদের বাবার সাধ্যি নেই পা বাড়ায় এবং সোনাই ফকির হুঁহুঁ হেসে
লছিল—'এ চাঁদ কি সে চাঁদ বটে মানিকরা?') সেই চির অলৌকিক চাঁদ
বে আসরে, চাঁদসদাগরের চোখের মণি! আর চারু মাস্টারের বেহালা শুনে
রন্দির বিধবা মেয়েটা তখন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদবে। আসরে তখন বিপুল
দ্যাৎস্নায় হাজার বছরের গ্রামীণ বিষাদ জেগে উঠবে। সে কি সহজ কথা?
াজো সেই আদরের নথাইকে। নথাই মিলেছিল। আকাশ আলি নাম।
াপের নাম আব্বাস হাজি। হজ করেছে—দাঁত পড়েছে। মোড়ায় বসে

শণের দড়ি পাকায়। ছেলে নখাই সাজে তো কী করবে? যৌবনে মানুষ বুনো ঘোড়া। বয়স হলে তখন তৌবা করে মক্কা যাবে। ব্যাস!

আকাশ আলি হিরো। তাই তার চুলে তেল বেশি। গায়ে আদ্দির পানজাবি—কিন্তু কুঁচকে জড়োসড়ো। হাতে ঘড়িও আছে। হজে গিয়ে বাপ এনেছিল। পায়ে কাদায় ভূত কাবুলি চপ্পল।

কিন্তু সে বড় লাজুক। পিছনেই আছে। দরজার কাছে। আর আছে 'নারাণবাবু' তবলচী। বাবু মানে বাবুবাড়ির গাঁজাখোর উড়ুক্কু মাস্তান ছেলে। বাড়ি পাশের গাঁয়ে। ভদ্রলোকের গাঁ। বাবা ননী মুখুয্যে পোস্টমাস্টার ছিলেন। ছেলে নারাণ ক্লাস ফোরেই বেরিয়ে পড়েছে, স্বাধীনতার স্রোতে ভাসমান। মদতাড়িগাঁজাভাং জমিয়ে টেনেছে এই বয়সেই। কিন্তু সেও শিল্পী ছেলে। তবলায় ঠুংরীগাইয়ে ওস্তাদ হাবল গোঁসাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। গোঁসাই বলেছিলেন—'আয় শালা, সঙ্গ ধর।' কিন্তু সমফাঁকের মুখে গোঁসাইয়ের থাপ্পড় মারা অভ্যেস। একে তো সব সময় মাথার মধ্যে ভোঁ বাজে। অগত্যা নারাণ জুটেছে বেউলো দলে। ব্লক আপিসে দলের সঙ্গে রিপ্রেজেন্টেশনে এসেছে। কারণ সঙ্গে একজন বাবুটাবু থাকা ভালই, যদি পাত্তা দেন ওনারা।

অফিসার বলেন—'তাহলে তুমিই চাঁদ সদাগর?'

মইলোবাস সলজ্জ মাথা নাড়ে। মতি বলে—'শুধু তাই না সার, ও ছিল একসময় এলাকার সেরা পালোয়ান। মালামোতে ওর জুড়ি ছিল না। সাতখানা মেডেল আছে ঘরে। নতুন গামছা যে কত পেয়েছিল, হিসেব নেই। মৌরীগার বাবুরা পেতলের ঘড়া দিয়েছিলেন। ওনাদের গাঁয়ে হায়ার করে এনেছিল পচ্ছিমে পালোয়ান। ভকতরাম নাম। তাকেও ধুলোপিঠ করেছিল আমাদের মইলোবাস। কিন্তু শরীলে ব্যামো ঢুকল। এখন ভেতরটা ঝাঁঝরা।

অফিসার কেমন করে জানবেন এসব? খরায় তুতিনটে মাস বৃষ্টির আশায় গাঁয়ে-গাঁয়ে মালামো হয় দিনক্ষণ দেখে। একজোড়া ঢোল বাজে। ঢোলের বোল ভারি মজার:

> ঢোল্ টিপাকাঠি টিপ্ টিপাং
> ওই শালাকে চিৎপটাং···

জড়াজড়ি দুই জোয়ান মাটিতে দাপাদাপি তুলেছে, গগন-পবন ভুভাই ঢুলি তাদের ঘিরে দ্রুততালে বাজাতে থাকে···চিৎপটাং···চিৎপটাং চিৎপটাং···এবং একজন চিৎপটাং হলেই ঢোলে তেহাইয়ের খাসছাড়া আওয়াজটি ওঠে—

ভুড়ভুঙ্! গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে ওঠে হাজার গ্রামীণ মানুষ: এই ও-ও-ও। গাঁয়ের বউঝি চমকে উঠেই হাসে। হাসিটি হাজার বছরের।

একদা মইলোবাস ছিল পালোয়ান। পালোয়ান ছাড়া চাঁদ সদাগর মানাবে কেন? সওয়া হাত বুকের ছাতি না হলে কেমন করে বেরোবে ও ভয়ঙ্কর গর্জন: 'সাবধানে চ্যাংমুড়ি কানী!'

মাথায় লাল ঝলমলে পাগড়ি, গায়ে লাল রেশমি বেনিয়ান রাংতার কাজ করা, পরনে মালকোচাকরা লাল কাপড়, আর হাতে হিন্তালের লাঠি। উঁচু হয়ে থাকা মুখ, পাকানো বিশাল গোঁপ, কপালে লাল ফোঁটা—সাজঘর থেকে হুংকার দিতে দিতে আসরে আসে—'জয় শম্ভো! জয় শম্ভো!'

—'বলো হে চাঁদ সদাগর, একবার পার্ট বলো শুনি!'

মতি শশব্যস্তে বলে—'নজ্জা করছে সার। সরকারী আপিস বটে কি না। আসরে হলে···'

—'উঁহু, একবার তো শুনি। নৈলে কেমন করে বুঝবো যে সত্যি আছে তোমাদের বেহুলার দল?'

সমস্যা বটে। মতি বলে—'তিন-পুরুষের দল, সার। নিবাস আলি গোমস্তা পালাটা নেকেছিলেন আমার কত্তাবাবার আমলে। সেই খাতা এখনও আছে। তা থেকে নকলে নিয়ে চলছে। বিশ্বাস না হলে এনকোয়ারি করে আসুন।'

বৈয়াল বাহাসতুল্লা বলে—'আমার দাদো এখনও বেঁচে আছে, সার। তার মুখেই শুনবেন। ছেলেবেলায় তিনি বেউলো সাজতেন! তেমন বেউলো আর হবে না সার। মৌরীতলার বাবুদের কেষ্টযাত্রার দল ছিল। ওনারা দুবছর আটকে রেখে রাধিকে করেছিলেন। শেষে গাঁসুদ্ধ লোক আসর থেকে তুলে নিয়ে আসে। খুব হ্যাঙ্গামা হয়েছিল সার। বাঁশির মতো গলা, আর চেহারাও সার তেমনি। এখন দেখলে মিথ্যে লাগবে।'

বিরক্ত অফিসার বলেন—'ঠিক আছে। দেখব'খন। কিন্তু হবে কিনা বলতে পারছি না। এখন এসব ব্যাপার আপাতত বন্ধ।'

মইলোবাস অভিমানে মুখ খোলে আবার।—'লক্ষ্মীনারাণপুরের মনিরুদ্দি কেষ্টযাত্রার সাজ কিনতে টাকা পেয়েছে। বাবুদের যাত্রার দল তো সব গাঁয়ে টাকা পাচ্ছে। মনিরুদ্দি আমার ভাইরাভাই সার। সে বললে তোমরাও পাবে। তাই এলাম। আসতাম না—বানে যে সাজের বাকসো ভেসে গেল। মাদারহাটিতে এক বুক পানি হয়েছিল, এনকুরি করুন। করে দেখুন!'

অফিসার তাকিয়ে থাকেন। ভাবেন। তারপর একটু হেসে বলেন—'চৌকিদার, তুমি কিসের পার্ট করো বললে না তো?'

মতি চৌকিদার—সে সরকারী লোক, পরনে রাজপোশাক, তার দাপটে মাদারহাটি থরথর করে কাঁপে। তারও কালো মুখে লজ্জার রং ঝলকে ওঠে। মাথা নীচু করে বলে—'আমি সার সঙাল। সঙ দিই। কমিক পার্টও করি। লেজ লাগিয়ে হনুমান সাজি। চাঁদ সদাগরের নৌকো ডুবিয়ে দিই! আবার ফটিকচাঁদ কুম্ভকারও সাজি। কখনও বিবেকও হই। গান গাই।'

—'বাঃ! তাহলে তুমিই একটা গান শোনাও।'

—'আজ্ঞে?'

সকৌতুকে অফিসার বলেন—'না শোনালে দরখাস্ত পড়ে থাকবে, চৌকিদার।'

অগত্যা একটু কেসে এবং এদিক-ওদিক তাকিয়ে মতি সলজ্জ হেসে বলে—'বরঞ্চ ফটিকচাঁদের গানটাই গাই, সার।'

—'বেশ, গাও।'

মতি আচমকা লাফ দিয়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতে গেয়ে ওঠে: 'ও কে ডাকলে রে ফটিকচাঁদ পিসে/আষাঢ় মাসে চাক ঘোরে না রইয়েছি বসে/ওকে ডাকলে রে—এ-এ এ/…

আপিসসুদ্ধ তোলপাড় অমনি। এ-ঘর ও-ঘর থেকে কেরানীবাবুরা বেরিয়ে আসেন। বিডিও সায়েব বাইরে। কৃষি অফিসার উঁকি মারেন। প্রৌঢ় হেডক্লার্ক বিরক্ত হয়ে গজগজ করেন। কিন্তু ফাইলের একঘেয়েমি হঠাৎ এক আজগুবি ঘটনার তলায় চাপা পড়ে তো মন্দ না। ভিড় জমেছে বারান্দা অব্দি। আরে বাবা, এতো শহরের কেতাদুরস্ত আপিস নয়। মাঠের মধ্যে একতালা কিছু দালান। পিছনে খাল। দিনমান চাষাভুষো লোকের আনাগোনা। আবহাওয়াটাই এ রকম। মিছিল, দাবিদাওয়া, রিলিফ, সেচ, সার, কত রকম ফিরিস্তি। তার সঙ্গে কালচার। হ্যাঁ, ফোক কালচার। জাতীয় সড়কের ধারে এই বাঁজাডাঙায় এক সময় ফণিমনসা কেয়া ঝোপ আর বাজপড়া তালগাছ ছিল। সেখানে এখন এই সব বাড়ি আর ফুলবাগিচা। ইউক্যালিপ্টাসের চিরোল পাতা কাঁপে হাওয়ায়। খালের সাঁকোতে জিপের চাকা ঘটঘটাং আওয়াজ তুলে কংক্রিটে গিয়ে উধাও হয়। মাথার ওপর বিদ্যুতের তার। দূর মাঠের দিগন্তে বিশাল মঞ্চের সারি। ফলকে লেখা আছে 'এগারো হাজার ভোল্ট, সাবধান'।

নীচে মড়ার মুণ্ড আর দুটো আড়াআড়ি হাড়। তার আশেপাশে
চাষা লাঙল ঠেলে—উরবুর্‌বুর্ হট্ হেট্ হেট্…
ততক্ষণে চাঁদ সদাগরও তৈরি। মতির সাহসে সাহস। সামনে এক পা
ড়িয়ে দৈত্যের মতো লোকটা বিকট গর্জে বলে উঠেছে: 'খবর্দার চ্যাংমুড়ি
নী! প্রাণ যদি চলে যায়, পুবের সূয্যি যদি ওঠে পচ্চিমে, শিব ছাড়া ভজব
—পস্টো কথা কহে দিলাম। দূর হয়ে যাও! দূর দূর দূর……' এবং
রপর যেন পোজপশ্চার দেখিয়ে বুকের পাশে হাত চেপে চুপ করে গেছে।
হো হো করে হাসেন বাবুরা। কেউ-কেউ বলেন—বরং বেহুলার গান
নাও হে! বেহুলা কই? আসে নি?
বাউরির ছেলে অমূল্য একটু কেসে এক কানের পেছনে হাত রেখে
র ওঠে:

একো মাসো দুয়ো রে মাসো
তিনো মাসো যায় রে সোনার কমলা॥
জলে ভেইস্যে যায় রে সোনার কমলা॥
ও কী, জলে ভেইস্যে যায় রে
সোনার কমলা॥'

সত্যি বড় মিঠে গলা। স্বরে আদিম আবেগ আছে একটা। দুয়েকজন
র ফোক সঙের বাতিক আছে। তাঁরা অভিভূত হন। একজন বলেন—
মাগো পূর্ববঙ্গে মুসলমানেরাও এগুলা গাইত। আর গাজীর গানও ছিল।
ন আমরা সব পোলাপান! এক্কেরে এইটুকখানি!'
সমাজশিক্ষা সংগঠক বলেন—'রিয়েলি, আমার ধারণাও ছিল না এসব।
সমানরাও বেহুলা-কেষ্টযাত্রা করে? মাই গুডনেস্! শরৎ চাটুয্যের ওই
গহর ছিল। ভাবতুম, নিছক গুল! অথচ……ভাবা যায় না!'
মাদারহাটির বেহুলা দলটি মুখ তাকাতাকি করে। ছ' মাইল জলকাদার
ভেঙে এসেছে। সময়টা হেমন্ত। রোদ এখনও কড়া। দরদর করে ঘাম
য়। সবুজ মাঠ এবার পলির রঙে হলুদ। পচা ধানপাতার কটু গন্ধ
াচ্ছে। গাঁয়ে ফিরে এক দফা কটু-কাটব্য শুনতে হবে বুড়োদের। আর
ই বলার কথা ছিল না? সাজ কেনার সাহায্য চাইতে গেলে এই দুঃসময়ে?
-ঘরে মুখ চুন, খড়িপড়া চেহারা, রিলিফের পথ চেয়ে উসখুস করছে প্রতীক্ষায়।
র এই দুঃসময়ে কিনা বেউলো দলের সাজ ভেসে গেছে, সাহায্য চাই? লক্ষ্মী-

নারাণপুরের মনিরুদ্দি মাস্টার কেষ্টযাত্রার সাজ সাহায্য পেয়েছে, ভাল কথ
সেখানে তো বানবন্যা হয় নি। ডাঙা দেশ। শুখা-খরা নেই। ক্যানেে
জলে চাষ হয়। তাই বলে ডুবো দেশ মাদারহাটির তো এ সখ মানায় না—

তবে সে জন্যে এদের মুখ তাকাতাকি নয়। সার যে গহরের নাম করলে
তাই শুনে। তার সঙ্গে চাটুয্যেও বললেন। এতেই সব প্রাঞ্জল হয়েছে। নব
গাঁর গহর আলি পাকা ছড়াদার অর্থাৎ কবিয়াল। তার গুরু চাটুয্যে বটে
তবে শরৎচন্দ্র নন—পূর্ণচন্দ্র। পূর্ণবাবু এখন বুড়োমানুষ। তার ওপর সেব
গাজনে নিজের বেহাইয়ের নামে (কেলেঙ্কারির) সঙের গান বেঁধে জামাই চট
এবং মেয়ের দুর্ভোগ বাধিয়ে বসেন। শেষ অব্দি মেয়ের মাথায় হাত রে
প্রতিজ্ঞা করেছেন, এই শেষ। ওদিকে গহরের রবরবা বেড়ে যায়। ে
গহরেরও এবার বরাত মন্দ। নতুন গাঁ ডুবেছে। গহর বুক চাপড়ে কেঁদেে
সদ্য কিনে আনা ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণখানাও সর্বনাশা দ্বারকা ভাসিয়ে নি
রামায়ণ-মহাভারত গেল যাক্। ওস্তাদ চাটুয্যে বলেছেন—আমাদের—আমা
গুলো নিয়ে যেও। পদ্মপুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, কালিকাপুরাণ, প্রভাসখণ্ড চে
চিন্তে কদিনে ধারে যোগাড় করেছে রমজান দোকানীর কাছে। দোকান
কারবার নুনতেলের। যৌবনে সখ ছিল ছড়াদার হবে। হতে পারে নি
কিন্তু শাস্ত্র-পুরাণতত্ত্বে মহা ধুরন্ধর সে। বড় বড় কবির আসরে প্রখ্যা
কবিয়ালদেরও আসর থেকে উঠে আচমকা এমন প্রশ্ন করে, ঘোল খাইয়ে ছাড়ে
এদিকে সন্ধ্যার নমাজের আজান শুনলে মাথায় টুপি দিয়ে মসজিদে যায়। ত
তিন ছেলেও এ সব তত্ত্বে বিশারদ। বোলানের দল করেছে। তারা আস
প্রতিপক্ষকে কাবু করতে চায়। পাল্টা কাবু হলে বাপের কাছে দৌ
আসে।···হ্যাঁ গো, কুশঘাসের জন্ম কিসে বলে দাও তো শিগগিরি? রমজ
হেসে বলে—বরাহ অবতারের তিন গাছা লোম তুলে রেখেছিলেন মহামু
বাল্মীকি। তাই থেকে কুশ। তবে পাল্লাদারকে শুধোস তো বাবা, আদি
যখন নিরাকার, তখন ভগবান ভাসলেন বটপত্রে। বটগাছ নিরাকার ব্রহ্মা
তাহলে এল কোত্থেকে? এমনি সব পৌরাণিক রহস্যের জগতে বাস তাদে
একখানা ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ বন্যায় ভেসে গেলে একটা রহস্যময় ভূভাগ হারি
গেল সামনে থেকে। সবে সৃষ্টি বর্ণনাটা পড়া হয়েছিল গহরের। এই দুঃসম
দশটা টাকা পাবে কোথায়?

তল্লাটে একখানা আছে বটে, তার খোঁজ গহর রাখে। গুড়ুচির মুখু

রাজবংশীর। একবার মেডেল আর কলা আসরে ঝুলিয়ে কবির লড়াই চলেছে ঈশানপুরের মেলায়। বিপক্ষ কবিয়াল প্রশ্ন করেছে, ব্রহ্মার কন্যার নাম কী? জবাব জানে না গহর। রসিক শ্রোতা মুকুন্দ আসরেই বসে ছিল। বলেছিল—নামটা আম্মো জানি। পেটে আসছে, মুখে আসছে না। ঘরে শাস্তর আছে আমার। না বলতে পারলে কলা পাবে গহর। কাকুতি মিনতি করে মুকুন্দকে রাজি করাল। দুজনে চুপিচুপি শেষরাতে জলকাদা ভেঙে গুমুটি গেল। লম্ফ জেলে নামটা খুঁজল। হুঁ সন্ধ্যা। দুজনে আসরে ফিরল আবার। গহর সেবার মেডেল পেয়েছিল। সেই থেকে দুজনে বড় ভাব। কিন্তু ওই পর্যন্তই। মুকুন্দ প্রাণ গেলেও বই হাতছাড়া করবে না।

এসব খবর কিছু গোপন থাকে না তল্লাটে। গাইয়ে-বাজিয়েদের কাজ মানুষ নিয়ে, মানুষের সঙ্গে। আবেগবান হৃদয়। সহজেই সব গলগল করে উগরে দেয়, সমস্যা বা সুখদুঃখ। কে না জানে সর্বনাশা বানের পর গহর হাহাকার করে বলে বেড়াচ্ছে, আমার মাগ ছেলে ভেসে গেল না কেন? আমি ভাসলাম না কেন? হায় রে হায়, আমার বুকের নিধি ভেসে গেল...

তাহলে কি সরকার বাহাদুরের দয়া হয়েছে হতভাগা ছড়াদারের প্রতি? মাদারহাটির সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিরা মুখ তাকাতাকি করে। খুশি হয়। আশা জাগে। মতি চৌকিদার বলে—'গহর টাকা পেল, সার?'

শুনেই অফিসার হো হো করে হাসেন। এত জোরে হাসেন! দলসুদ্ধ চোখে পলক পড়ে না। এ হাসি কিসের বোঝে না তারা। একটু পরে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে তিনি বলেন—'গহরকে চেনো?'

মতি বলে—'চিনি সার। লতুন গাঁর। উঠ্‌তি কবেল। ভাল গায়।'

অতি গম্ভীর অফিসার মাথা দুলিয়ে বলেন—'সে গহর নয়। যাক্ গে, শোন! এখন তো ফ্লাড্ রিলিফের সময়। এখন কালচারাল ব্যাপারে টাকা-পয়সা দেওয়া আপাতত বন্ধ। কয়েক মাস যাক্। এসো। দেখব'খন।'

সকাতরে মইলোবাস বলে—'সামনে মাসে লবান্ন হবে সার। তখন বায়না পাব। কী নিয়ে গান করব?'

—'নবান্ন?' উনি একটু হাসেন আবার। 'ধান তো পচে গেছে। নবান্ন কিসের?'

পণ্ডিত বুঝে মতি ব্যাখ্যা করে—'ডুবো দেশে বান হয়েছে। কিন্তু ডাঙাদেশে

তো ধান হয়েছে সার। সেখানে নবান্ন হবে। মাদারহাটির বেউলো না শুনে নবান্ন হবেই না। খুব নামকরা দল। অঞ্চলে পেধান...'

অফিসারটি ঘড়ি দেখে বিরক্ত হল এবার।—'যারা বায়না দেবে, তাদেরই বলো গে না বাবা! আপাতত কোন উপায় নেই। আচ্ছা, তোমরা এস। আমি বেরোব...'

সামনে অঘ্রাণ। এবার অঘ্রাণে ডাঙাদেশে অর্থাৎ উঁচু মাটির এলাকায় শুভদিন বেছে-বেছে নবান্ন উৎসব হবে গাঁয়ে-গাঁয়ে। হিন্দু-মুসলমান সবারই উৎসব। মুসলমানরা জামাই আনবে। কত খাওয়া-দাওয়া হবে। হবে না শুধু মাদারহাটি—নতুন গা—ন' পাড়া—রামেশ্বরপুর এলাকার বানভাসা গাঁগুলোতে। পচা ধানের কটু গন্ধে বাতাস ভরা এখানে। বাবুরা লঙ্গরখানা খুলেছেন ইতিমধ্যে অনেক জায়গায়। টেস্ট রিলিফের কাজও চলছে অল্পস্বল্প। মাদারহাটির কাদা এখনও শুকোয় নি। ধসে যাওয়া ঘরের উঠোনে অনেক পরিবার খয়রাতি তেরপলের তলায় বাস করছে। কিছু জোতজমিওলা গেরস্থর উঁচু ভিটের বাড়ি এখনও টিকে আছে। বেউলো দলের দু-চারজনেরও দৈবাৎ টিকেছে। ঘর গেছে স্বয়ং চাঁদ সদাগরের। তার ঘরেই ছিল সাজের বাক্স। গাঁয়ের শেষে ঢালু জমিতে তার বাড়ি। নিশুতি রাতে আচমকা বিলের জল হু হু করে এসে ধাক্কা মেরেছিল। কোনমতে বউ আর চার-পাঁচটা কাচ্চাবাচ্চাকে জানে বাঁচাতে পেরেছিল। তার প্রায় সবই ভেসে গেছে। কিন্তু গতর আছে যখন, সব করে নেবে। আবার ঘর বানাতে পারবে। জমিতে চৈতালি ফলাতে পারবে। তাই সে নিয়ে ভাবনা নেই—ভাবনা সাজ ভেসে গেছে। দেড়-দুশো টাকার কমে এ বাজারে পুরো সাজ হবে না। কিছুটা চাঁদায়, কিছুটা কয়েক আসরের বায়নার টাকা জমিয়ে আগের বছর নতুন সাজ কেনা হয়েছিল। হারমোনিয়াম তবলা ঢোল কত্তালগুলো ভাগ্যিস ছিল আকাশ আলির বাড়ি। উঁচু ভিটে তাদের। সামনের খামার বা উঠোনটাও উঁচু। সেখানে বৃষ্টিহীন রাতে 'রিহাস্যাল' চলে। তাই ও বাড়ি ছিল যন্তরগুলো। যদি সাজের বাক্সটাও রাখা হত সেখানে, এই বিপদ ঘটত না। তবে এখন আর পস্তে কী হবে?

বিনিসাজে গাইতে গেলে কেউ শুনবেই না পালা। কেন শুনবে? নগদ পাঁচ টাকা বায়না, তিন ধামা মুড়ি, আধ টিন গুড়—তার ওপর বিড়িও আছে। দূরের গাঁ হলে তো ডাল ভাতও খাওয়াতে হয়। এত সব খরচ করে লোকে

সাজের ঝলমলানি দেখবে না? তা ছাড়া তলোয়ার? হায় হায়! ও ছুটোও বাক্সের মধ্যে ভরা ছিল! মুকুট ছিল। ঝকমকে ত্রিশূল ছিল। বল্লম ছিল। পুঁতির মালা ছিল। হা বাবা আল্লা ভগবান! এর চেয়ে চাঁদ সদাগরকে ভাসিয়ে নিলি না ক্যানে?

মাঠের পথে দলটা গাঁয়ে ফিরে চলেছে। হতাশ, ক্লান্ত, চুপচাপ। মইলোবাস মাথাটা ঝুলিয়ে হাঁটছে সবার পিছনে। তার মনে অপরাধবোধ প্রচণ্ড। তার ধরেই তো সাজের বাক্স ছিল। এখন ব্যর্থ দরবারের পর সেই অপরাধবোধ আরও তীব্র হচ্ছে। চাঁদ সদাগর সে। তার আত্মায় দাঁড়িয়ে আছে এক অহঙ্কারী উদ্ধত বিশাল পুরুষ—ক্রমশ দিনে দিনে সে তাকে দেখতে পেয়েছে। আসরে জনমণ্ডলীর সামনে যখন সেই ভিতরের পুরুষ পা ফেলে হাঁটে—সাজঘর থেকে আসরে, তার মনে হয় কাকেও পরোয়া করার নেই। গায়ে সাজ চড়ালে দফাদার কনস্টেবল দারোগা এস-ডি-ও ম্যাজিস্ট্রেট বাহাদুর তাবৎ সরকারী ব্যক্তি ও ক্ষমতাকে সে গ্রাহ্যই করবে না! আর তখন সে তো এ যুগের মানুষ নয়। তখন তার সাত ছেলে সাত-সাতটা বাণিজ্যতরী নিয়ে সমুদ্দুরে চলেছে। তরী ডুবে যাওয়ার খবর দিয়েছে বিবেক। তো কিসের পরোয়া? জয় শম্ভো জয় শম্ভো! চ্যাংমুড়ি কানীকে পুজো করবে তাই বলে? হাতের হিন্তাল যষ্টি নাড়া দিয়ে গর্জন করেছে সে। তার ঠোঁটে ঘৃণা, চোখে ঘৃণা। হুঁ, এখন বাবুই হও, লাট বেলাটই হও—তফাৎ যাও। চাঁদ সদাগর জানে শুধু একজনকে। তিনি শম্ভু—শিব। দেবাদিদেব মহাদেব। এই ভাই বইয়াল! আস্তে। পাট মুখস্থ আছে। গায়ে সাজ চড়ালেই সব মুখের ডগায় ভেসে আসে। সাজ চড়ালেই তাকে 'সে' এসে ভর করে—যে মাথা নোয়াতে জানে না। সাজ চড়িয়ে সে স্পষ্ট দেখতে পায় কঠিনতম লোহার বাসরঘর—দেয়াল ঘুরে হিন্তাল কাঠ কাঁধে নিয়ে পাহারা দেয়। হায়, সেই ঘরে ছিদ্র ছিল। সোনার লখাই নীলবর্ণ হল। চাঁদ সদাগরের মাথা ঝুলে পড়ে।—'আঃ আঃ আহা হা!'

—'কী হল হে মইলোবাস? পাট বুলো নাকি?'

মতি চৌকিদার পিছন ঘুরে বলে। কেউ কেউ হাসে। মইলোবাস বলে, 'না।'

—'কী বুলছ মনে হল?'

—'হুঁ, একটা কথা ভাই চৌকিদার।'

—'বুলো।'

এখন নিজেদের ভাষায় কথা বলছে ওরা। এ তো বাবু ভদ্রজনের সঙ্গে কথা বলা নয়, আপিস-কাছারিও নয়। এখন মাতৃভাষায় না বললে সুখ নেই। ওকে চুপ করে থাকতে দেখে মতি আবার বলে—'বুলো হে কথাটা!'

—'যদি সাজের বাকসোটা আকাশের ঘরেই থাকত!'

মতি ভর্ৎসনা করে—আবার উই কথা? সেই এক কথা?'

—'ই দুঃখুটা মলেও যাবে না ভাই!'

—'আবার কিনব। ভগবান মুখ তুলে তাকাক্।'

চুপ করে যায় বিশালদেহী মানুষটা। আবার ভেসে ওঠে কিছু প্রতিচ্ছবি—সামিয়ানার তলায় হ্যাসাগের শনশন শব্দ ভাসে, চারপাশে মুগ্ধ শ্রোতা, চারু মাস্টারের বেহালা বাজে করুণ সুরে। আর সাজঘর থেকে ঝলমল লাল পোশাকে হিন্তালের লাঠি নেড়ে এগিয়ে আসে চাঁদ সদাগর। কী তার রূপ! মুহূর্তে আসর চুপ। কেঁদেওঠা বাচ্চার মুখে মায়ের থাবা পড়ে। জয় শম্ভো! জয় শম্ভো! যেন আকাশে মেঘ ডাকে।—...'সাজের বাকসোটা!'

—'আবার? তুমার মাথাটা খারাপ হয়ে যাবে, মইলোবাস। সাবোধান।'

আবার চুপ। ক্রমশ মাঠ ধাপে ধাপে নেমে গেছে নাবাল অঞ্চলের দিকে। দেখতে দেখতে সূর্যও ডুবেছে। ধূসর আলোয় দূরের গ্রাম কালো হয়ে আসছে। ধানপচার গন্ধ, পলির গন্ধ, মরা জানোয়ারের হাড়গোড়ের গন্ধ। নাক ঢেকে দলটা চুপচাপ চলতে থাকে। সবার পিছনে মইলোবাস।

এবং একটু পরেই—'আঃ আহা হা হা!'

মতি একবার ঘোরে। কিন্তু কিছু বলে না। কী বলবে? হাহাকার তো তার বুকেও কম জমে নেই। ডাঙাদেশে নবান্নের মরশুম এবার তাদের ফাঁকা যাবে। অন্য দল এসে গাইবে। তারা হবে শ্রোতা। গভীর ঈর্ষায় চনমন করবে। ফটিকচাঁদ কুমোর তার মতো করুক না, কে করে! তার মতো হনুমান সাজুক না, কে সাজে!

আবার পিছনে ডুকরে ওঠা চাপা আক্ষেপ—আঃ হা হা হা!

মতি চৌকিদার অফিসারকে বলছিল—এখন শরীলে ব্যামো। ভেতরটা ঝাঁঝরা। ঝাঁঝরাই বটে। সাত বছর ধরে মইলোবাস চাঁদ সদাগরের পার্ট

চড়ে আসছে। এ সাত বছর সে মালামো লড়ে নি। সাত বছর আগের ...জাষ্ঠে তার শেষ লড়াই হয়েছে গঙ্গার পূর্বপারের প্রখ্যাত কুস্তিগীর মোহিনীবাবুর ...সঙ্গে। কী সব মারাত্মক প্যাঁচ জানত মোহিনীবাবু! এমন ভাবে ফেলে ...ছিল যে তারপর বাড়ি ফিরে থুথুর সঙ্গে রক্ত ওঠে। প্রথমটা গ্রাহ্য করে নি। ...পরে বুকে ব্যথা বাড়লে ডাক্তার দেখিয়েছিল। বুকের ছবি তুলতে হয়েছিল। ...পাঁজরের একটা কাঠি ভেঙে গেছে। সেই ভাঙা পাঁজর নিয়ে সে সাত বছর ...কাটাচ্ছে। কলজেতেও একটু দাগ পড়েছে। এখনও গতর খাটাতে মাঝে ...মাঝে টাটানি টের পায়। বোঝা তুলতে কষ্ট হয়। জোরে চেঁচাতে গিয়েও ...দম আটকায়।

অথচ যেদনি থেকে চাঁদ সদাগরের সাজ গায়ে চড়াল, যেন ভাঙা খাঁচার ...শরীলের মধ্যে এসে দাঁড়াল এক বিশাল শক্তিধর পুরুষ। যতক্ষণ সাজ গায়ে ...থাকে, ততক্ষণ সে সেই বীর্যবান দুর্ধর্ষ পুরুষ। মেঘের মতো হাঁকলেও দম ...আটকায় না। আসরে দেবী মনসার সামনে ভাঙা পাঁজরে হাতের থাপ্পড় ...মেরে সগর্জনে বলে—'সাতটা পুত্রসন্তান আমার, সাতখানি বক্ষের পাঁজর। ...ভাঙবি তো ভাঙ রে বুড়ি চ্যাংমুড়ি, তবু কভু ভ্রূক্ষেপ নাই!' সামনের মাটিতে ...জোরে লাথি মারে সে। টেরই পায় না কলজেটা চড়াৎ করে ওঠে কি না। কিন্তু আসরের পর দিনে মাঠের জমিতে হাল বাইবার সময় হঠাৎ খামচানি ব্যথা ...বুকের মধ্যিখানে—হাত চেপে সে বলদ ডাকায়—ইরর্‌র্‌র্‌ হেট্‌ হেট্‌

সেই ব্যথাটা এতক্ষণে অন্ধকার মাঠে জেগে উঠেছে। মইলোবাস ককিয়ে ...উঠছে পাঁজরে হাত চেপে—'আঃ হা হা হা!'

মতি ভাবছে সাজের বাকসোর দুঃখে ককাচ্ছে লোকটা, বাহাসতুল্লাও তাই ...ভাবছে। আকাশ আলি, নারাণবাবু—আর সবাই। জলকাদায় পা ফেলার ...শব্দ উঠছে। চারদিকে জোনাকি উড়ছে। দূরে শেয়াল ডেকে উঠল। খালে ...এক কোমর জল। একে-একে পার হয়ে যায় সবাই। ওপারে বাঁধ। জায়গায়-...জায়গায় ধসে গেছে। আর মোটে এক মাইল দূরে গাঁ। বাঁধে উঠে মতি চৌকিদার বলে—'এস, বিড়ি খেয়ে লিই।'

দেশলাই জ্বালে কেউ কেউ। বিড়ি ধরায়। বৈয়াল বলে—'চাঁদ সদাগর! বিড়ি লাও হে!'

মতিও ডাকে—'কই হে লখাইয়ের বাপ! ধুঁয়োমুখ করো!'

আকাশভরা নক্ষত্রপুঞ্জ এই হেমন্তের রাতে। বাঁধের ওপর শুকনো মাটিতে

বসে পড়েছে সবাই। নক্ষত্র দেখতে দেখতে বিড়ি টানছে। পাশে র
রেখেছে। কাপড় উরুর ওপর গোজা—যা জলকাদা! নিচে ঘন পাট
বন্যায় গলা অব্দি ডুবেছিল। অন্ধকার পাটবনের ওপর জোনাকির আ
আকাশ আলি দেখতে দেখতে ডাকে—'পিতাঠাকুর, উই ত্যাখো তুমার সা
আবার মুখ তুলে আকাশ দেখে আকাশ আলি বা লখিন্দর হাসতে হা
ডাকে—'পিতাঠাকুর হে! পরবে নাকি উই সাজ? নক্সাখানা দেখ!'

রসিক মতি রসিকতায় সাড়া দিয়ে বলে—'তুমার পিতাঠাকুরের নাল
পছন্দ। সেবারে খাগড়ার বাজারে সাহাবাবুর সাজের দোকানে আমার প
হল একখানা জামা। ওইরকম কালোর ওপরে সোনালি কাজকরা। বুই
খাঁটি বেলবেট। আমি বুললাম—দাম? তো পঞ্চাশ টাকা। তো বুল
মইলোবাস, টাকা থাকলে ই সাজটাই লিতাম। তুমাকে যা মানাত।
ঘাড় নেড়ে বুললে—আমার নাল রং পছন্দ!'

বৈয়াল বলে—'পালোয়ান। লাল রঙেরই ভক্ত!'

আকাশ ফের ডাকে—'কই বাপ পিতাঠাকুর, নথাই এত ডাকছে, কথা ব
না ক্যানে?'

তারপর খোঁজ পড়ে যায়। সবাই ডাকাডাকি করে। দলে তো (
কখন পিছিয়ে পড়েছে দেখ দিকি! মতি চেঁচিয়ে ডাকে—'মইলোবাস (
হেই—ই—ই…'

অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে জলকাদার পৃথিবীতে ডাকটা কেঁপে কেঁপে মি
যায়। ওই পরিব্যাপ্ত অন্ধকারে কোথায় একা থেকে গেল এক অভিম
ক্ষুব্ধ সাজহীন বিশাল মানুষ?

ফটিক কুম্ভকার, নথাই আর বৈয়াল খালের জলে নামে। পাড়ে
তিনজনে একগলায় ডাকে—'হেই-ই-ই-ই…'

আলের পথে পা বাড়াতেই ঠোক্কর খেয়ে মতি পড়ে যায়। চেঁচিয়ে ও
—'মইলোবাস! ও মইলোবাস! পড়ে আছ ক্যানে ভাই? কী হল তুমার
কী হয়েছে?'

নথাই দেশলাই জ্বালে। মুখের ওপর। ঠোঁটের দুপাশে রক্ত নি
হাঁফাচ্ছে বিশাল সেই পুরুষ—নাকি বিশাল সেই পুরুষের খড়মাটির টাট
সাজহীন। অনেক কষ্টে বলে—'পা পিছলে পড়েছিলাম!…আমি বাঁচব
হে…বাঁচব না!'

মতি কেঁদে কেটে বলে—'রেতের বেলা জলকাদার রাস্তায় অমন করে হাঁটে ভাই? বুয়েছি, বুয়েছি! উই কথাটাই তুমাকে খেলে হে! উই ভাবনাটাই তুমার বিনেশ কল্লে! আঃ হা হা!

তিনজনে ধরাধরি করে বয়ে নিয়ে চলে চাঁদ সদাগরকে। পাঁজরভাঙা, কলজেয় দাগধরা শরীর থেকে গভীরতর দুঃখের মতো রক্ত গড়ায় কষ বেয়ে। এবার প্রকৃতি নিজের হাতে তাকে শেষবার লাল পোশাক পরিয়ে দিচ্ছেন। তবু সে বিড়বিড় করে বার বার—'সাজের বাকসোটা ভেসে গেল হে! সাজের বাকসোটা…'

নাগিনী ছন্দ

খবর ছিল, ওঁর বেহালা শুনে ফিংফোটা জ্যোৎস্নায় সাপ এসে ফণা তুলে নাচে। তাই, আমি শশীর সঙ্গে তারকবাবুকে দেখতে গেলুম।

গাঁয়ের পাশে রেলরাস্তা থাকলেও সাপ ছিল অসংখ্য। সভ্যতার বিরুদ্ধে ব্যর্থ লড়াই করার সাক্ষী তাদের থ্যাঁতলানো শরীর প্রায়ই দেখতে পেতুম রেলের দুপাশে পড়ে আছে। আর এই শশীর এক ভাই সাপের কামড়ে মারা পড়েছিল ছেলেবেলায়। শশী বলত, তার ভাইটি বাঁচলে আমার বন্ধু হত সেই, শশী নয়। কারণ শশীর বয়স আমার চেয়ে বেশ কিছুটা বেশী।

এই কথা বলাতে শশীর আর আমার মধ্যে একটা ফাঁক সৃষ্টি হয়ে গেল, শশী তা টের পায়নি। আমি পেতুম। মাঝে মাঝে শশীর দিকে তাকিয়ে ভাবতুম, এ শশীটা আমার মনের মতো নয়। তার সেই মরা ভাইটির জন্যে অদ্ভুত একটা বিচ্ছেদের দুঃখ অনুভব করতুম। আর শশীর সঙ্গ ধরার দরুন আমিও আমার মনের মতো নই মনে হত। কয়েকটা বছর ফেলে পিছনে হাঁটতে আমার কী যে কষ্ট হত! তা না হলে তো শশীর নাগাল পাওয়া যাচ্ছিল না।

তাই আমার ভয় হত, ঠিক ঠিক সময়ের আগে যে আমি বুড়িয়ে যাব এবং মৃত্যু হবে ত্বরান্বিত—তা ওই শশীর কারণে। শশীর ভাই বাঁচলে এটা হত না। সাপ, শয়তান সাপ! যে তোদের ঠোঁটে রেখেছে মৃত্যুর পরোয়ানা, তাকে আমি ক্ষমা করব না।

রেলরাস্তার একপারের গাঁয়ে পাটচাষ তদারককারী সরকারি লোক আমার

বাবার সঙ্গে আমি থাকি আর শশীরা থাকে। অন্য পারের গাঁয়ে যার বেহালা শুনে সাপ নাচে, সেই তারকবাবু থাকেন। বাবার কাছে চলে আসার কয়েকদিন পরই ওই খবর শুনে শশীর সঙ্গে তারকবাবুকে দেখতে গেলুম।

একটা পুরানো ভাঙাচোরা বাড়িতে তারকবাবু থাকেন। চারদিকে তার অগোছাল ছোটবড় উঁচু নিচু গাছপালা। নানা ধরনের ঘাস। সরু পায়েচলা পথটার ওপর ঘাসের লকলকে আঙুল ঝুঁকে আছে। আর গাছপালার চেহারায় জংলী রাক্ষুসে ঝাঁকড়মাকড় ভাব। পাঁচিল ছুঁয়ে চারপাশের লোভের ও ষড়যন্ত্রের কয়েকশো আঙুল কাঁপছে। হাওয়া দিচ্ছে উস্কানির ভঙ্গিতে। ফিসফিস ষড়যন্ত্র যাচ্ছে শোনা।

এ কোথায় এলুম শশী!...

অস্বস্তিতে বলে উঠলুম। শশী বলল, কেন? বেশ নিরিবিলি জায়গা। আরটিস্টের পক্ষে উপযুক্ত। তাই না? তবে দেখে পা বাড়াস। শালা, সবখানে শুধু সাপের রাজত্ব।

আরও একটু ভয় বাড়ল। বিকেল তরতর বয়ে চলে যাচ্ছে। আবছায়া ঘন হচ্ছে। এরই মধ্যে পোকামাকড় চাপা ডাকতে লেগেছে। পাখিদের ডাক থেমে যাবার তর সইছে না। এরই মধ্যে রাত তার দুই একটা জিনিস আগাম পাঠিয়ে কিউতে জায়গা দখল করতে চাইছে। চারপাশে একটা অধৈর্যের ভাব চনমন করতে দেখেছিলুম। উত্তেজনা পেয়ে বসছিল আমাকে।

জীবনে সেই প্রথম টের পেলুম প্রকৃতি কী জিনিস। এতটুকু জায়গা খালি পেলেই তার আগ্রাসী হাত এসে দখল করে ফেলে। আমি পা তুললেই সেইখানটা তার নাগালে চলে যেতে দেরি সয় না। তার যত সব কাচ্চাবাচ্চা এসে ঘরকন্না-খেলাধুলা করতে থাকে। ঘাস পোকামাকড় আর সাপেরা হুড়মুড় করে এসে পড়ে। আমি এতটুকু অসতর্ক হলেই তার দ্বারা আক্রান্ত হই। তাই ভাবলুম, এই আরটিস্ট ভদ্রলোকের কী হবে! চারদিক থেকে ওঁকে ঘিরে ফেলল যে! উনি কি সব জেনেও চুপ করে থাকেন—নাকি জানেনই না?

সেই সময় হঠাৎ টের পেলুম যে, সারাক্ষণ বেহালা বেজেছে, আমার কানেই আসেনি। শশী আমার দিকে চোখ টিপল। আমিও ইসারায় জানালুম, হুঁ, শুনছি।

শশী বলল ফিসফিসিয়ে, একটা কথা। এখানে এসেছিলুম জানলে বাবা আমাকে বকবেন। খবর্দার, কাকেও বলবিনে।

তারপর সে দরজায় টোকা দিল। আমি তারকবাবুর নেপথ্য বেহালা শুনছি। মাথায় অদ্ভুত সব ভাব আসছে। উনি কি খুব বিপন্ন? ওই সুরে বিপন্নের আর্তনাদ আছে কি? পরেই মনে হচ্ছে, নাকি এ আনন্দের চাপল্য—নাকি বন্দীর বন্দনা? আবার মনে হল, নাকি শুধু অভ্যাস, হাতেরই!

শশী আবার বলল, তুই কিন্তু হাঁ করে তাকিয়ে থাকবিনে। একটু স্মার্ট হোস।

একটু হাসলুম শুধু।

উনি নিজে থেকে কথা না বললে মুখ খুলবিনে।

ফের হাসলুম শুধু।

তখন শশী বলল, ভ্যাবলা কোথাকার।

আমার অনেক লোভ তখন। আজ রাতে জ্যোৎস্না উঠবে। তারকবাবুর বেহালা শুনে সাপকে এসে নাচতে দেখব। সেই সাপ—যা শশীর ভাইকে মেরে ফেলেছিল। সেই সাপ-যে আমার শত্রু। আমি তখন কি করব? মনে হল, এসবের বিরুদ্ধে লড়াই করার বয়স আমার এখনও হয়নি। ষোল বছর বয়সে এসব কিছু করতে যাওয়া ঝুঁকি আছে। অবশ্য, শশী পারলেও পারে। কিন্তু সে কিছু করবে না, কারণ, সে বোধ তার নেই-ই। আমার আছে। সারা গায়ে চোখ ফোটার মতো ওই বোধ ষোল বছর বয়সটাকে কাঁসর ঘণ্টার মতো বাজাচ্ছিল।

যে দরজা খুলল, তাকে দেখে শশীর বারণ ভুলে হাঁ করে তাকিয়ে দেখছিলুম। তারকবাবুর বউয়ের কথা শশী আমাকে বলেছিল। আমার ষোল বছর বয়সটা এমন যে প্রেম-ভালোবাসা কী বোঝে না, শুধু যৌনতার হাত বাড়িয়ে মেয়েদের ছুঁতে চায়। তারকবাবুর বউকে দেখে সে চুপিচুপি যৌনতার আঙুল তুলতে গেল। পলকে মনে হল, কী যেন পাব—কী যেন পেতে যাচ্ছি—শশী নিছক বাজনা শুনতে আর আমিও সাপের নাচ দেখতে আসিনি জ্যোৎস্না রাতে।

তারকবাবুর বউ একটু হেসে দরজার পাশে দাঁড়াল। শশী আমার হাতটা ধরে টানল। দুজনে ভিতরে গেলুম। পিছনে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। পরের ঘরটায় ঢুকে দেখি, গদিওয়ালা সেকেলে বিশাল খাটের ওপর একজন কালো-কুচ্ছিত বেঁটে গুঁফো লোক গেঞ্জি গায়ে আর লুঙ্গি পরে বসে আছে। তার কাঁধে বেহালা টানটান, ছড়টা আনাগোনা করছে. চিবুক বেহালায় বেঁধা এবং সে চোখ তুলে আমাদের দেখল মাত্র। আমরা দুটো মোড়ায় বসে পড়লুম।

এই তারকবাবু! ইমেজ ছিল, ভেঙে গেল। তারকবাবুর বউ বারান্দার দিকে চলে গেল। আমি ভিতরটা খুঁটিয়ে দেখছিলুম। দেয়াল টুটাফাটা, ময়লা আলনায় কিছু কাপড়-চোপড় আছে। তাকভর্তি শিশি বোতল। এককোণে টেবিল আয়না। খাটের তলায় কিছু বাক্সপেঁটরা। দেয়ালে, দেব-দেবীর ক্যালেণ্ডার আর বাঁধানো কিছু ফটো আছে। আরেকটা তাকে পেতলের ছোট্ট খাটে দেবতা, গঙ্গাজলের পাত্র, ধূপদানি, এইসব। একপাশে একটা কালো হারমোনিয়ামের বাকসো আর ডুগিতবলা রয়েছে। তার পাশে একজোড়া পেতলের কিংবা কাঁসার তৈরী ঞ্জ—চামটিবাঁধা বকলেসওয়ালা। কে নাচে?

বাজনার স্বরে মন লাগছিল না। তখন কতসব বাজনা তো শুনতে পাই রেকর্ডে, রেডিয়োতে। কত আশ্চর্য সব স্বর। তারকবাবুর বাজনায় তেমন চমক ছিলই না। তেমন মিষ্টতাও ছিল না।

একটু পরেই তারকবাবুর বউ হারিকেন জ্বেলে টুলে রেখে গেল। জানলার বাইরে সন্ধ্যা এসে গেছে। জানালার রডে লতাপাতা উঁকি দিতে দেখলুম। আর কয়েক ইঞ্চি এগোলে তারা বিছানা ছুঁতে পারে। আবার তারকবাবুর বউ এল ট্রে নিয়ে। তিন কাপ চা, একটা প্লেটে চানাচুর। শশী আমার দিকে চোখ টিপে হাসল। আমিও।

তাই দেখে এতক্ষণে বাজনা থামাল তারকবাবু। বেহালাটা বিছানায় রেখে একটু হেসে বলল, আয় শশী। অনেকদিন আসিস নি।

শশী বলল, শরীর ভালো ছিল না তারকদা, এ মণ্টু—এখানকার এগ্রিকালচার অফিসের এক ভদ্রলোকের ছেলে। তোমার বাজনা শুনতে এল।

তারকবাবু বলল, তাই বুঝি? চা খাও, ভাই।

লোকটির অমায়িকতা মুগ্ধ করল। চেহারায় উল্টো। শশী বলল, স্টেশন-বাবুর টিউশনিটা ছেড়ে দিলেন কেন?

তারকবাবু নাকের ডগা কুঁচকে জবাব দিল, পোষাল না ভাই! সাতমাসে হাত দিয়ে সরগম উঠল না। নিজেরও তো একটা চক্ষুলজ্জা আছে। তাছাড়া—মেয়েটা···

শশী বলে দিল, হ্যাঁ—মেয়েটার আজকাল ভীষণ বদনাম শুনছি।

তারকবাবু চোখ নাচাল।···হুঁ, খালাসিটা—মানে অলক যদ্দিন না ট্রান্সফার হচ্ছে, তদ্দিন ওর কিস্যু হবে না। ঠারেঠোরে স্টেশনবাবুকে বলতে গিয়েই

তো তেড়ে মারতে এল আমাকে। ওরে শালা! আমি তারক ব্রহ্মচারী—বেহালা বাজিয়েই যেন খাই!

শশী বলল, অলককে আমরা ঠুকব ভাবছি, তারকদা।

ঠুকবে? ···তারকবাবু চাপা গলায় আর ভুরু কুঁচকে বলে উঠল।···তাই ঠোকো শালাকে। শালা বেতামিজ কাঁহাকে। দাও শালার বাপের নাম ভুলিয়ে। ভদ্রলোকের ঘরের মেয়ের···

তারকবাবুর বউ তাকিয়ে তাকিয়ে ওদের কথা শুনছিল। এবার ফোঁস করে বলল, আর ভদ্রলোকের ঘরের মেয়েটি বুঝি সতীসাবিত্রী? ঠুকতে হলে ওকেও ঠোকো—তবে না!

শশী হাসতে লাগল।··· হুঁ বউদি ঠিকই বলছে। কিন্তু মেয়েদের গায়ে হাত দেওয়া যায় না যে!

তারকবাবু ঝুঁকে হিংস্রমুখে বলল, চুল কেটে নাও না মেয়েটার।

শশী বলল, চুল কাটব?

হুঁ—উ। একটা কাঁচি নিয়ে গিয়ে—বুঝেছ? কচাকচ্ কচাকচ্ দাও চুল কেটে।

তারকবাবুর বউ ভেংচি কেটে বলল, হুঁ—গুরুমশায়ের পরামর্শ নাও!··· বলে চলে গেল বারান্দার দিকে।

তারকবাবুর ইমেজটা এবার ফের বদলেছে আমার সামনে। কিন্তু মজা পাচ্ছিলুম। এই শশী, তারকবাবু, তারকবাবুর বউ একটা ব্যাপার নিয়ে বেশ কথা বলবার পেয়েছে। আমার অবশ্য কিছু নেই। আমি বহিরাগত। আমার কিছু বলতে ইচ্ছে করল।···আপনি চমৎকার বেহালা বাজান তো! তারকবাবুকে বললুম।···এত ভাল লাগছিল! এমন কতদিনই শুনিনি। অপূর্ব!

তারকবাবু চেহারা পাল্টে মৃদু হাসল।···শশী, তবলা নে। আয়।

শশী উঠে তবলাবাঁয়া নিয়ে বিছানায় গিয়ে বসল। আমি অবাক হয়ে বললুম, তুই তবলা বাজাতে পারিস শশী? বলিসনি তো!

শশী জবাব না দিয়ে তবলায় চাপা বোল তুলতে থাকল। তারকবাবু ছড়ে মাঞ্জা দিয়ে টানতে থাকল তারের উপর। তখন আমি বললুম, নাচে কে?

কেউ জবাব দিল না আমার কথার। ওরা জোর ঝাঁকজমকে বাজনা জুড়েছিল। সে বাজনা আর থামবার লক্ষণ নেই। দরজার বাইরে খোলা

বারান্দা দেখা যাচ্ছে। সেখানে জ্যোৎস্না পড়েছে। উঠোনের ওপাশে কালো গাছপালা একটু হাওয়া দুলতেই জ্যোৎস্না গড়াচ্ছে শব্দহীন। এই তেলতেলে জ্যোৎস্নায় চাপা চাকচিক্যে সারাক্ষণ সাপেরা—অজস্র কিছু চকচকে কিছু আলো কিছু আঁধারময় সাপেরা ঝাঁপ দিয়ে দিয়ে বুকে হেঁটে বেড়াচ্ছে মনে হল। হাজার হাজার সাপ। গায়ে গায়ে জড়াজড়ি, চলাফেরা চারপাশে। কীভাবে বাড়ি ফিরব ভেবে পেলুম না। একবার ঘরের ভিতর হারিকেনের আলো দেখছিলুম—আবার বাইরে তাকাচ্ছিলুম। বাইরে জ্যোৎস্নাময় পৃথিবী—গাছপালা ইত্যাদির ওপর পিছল জ্যোৎস্না, এবং তাদের ওপর হাওয়া এসে পড়ায় অবিকল হাজার হাজার সাপকেই দেখা যাচ্ছিল। তাহলে কি তারকবাবুর বেহালার সঙ্গে এইসব অলৌকিক সাপ জুড়ে দিয়েই খবর তৈরি হয়?

একসময় একটু ঝুঁকে দেখি, বারান্দার ধারে রোয়াকে বসে আছে তারকবাবুর বউ। চুপচাপ। একটা উরুর ওপর, অন্যটার কনুই উঁচু রোয়াকে ভর করে করতল গালে রেখেছে। কী ভাবছে—কাই বা করছে মহিলা? খুব রহস্যময় মনে হল।

কিছুক্ষণ পর এদের বাজনা থামল। তখন ফের আমি জও তুটো দেখিয়ে বললুম, কার?

ওগো, একবার এদিকে এসো। শোনো। তারকবাবু ডাকল।

তারকবাবুর বউ এল না। শশী বলল, থাক্। সেই গৎটা বাজান। রে সা নি রে সা···

তারকবাবু তবু ডাকতে লাগল বউকে।···এদিকে এস গো! ও সরমা! শুনছ? আহা, এসই না!

ওর নাম সরমা? সরমা এসে বলল, কী?

আমাদের অফিসারবাবুর ছেলে তোমার নাচ দেখবে বলছে!

আমি উৎসাহিত হয়ে বললুম, আপনি নাচেন বউদি? বাঃ! একবার নাচ দেখান না!

তারকবাবু বলল, ওর সামনে সংকোচ কিসের? ও আমদের ছেলের মতো। নাও—এসো।

সরমা ঠোঁট কামড়ে কী যেন ভাবছিল।

তারকবাবুর মুখটা কেমন হয়ে এল। বলল, আঃ, কী ঢং করছ? জও নাও না!

সরমা এবার কেমন হেসে আমার দিকে তাকাল।···আজ আমার শরীরটা ভালো নয় ভাই। কাল এসো, কেমন? কাল তোমাকে নাচ দেখাব।

তারকবাবু নিষ্ঠুর মুখে বলে উঠল, আবার ও কাল তোমার নাচ দেখতে আসবে। এখন এমন চমৎকার মুডটা এসে গেছে আমার! ঘুঙুর বাঁধো!

শশী তবলায় লহরা বাজিয়ে বলল, হ্যাঁ বউদি। আমারও। দারুণ মুড। বোল শুনে টের পাচ্ছ না?

তবলা বাজতে থাকল। বেহালা বাজতে লাগল। সরমা কিন্তু চুপচাপ ঠোঁট কামড়ে মেঝের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

নিজেকে অপরাধী মনে হল আমার। বললুম, থাক। কালই হবে। আজ আপনার শরীর খারাপ যখন।···

তখন তারকবাবু গর্জে উঠল।···কী, হচ্ছে কী? পেটের ছেলের সামনে ছেনালিপনা হচ্ছে! ঘুঙুর বাঁধো বলছি।

হ্যাঁ—শশী বলেছিল, আরটিস্ট মানুষ। মুড বলে একটা ব্যাপার আছে। সরমা ঝুঁকে পায়ে ঘুঙুর বাঁধতে লাগল।

বেহালা শুনলুম। তবলা শুনলুম। এবং ঘুঙুরের ঝুমঝুম শব্দের সঙ্গে নাচও দেখলুম।

বেদেরা ডালা খুলে লেজ ধরে সাপ টানে। সাপ বেরিয়ে এসে ফণা দোলায়। বেদে লাউখোলের নাগিনবাঁশী বাজায়।

খবর ছিল, তারকবাবুর বেহালা শুনে জ্যোৎস্নারাতে সাপ নাচে। তাই শুনে দেখতে গিয়েছিলুম। দেখলুম। ভালোমন্দ কী বলব? বেদেরা তো নাচায়। দেখেছি। কিছু মনে হয় না।

ফেরার পথে শশী বলল, না নাচলে তারকদা কী করত জানিস? মেরে দম বের করে ফেলত। বউদি ওর ছাত্রী ছিল একসময়। তখন থেকেই মার খাওয়ার অভ্যেস আছে।···তারপর শশী হাসতে হাসতে বলেছিল, মাইরি, শালা তারকদাটা কী ঢ্যামনা জানিস? মেয়েটাকে বাজনা শেখাতে গিয়ে বের এনেছিল।···

পাশের রেলরাস্তায় সভ্যতার বিরুদ্ধে ব্যর্থ লড়াই করা সাপের থ্যাঁতলানো দুভাগ শরীর পড়ে থাকতে দেখতুম।

একদিন সরমার ন্যাংটো শরীরটাও রেলপাটির দুপাশে দুভাগে পড়ে থাকতে দেখলুম। তার লড়াইটা কার বিরুদ্ধে, কেমন করে হল, এসব বলার জন্য গল্প লিখতে আমি বসিনি। আসলে আমার কোন বক্তব্যই নেই। এই নিতান্ত একটা অভিজ্ঞতার ধারাবাহিক রিপোর্ট—যার শেষ কয়েক লাইন হচ্ছে :

সাপুড়েরা নাগিনবাঁশি বাজায়, আমরা সাপকে নাচতে দেখি। সাপবিজ্ঞানীদের মতে সাপ কিন্তু সত্যি সত্যি নাচে না। সে ক্রুদ্ধ হয়ে ফণা তাক করতে থাকে। ওই তার ছোবল মারার ভঙ্গী। বিষদাঁত ভাঙা অসহায় সাপের ওই আক্রমণোদ্যত ভঙ্গী দেখে আমরা বোকার মতো ভাবি সাপটা নাচছে। ঠোঁট থেকে মৃত্যুর পরোয়ানাটা কেড়ে নিলে সাপ আর বাতাসে দুলন্ত লতায় তফাত কী ?

জুলেখা

সে আমার হাফপেণ্টুলপরা সময়ের কথা, যখন প্রবীণদের মনে হত একেকটি দুর্দান্ত দৈত্য এবং দিনের নির্দোষ বৃক্ষলতা সূর্যাস্তের পর নির্দয় রহস্যে ভরে যেত। চারপাশে ঘটত অনেক সন্দেহজনক ঘটনা। ভয় করতাম অনেক কিছুকেই। আর সেই ভয় থেকে আমাদের রক্ষা করত যে, তার নাম ছিল কালু। কালু ছিল একটা কালোরঙের দিশি কুকুর। তার ছোট্ট শরীরটা ছিল যেন একটা সাইরেনযন্ত্র। সে আমাদের বাড়ি আসার পর থেকে দরমার মুর্গিচুরি বন্ধ হয়েছিল। তাই প্রথমদিকে তাকে ছিঘেন্না করা হলেও পরে সে আদরযত্ন পেতে শুরু করেছিল।

বাড়ির আয়তনের তুলনায় আমাদের সংসারটা ছিল ছোটই। বাবা মা, আমি আর জুলেখা নামে একটি মেয়ে, এই চারজন মোটে মানুষ। একটা গাইগরু, তার বাছুর আর একদঙ্গল মুর্গি—যাদের মাথায় ছড়ি ঘোরানোর জন্য ছিল এক তাগড়াই মোরগ, জুলেখা যার নাম দিয়েছিল বাদশা।

জুলেখার ডাকনাম ছিল জুলি। আমার সেই হাফপেণ্টুলের বয়সে জুলি শাড়ি ধরেছিল। আমার জন্মের পাঁচবছর আগে জুলির বয়স ছিল মোটে দুই। প্রতি শীতে উত্তরের পদ্মা-এলাকা থেকে যে গরিব মানুষেরা দলবেঁধে রাঢ় এলাকায় ভাত খাওয়ার লোভে ছুটে আসত, তারা নিজেদের বলত 'মুসাফির'

এবং অন্নের জন্য সেই অভিযানকে তারা বলত 'সফর'। সেবার মাঘমাসের এক বৃষ্টির রাতে দলছাড়া হয়ে এক মুসাফির মা ও তার দুবছরের মেয়ে আমাদের দলিজঘরের বারান্দায় আশ্রয় নেয়। ভেদবমি হয়ে মা শেষরাতে মারা গেল, আমার দয়ালু দাদু তার সদ্গতি করেন। বাচ্চা মেয়েটি আমাদের বাড়িতেই থেকে যায়। অতটুকু মেয়ের চুলের বহর লক্ষ্য করে দাদু তার নাম রাখেন 'জুলেখা'—কেশবতী।

কী অবিশ্বাস্য বিশাল ছিল তার চুল! সেই চুলের বিশালতা আমাকে ভীষণ টানত। জুলির চুল ধরে আমি ঝোলাঝুলি করতাম। চুলের ভেতর লুকিয়ে পড়ে মাকে দিতাম কুকি। খিড়কির ছোট্ট পুকুরে সেই চুল ধরেই আমি সাঁতার কাটা শিখেছিলাম। আসলে জুলি হয়ে উঠেছিল আমার ক্রীড়াভূমি। সে ছিল আমার নির্ভরযোগ্য সিঁড়ি। নিজের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে তার চেয়ে ভাল বুড়ি কল্পনা করা যায় না। আর এমনি করে দিনে দিনে তার শরীরের অনেকটা আমার চেনা হয়েছিল। আসলে জুলি ছিল আমার বহুবার পড়া ভূতের গল্পের বই, যার গল্পটা পুরনো হয়ে গেলেও ভূতটা রহস্য দিয়ে বার বার কাছে টানে।

জুলি অনেক গল্প জানত। তার কাছেই রাতে আমাকে শুতে দেওয়া হত। জুলি চাপা গলায় গল্প শোনাত। তবে শর্ত ছিল, আমাকে ক্রমাগত হুঁ দিয়ে যেতে হবে। হুঁ বন্ধ হলেই সে ডাকত, 'অঞ্জু! ঘুমোলে?' তারপর খোঁচা-খুঁচি করে জাগানোর চেষ্টা ব্যর্থ হলে বলত, 'না শুনলে আমার কী?' গল্পটা ভাল না লাগলে আমার এই ছিল চালাকি। কিন্তু কোনো-কোনো রাতে টের পেতাম তার গল্প বলার মুডই নেই। খাপছাড়া করে একটুখানি শুনিয়েই আমাকে কাছে টেনে পিঠে হাত রেখে শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলত, 'ঘুমোও। ভোরে ইস্কুলে যেতে পারবে না। তখন ভাবিজি মুখ করবেন।'

সে মাকে বলত ভাবিজি, বাবাকে বলত ভাইজান। একরাতে সে আমাকে খুব কাছে টেনে নিলে তার বুকের অদ্ভুত কোমলতা আমাকে চমকে দিয়েছিল। আমি সেই কোমলতা হাত বাড়িয়ে খোঁজার চেষ্টা করতেই সে পিঠে থাপ্পড় মেরে ফিসফিসিয়ে উঠেছিল; 'ছিঃ! আমি তোমার ফুফু (পিসি) হই না?'

আমি তো ভীষণ—ভীষণ অবাক। নাস্তিক বাবার ঔদাসীন্যে আমার খৎনা দিতে দেরি হয়েছিল। খৎনা দেওয়ার পর বালিশে হেলান দিয়ে আমাকে বসিয়ে রাখা হলে জুলি আমার মুখে সেদ্ধ ডিম গুঁজে দিচ্ছিল আর সান্ত্বনা

দিচ্ছিল, কেঁদো না! কালই ঘা শুকিয়ে যাবে।' সে আমাকে দুহাতে তুলে নিয়ে খিড়কির ঘাটে জলে নামিয়ে হাতের তালুতে জল ঠেলে-ঠেলে ক্ষতস্থানে ঢেউয়ের ঝাপটানি দিত। দ্রুত ঘা সেরে যাওয়ার জন্য এটাই ছিল প্রচলিত পদ্ধতি। মাঝে মাঝে আঁচল টেনে কামড়ে ধরে সে লজ্জারও ভান করত। সে ঘাটের কাঠে বসে থাকত এবং কিছুই দেখছে না এমন ভঙ্গিতে হাসি চাপত। কখনও সে সাবধানে ঘায়ের অবস্থা পরখ করে বলত, 'আর দুটো দিন।'

ঘা শুকিয়ে সব স্বাভাবিক হয়ে গেলেও সে বলত, 'লাগছে না তো?' ব্যথা নেই শুনে সে ফোঁস করে যে নিঃশ্বাসটি ফেলেছিল, এতকাল পরেও তা কানে লেগে আছে। তার কাছে আমার লজ্জার কিছু ছিল না।

এই জুলি বাড়ির যে-সব কাজ করত, তা বাঁদিরাই করে থাকে। কিন্তু তাকে বাড়ির মেয়ের মতোই দেখা হত। তার বিয়ের বয়স বাড়ছিল দেখে বাবা ভেতর-ভেতর পাত্র খুঁজতেন। কোনো পাত্রই পছন্দ হত না মায়ের। মা ছিলেন খুব খুঁতখুঁতে মেয়ে। বলতেন, 'যে ঘরেই ওর জন্ম হোক, খান্দানি বাড়িতে মানুষ হয়েছে। মুনিশখাটা ঘরে গিয়ে থাকতে পারবে? কষ্ট হবে না?'

বাবা রাগ করে বলতেন, 'কোন খান্দানি ঘরের ছেলে ওকে বিয়ে করবে? লেখাপড়া জানে?'

মা দ্বিগুণ রেগে গিয়ে বলতেন, 'শেখাওনি কেন লেখাপড়া? কর্তব্য ছিল না তোমার?'

বাবা দমে গিয়ে বলতেন, 'তুমি শেখালেই পারতে। অল্পস্বল্প একটুখানি হলেও অন্তত—'

মা একই সুরে বলতেন, 'আমি তোমার সংসার সামলাবো, না কাউকে ক খ —ভারি আমার বলেছ!'

তবে দুজনেই দেখতাম ভীষণ পস্তাতে শুরু করেছিলেন ওকে লেখাপড়া শেখানো হয়নি বলে। জুলেখা ওই সময়টাতে খুব আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কাতর চোখে তাকিয়ে সে আঙুল খুঁটত। একদিন আড়ালে আমাকে চুপিচুপি বলেছিল, জানো অঞ্জু, আমার বিয়ের কথা হচ্ছে? আমি কিন্তু বিয়েই করব না দেখবে।'

'কেন জুলি?' অবাক হয়ে জিগেস করেছিলাম ওকে। 'কেন তুমি বিয়ে করবে না?'

জুলি আস্তে বলেছিল, 'আমি কারুর বাড়ি থাকতে পারব না। আমার খুব কষ্ট হবে।'

'বিয়ে কী জুলি?'

জুলিও খুব অবাক হয়ে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকার পর হঠাৎ দুহাতে আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল। ফিসফিস করে বলেছিল, 'তুমি ছাড়া আর কারুর পাশে আমি শুতে পারব না। আমার লজ্জা করবে খুব।'

'বিয়ে করলে পাশে শুতে হয়? সত্যি বলছ?'

'হুঁ।' সে গম্ভীর হয়ে বলেছিল। 'পাশে শোবার জন্যই তো বিয়ে।'

'কেন পাশে শুতে হয়, জুলি?'

অমনি জুলি আমার পিঠে থাপ্পড় মেরে বলেছিল, 'বলতে নেই। ছিঃ! আমি তোমার ফুফু হই না?'

তারপর যত দিন যাচ্ছিল, জুলির বিয়ে কেন্দ্র করে যেন একটা সমস্যা মাথা চাড়া দিচ্ছিল। প্রায়ই দেখতাম বাবার সঙ্গে মায়ের কথাকাটাকাটি চলেছে। মা খেপে গিয়ে বলেছেন, 'মেয়েটা তোমার গলার কাঁটা হয়ে উঠেছে তো? ওকে যেমন করে হোক, না তাড়িয়ে শান্তি নেই। নৈলে কোন আক্কেলে তুমি ওই আধবুড়ো ল্যাংড়া-ভ্যাংড়া লোকের বাড়ি ঠেলতে চাইছ?'

বাবা বলেছেন, 'কী মুশকিল! বদরু তো খানদানি ঘরের ছেলে। মিলিটারিতে বাবুর্চির চাকরি করত। জাপানিদের গুলি লেগে একটা পা জখম হয়েছিল। রীতিমতো সরকারি পেন্সন পাচ্ছে। এদিকে খাসি কেটে হাটবারে ভালই কামাচ্ছে। তুমি ওকে ল্যাংড়া-ভ্যাংড়া বলে ঠাটা করো না। দুনিয়া চরে খায় বদরুদ্দিন।'

বদরুর একটা পা ছিল না। সে ক্র্যাচে ভর করে হাঁটত। হাটবারে তাকে দেখতাম রাস্তার ধারে ছোট্ট একটা নিমগাছের ডালে রক্তাক্ত খাসি ঝুলিয়ে ছাল ছাড়াচ্ছে। তার চেহারায় একটা নিষ্ঠুরতা ছিল। অথচ সে যখন হাসত, তখন তাকে ভদ্রলোক দেখাত। সম্ভবত সে যুদ্ধের সময় ফ্রন্টে ছিল এবং যেন নিজেও যুদ্ধ করেছে সেইটাই বোঝাতে চাইত চেহারায় একখানা নিষ্ঠুরতা চাপিয়ে। বাসে বা ট্রেনে নাকি তাকে ভাড়া দিতে হত না। বাসে বা ট্রেনে চাপার সময় সে তার মিলিটারি উর্দিটি গায়ে চড়াত, আর তখন তার সেই তামাটে রঙের নিষ্ঠুরতাটা যেন ভয়াল হয়ে উঠত।

এমন একটা লোকের পাশে গিয়ে জুলিকে শুয়ে থাকতে হবে, ভাবতেই রাগে

দুঃখে আমার কান্না পাচ্ছিল। আমি জুলির আরও কাছ ঘেঁষে থাকছিলাম। বাড়ির পেছনে ছোট্ট পুকুরটার পাড়ে আমাদের বাগান ছিল। জনহীন দুপুরবেলায় সেই বাগানে আমরা গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতাম। আব কালুও ছিল আমাদের সেই ষড়যন্ত্রের এক শরিক। আমরা দুজনে কালুকে খুব প্ররোচনা দিতাম,' বদরুর বাকি পাথানাও যেন সে কামড়ে খেয়ে ফেলে। কোথাও বদরুকে দেখামাত্র চুপিচুপি কালুকে লেলিয়েও দিয়েছি। কিন্তু কালু হতচ্ছাড়া ওকে যেন প্রাক্তন যোদ্ধা ভেবেই সম্মান জানাত লেজ নেড়ে। ক্রমশ কালুর ওপর আস্থা খুইয়ে একদিন জুলি মাথার ওপরকার লম্বাটে একটা ডাল দেখিয়ে বলেছিল, 'ল্যাংড়া বদরু আসুক না বিয়ে করতে। এসে দেখবে আমি ওখান থেকে ঝুলছি! এক হাত জিভ বের করে চুল এলিয়ে—' বলে সে সত্যি জিভ বের করে একটা ভয়ানক ভঙ্গী করেছিল।

আমার ভীষণ খারাপ লেগেছিল। বলেছিলাম, 'ধুশ! বিচ্ছিরি দেখাবে।'

'দেখাবেই তো। দেখে বদরুর বিয়ের সাধ ঘুচে যাবে।'

একটু ভেবে বলেছিলাম, 'উঁহু। ওকে বিশ্বাস নেই। তবু বলবে বিয়ে করব।'

জুলি হেসে অস্থির। 'আর কী করে করবে? তখন আমি তো মরে গেছি।'

সঙ্গে সঙ্গে তাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরেছিলাম। ফুঁপিয়ে উঠে বলেছিলাম, 'না, না।' আর জুলি সেই জনহীন দুপুরবেলার বাগানে আমাকে বুকে চেপে নিঃশব্দে কতক্ষণ ধরে কান্নাকাটি করেছিল। কালু আমাদের পেছনে দাঁড়িয়ে ব্যথিতভাবে লেজ নাড়ছিল। হঠাৎ মুখ তুলে তাকে দেখে মনে হয়েছিল, দৈত্যদের পৃথিবীতে আমার আর জুলির মতো কালুও এত অসহায়!

বাবা আমার কোমলহৃদয়া মাকে যখন অনেকটা নুইয়ে ফেলেছেন, গন্ধে গন্ধে খোঁজ নিতে এসে পড়েছে হুরমতি নামে এক নাচুনি—যার বগলে সবসময় একটা ঢোলক আটকানো, এমন কী পাশের বাড়ির হাতেমের বউ এসে হলুদবাটার জন্য শিলনোড়া চাইছে, সেই সময় একদিন ডাকপিওন একটা পোস্টকার্ড দিয়ে গেল।

বাবা পোস্টকার্ডটা হাতে করে বাড়ি ঢুকে ঘোষণা করলেন, 'ডেপুটি সাহেব আসছেন।' সঙ্গে সঙ্গে একটা হিড়িক পড়ে গেল। মা দৌড়ে গিয়ে পোস্টকার্ডটা ছিনিয়ে নিয়ে প্রায় চিৎকার ছাড়লেন, 'ভাইজান আসছেন! ভাইজান আসছেন!' তারপর বড়ো বড়ো চোখে চিঠিটা দম আটকানো ভঙ্গিতে পড়ে নিয়ে ছুটোছুটি শুরু করলেন। 'জুলি! ও জুলি! শিগগির হাসুর মাকে খবর দে! আর

শান, ছোট্টুকে বলে আসবি।' জুলি পা বাড়াতেই ফের চিক্কুর ছাড়লেন, অ্যাই বাঁদরমুখী! আরও শোন্। পর মেলে দিলে সব কথা না শুনেই।'…

আমার মায়েরা ছিলেন সাত বোন এক ভাই। মা সবার ছোট, আর ভাইটি সবার বড়ো। সেই ছিলেন ইংরেজ আমলের এক পরাক্রান্ত ডেপুটি। চাকরি থেকে রিটায়ার করার পর তাঁর একটাই বাতিক ছিল, পালাক্রমে বোনদের খোঁজখবর নিতে যাওয়া। তিনি ছিলেন বিপত্নীক এবং ছেলেরাও ছিল লায়েক। মেয়েদের পাত্রস্থ করে ফেলেছিলেন জীবনের সুদিনে। তারা দেশভাগের পর পাকিস্তানে চলে যায়। ফলে বোনদের প্রতি তাঁর স্নেহের মাত্রা ছিল প্রগাঢ় ও বিপুল। ট্রেন থেকে নেমে এলেও যেমন গতিবেগ ঘোচে না, রিটায়ার করার পরও তাঁর দেহমন থেকে তেমনি আমলাতন্ত্রের গতিবেগটি ঘোচেনি। পালে বাঘ পড়ার মতো এসে পড়তেন বাড়িতে। আমার বাবা ছিলেন স্কুলমাস্টার। গ্রামের স্কুলে ইন্সপেক্টর আসার অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল। তিনি তাঁর ডেপুটি শ্যালককে বাইরে-বাইরে ঠাট্টা করলেও ভেতর-ভেতর খুব সমীহ করে চলতেন। কারণ ওই জাঁদরেল প্রাক্তন আমলার দরুন গ্রামে তাঁর প্রভাব বাড়ত। বাবা বলতেন বটে, 'নাও! ডেপুটিসাহেব ট্যুরে বেরিয়ে পড়েছেন', কিন্তু তাঁর ন্যালাভোলা বাড়ি আর অগোছাল সংসারকে ব্যস্তভাবে সাজিয়ে ফেলতে মায়ের সঙ্গে পাল্লা দিতেন।

আমার ডেপুটি মামা 'ডিসিপ্লিনে'র খুব পক্ষপাতী ছিলেন। পান থেকে চূণ খসলে চটে যেতেন। তাগড়াই আর ফর্সা পাঠান চেহারার মানুষ। কাঁচাপাকা একরাশ চুলদাড়ি। পরনে শাদা ঢোল পাঞ্জাবি-পাজামা, পায়ে কালো পামসু, হাতে সারাক্ষণ একটা বেতের মোটা ছড়ি। উত্তরোত্তর ধর্ম তাঁকে যত টানছিল, তত শরীর থেকে অসংখ্য চোখ গজিয়ে উঠছিল যেন। ডিসিপ্লিন, পরিচ্ছন্নতা আদবকায়দা এসব জিনিসের দিকে অসংখ্য সেই চোখে লক্ষ্য রাখতেন এবং প্রত্যেকটির পেছনে শাস্ত্রীয় সমর্থন দাঁড় করাতেন।

তিনি আসছেন শুনে আমাদের বাড়িতে সাজো-সাজো রব পড়ে যেত। দরদরজার চটের পর্দাটা বদলানো হত। দেয়াল, সিলিং মেঝে ঝাড়পোঁছ করে তকতকে রাখা হত। উঠোনের ইঁদারাতলায় তৈজসপত্রের পাহাড় জমিয়ে হাসুর মা বালি আর ছাই দিয়ে আড়ংধোলাইয়ে লেগে যেত। মা জুলিকে নিয়ে কোমরে আঁচল জড়িয়ে কাজে নামতেন। মাঝে মাঝে কী করতে হবে, খুঁজে না পেয়ে বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াতেন। শোবার ঘরের সব দেয়াল ঢেকে ছবি

লটকানো মায়ের শখ। পত্রিকা থেকে রঙীন ছবি ছিঁড়ে নিয়ে বাবাকে বাঁধিয়ে আনতে বলতেন শহর থেকে। ডেপুটি ভাইজানের অনেকগুলো ফটোও বাঁধিয়ে এনে জায়গামতো লটকেছিলেন। সেই ঘরে মাকে অন্তরকম দেখাত। স্বপ্নাচ্ছন্ন এক মুসলিম যুবতী, বাইরের পৃথিবীতে যার পা ফেলা বারণ, সে বাইরের পৃথিবীর রূপরসশব্দগন্ধস্পর্শ অনুভব করার জন্য নিজের ঘরে তাকে প্রতিফলিত করতে চাইত। সেই মাথাকোটা আকুলতার ছাপ মায়ের চোখে ফুটে উঠতে দেখতাম। ওটাই ছিল তাঁর শ্বাস ফেলার জগৎ। কিন্তু ডেপুটি মামা এলেই ওই জগৎটাকে ফেলে রেখে তাঁকে বেরুতে হত। ডেপুটিমামার আবির্ভাবে মায়ের মধ্যে বহু সূক্ষ্ম পরিবর্তনও আমি লক্ষ্য করতাম। গলার স্বর কত খাদে নামানো যায়, আগে থেকে তাই প্র্যাকটিস করতেন। কারণ ডেপুটিমামার শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা অনুসারে, মুসলিম স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর বাড়ির বাইরে পৌছুনো বারণ। শাড়িটিও শরিয়ত মতে পরা চাই। তাই প্রচণ্ডভাবে গায়ে জড়ানোর ফলে মায়ের হাঁটাচলার অসুবিধে হত। কিন্তু উপায় নেই। আছাড় খেয়ে পড়লে জুলি হাসি চাপতে পারত না। তাকে বকতে গিয়ে মাও হেসে ফেলতেন। তবে ওই সময়টাতে মাকে বড় সুন্দর দেখাত। ভক্তিমতী, পরিচ্ছন্ন নম্রস্বভাব আর লাজুক। আমি হঠাৎ-হঠাৎ মাকে মুখ তুলে দেখে আর যেন চিনতেই পারতাম না।

আর আমার উদাসীন স্বভাবের বাবা মানুষটিও বদলে যেতেন। পরিষ্কার কাপড়-জামা পরতেন। হাবেভাবে আভিজাত্য ফোটানোর চেষ্টা করতেন। মধুর কণ্ঠস্বরে আমাকে ও জুলিকে তুমি বলে সম্ভাষণ করতেন। আসলে ডেপুটি মামার জন্য বাড়িজুড়ে একটা থমথমে পবিত্রতা, ছিমছাম একটা স্নিগ্ধতা ফুটে উঠত। একটু তফাতে দাঁড়িয়ে দেখলে পুরনো একতলা জীর্ণ বাড়িটাকে মনে হত বড় গম্ভীর আর সম্ভ্রমউদ্রেককারী। তাই বার বার বাড়িটাকে তফাত থেকে দেখতে যেতাম এবং মুগ্ধ হতাম।

আমাদের সাদামাটা সংসারকে এভাবে সম্ভ্রান্ত করে তুলতেন ডেপুটিমামা। পাড়াজুড়েও তাঁর আসার আগেই তখন হিড়িক; 'ডিপ্‌টি সাহেব আসছেন! ডিপ্‌টি সাহেব আসছেন!' প্রবীণেরা এসে খবর নিয়ে যেতেন কখন তাঁর শুভপদার্পণ ঘটবে। স্টেশনে গরুর গাড়ি পাঠানোর দায়িত্ব তাঁদেরই কেউ নিতেন। কেউ পাঠিয়ে দিতেন ধামাভরা পোলাওয়ের চাল। কেউ দিয়ে যেতেন এক বোয়াম ঘি—এমন কী মোরগ পর্যন্ত।

এসব উপহার সামগ্রী তাদের সেন্টিমেন্ট রক্ষার জন্য এবং ডেপুটি সাহেবের মুখ চেয়েও ফিরিয়ে দেওয়া হত না। তখন তাঁর সম্ভ্রমের পালিশে সারা মুসলমান পাড়া ঝলমলিয়ে উঠেছে। এর একটা বিশেষ কারণও ছিল। একসময়ে স্বদেশী আন্দোলনের ঠেলায় ইংরেজ সরকার মফস্বলের আমলাদের তথাকথিত 'গঠনমূলক' কাজে লেলিয়ে দিতেন। ডেপুটি মামার দেহ-মনে যে গতিবেগের কথা বলেছি, এই গঠনমূলক কাজের ব্যাপারটা ছিল তার অন্তর্ভুক্ত। তবে রিটায়ার করার পর ধর্ম এবং অন্যান্য কারণে তাঁর তৎপরতা একান্তভাবে মুসলিম সমাজমুখী হয়ে ওঠে, যাকে তিনি বলতেন 'কওমি খিদমত' অর্থাৎ জাতির সেবা। আমাদের গ্রামের মুসলিমদের মধ্যে জিন্নাসাহেবের দ্বিজাতিতত্ত্বকে তত বেশি খাওয়ানোর ইচ্ছে না থাকা সত্ত্বেও (কারণ ডেপুটিমামা রাজনীতি অপছন্দ করতেন এবং ইংরেজদেরই ভাবতেন দেশের ত্রাণকর্তা) শেষ পর্যন্ত কওমি রেজারেকশান-গোছের একটা উন্মেষ ঘটিয়েছিলেন। মসজিদে মাইনেকরা মৌলবী রেখে বালকবালিকাদের ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছিল তাঁরই উপদেশে। ছোটখাট বিবাদের ফয়সালা তাঁর পথ চেয়ে বসে থাকত। লোকেরা বলাবলি করত, 'এবার ডিপ্‌টিসাহেব এলেই গহর আর এরাতুর কাজিয়াটা মিটে যাবে।' কিংবা 'ইন্দু যে তার গরিব ভাগ্নের হক মেরে খাচ্ছে, সেটারও একটা আস্কারা হয়ে যাবে।' ডেপুটি সাহেব এসে মসজিদে ভাষণ দিয়ে লোকগুলোকে এমন উত্তেজিত করে ফেলতেন যে তারা গঠনমূলক কাজের খোঁজে পিলপিল করে বেরিয়ে পড়ত। ঝুড়ি-কোদাল-কাটারি নিয়ে রাস্তা মেরামতে লেগে যেত। ডোবা-পুকুর থেকে কচুরিপানা সাফ করে ফেলত। মাঠের ইদগার সংস্কারে মেতে উঠত। সরকারের কাছে তাদের হয়ে দরবার করারও সুবিধে ছিল তাঁর। আর এসবের ফলে ডেপুটিসাহেব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। হয়তো গ্রামের লোকেরা ভাবত, একবার ডেপুটি হলে মানুষ সারাজীবনই ডেপুটি থেকে যায়। জুলি চুপিচুপি আমাকে বলত, 'জানো অপু, ডিপ্‌টিভাইজান মেজেস্টেরের হাকিম ছিল? শুনে আমার তো হাতপা কাঁপছে তখন থেকে।'

'হাতপা কাঁপছে কেন?'

জুলি চোখ বড়ো করে বলত, 'মেজেস্টরের হাকিম কি যে-সে?'

হেসে অস্থির হয়ে বলতাম, 'মেজেস্টরের হাকিম কী বলছ তুমি? মামুজি তো ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন।'

জুলি আরও ঘাবড়ে গিয়ে বলত, 'ও মা! তাই বুঝি? আমি ভাবি মেজেস্টরের হাকিম!'

দের অজ্ঞতা দেখে অবাক হতাম না। আমার পড়ার বইয়ের পাতা খুলে সে অন্ধের চোখ দিয়ে দেখত। তার শ্বাসপ্রশ্বাস যেন আটকে যেত আবেগে। একবার একটা ছবির ভেতর সেই প্রথম মানুষের মুখ চিনতে পেরে তার শরীর জুড়ে থরথর আনন্দের উচ্ছ্বাসও আমি দেখেছিলাম। তারপর থেকেই যেন সে মায়ের শোবার ঘরের দেয়ালে মায়ের মতোই একটা পৃথক জগৎ আবিষ্কার করতে শিখেছিল। সুযোগ পেলেই সে আমাকে সাথী করে নিয়ে ওঘরে ঢুকত। একটার পর একটা ছবির সামনে গিয়ে দাঁড়াত। আমি বুঝিয়ে দিতে গেলে সে কাঁধে চাপ দিয়ে ফিসফিসিয়ে উঠত, 'চুপ করো তো!' তারপর ডেপুটিমামার ছবির সামনে গিয়ে তাঁকে চিনতে পেরেই জিভ কেটে মাথায় কাপড় চড়িয়ে ঘোমটা দেওয়ার ভঙ্গী করত। এটা মেয়েদের শরিয়তি শালীনতার রীতি।

ডেপুটিমামা এলে তাঁকে জলের গ্লাস, চায়ের কাপপ্লেট পানমশলার রেকাবি এসব পৌঁছে দিতে হত জুলিকে। সে প্রচুর ঘোমটা টেনে এবং প্রচণ্ডভাবে শাড়িটাকে শরীরে লেপটে মাথাটা সামনে ঝুঁকিয়ে এগিয়ে যেত দলিজঘরে। দলিজঘরে বাইরের লোক থাকলে সে দরজার এধারে পর্দার আড়াল থে ভিতুকণ্ঠস্বরে নিয়েযাওয়া জিনিসটার নাম উচ্চারণ করত। অথচ ওইসব লোকে সামনে মাথা খুলে অগোছাল শাড়ি পরেই সে ঘোরে।

ডেপুটিমামা অনেকসময় শুনতে পেতেন না কথার খেয়ালে। তখন তা দাঁড়িয়ে থাকতেই হত আর মাঝে মাঝে মৃদুস্বরে জিনিসটার নাম আওড়া অথবা আস্তে করে কাশতে হত। তবু ভেতর থেকে সাড়া না এলে বিব্রতমুখে আমাকে খুঁজত। তখন আমি গিয়ে তার মুশকিল আসান করতাম

ডেপুটিমামাই প্রথম জুলির বয়সের দিকে বাবা ও মায়ের দৃষ্টি আকর্ষ করেছিলেন। বলে গিয়েছিলেন, 'মেয়েটা বিয়ের লায়েক হয়েছে। আফটার অ পরের মেয়ে। ওকে আর ঘরে রেখো না।' পরের বার এসে জুলিকে দে ফের বলেছিলেন, 'এখনও ওর বিয়ে দাওনি? আবদুল্লা! হুস্না! তোমর আগুন নিয়ে খেলছ। হুঁশিয়ার!'...

জুলি সেই কথা আড়ি পেতে শুনেছিল। তার ক্ষোভ হয়েছিল। কিন্তু মুখ ফুটে কাউকে বলতে পারেনি। কিছুদিন পরে কালুর সঙ্গে বাগানে লুকোচুরি খেলছি, জুলি পেয়ারাগাছে ঠেস দিয়ে বুড়ি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কালুর আগে

আমি বুড়ি ছোঁয়ামাত্র ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেলাম। খাপ্পা হয়ে বললাম, 'ফেলে দিলে আমাকে?'

জুলি গাল ফুলিয়ে বলল, 'ছুঁয়ো না আমাকে। জানো না আমি আগুন, হাতে ফোস্কা পড়বে?'

রাগটা সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গেল। এমন মজার কথায় না হেসে পারা যায় না। আমি ওকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলাম। 'আগুন? নাও—পোড়াও! পোড়াও পোড়াও আমাকে।' আমি ওর শরীরকে ওতপ্রোতভাবে খামচে টানাটানি করে, এমন কী ওর বুকে ঢুঁ মারার মতো মাথা গুঁজে এবং ওর বিশাল চুল ধরে ঝুলোঝুলি করে বলতে থাকলাম, 'আগুন? আগুন তুমি? বলো আগুন?'

জুলি ধপাস করে পা ছড়িয়ে বসে কেঁদে ফেলল। তখন অপ্রস্তুত হয়ে সরে গেলাম। কালু আমার পাশে এসে দাঁড়াল। বৃক্ষতলে এলোচুলে শোকাকিনী জুলির দিকে দুজনেই ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলাম।

সে রাতে জুলি কোনো গল্প বলছিল না। উঠোনে একবার কালু সন্দিগ্ধ কণ্ঠস্বরে ডেকেই চুপ করে গেল। পেছনের তালগাছটায় খড়খড় শব্দ হতেই আমি ভাবলাম, একটা পরী আকাশ পথে যেতে যেতে ক্লান্ত হয়ে তালগাছের মাথায় বিশ্রাম নিতে নেমেছে এবং সেটা টের পেয়েই কালু আস্তে ঘেউ করে উঠেছে। ভয়ে জুলির কাছ ঘেঁষে গেলাম। সে চিত হয়ে শুয়েছিল। হঠাৎ ঘুরে আমাকে বুকে টেনে নিল।

তো সেবার বসন্তকালে যখন ল্যাংড়া মিলিটারি বদরুর সঙ্গে জুলির বিয়ের কথা মোটামুটি ঠিকঠাক হয়ে এসেছে, সেইসময় ডেপুটিমামার আবির্ভাব ঘটল।

জুলি যেমন, তেমনি আমিও বুঝতে পেরেছিলাম, জুলির আর উদ্ধারের আশা নেই। বিশেষ করে বদরু সে বেলা নিজেই এসে খাসির মাংস দিয়ে গেল। তার চেহারার নিষ্ঠুরতাটা ঘষেমেজে কোমল দেখাচ্ছিল। ডেপুটিমামাকে যখন অভ্যর্থনা করে গরুর গাড়ি থেকে নামানো হচ্ছে, তখন তাকে মিলিটারি পোশাকে দেখে আমি শিউরে উঠলাম। ডেপুটিমামা তাকে চিনতে পেরে বললেন, 'কী বদরুদ্দিন, কেমন আছ?'

বদরু একপায়ে সোজা হয়ে খট করে স্যালুট ঠুকল এবং বলল, 'ভাল আছি স্যার। আপনি ভাল তো?'

দ্রুত আমার মাথায় ভেসে এল বাগানের আমগাছের সেই ডালটার কথা—কিছুদিন থেকে লম্বা ছড়ানো সেই ডাল খুব জ্যান্ত হয়ে জুলিকে খুঁজছিল। সবকিছু ফেলে বাগানে ছুটে গেলাম। ডাকলাম, 'জুলি! জুলি!' কালুও ভয়ার্ত স্বরে একবার ঘেউ করে ডাকল। খুঁজে না পেয়ে বাড়ি ফিরে দেখি, জুলি বারান্দার তক্তাপোশে গালিচা বিছোচ্ছে। বাড়ি ঢুকে ডেপুটিমামা আগে ওখানে এসে বসবেন। 'নাশতা-পানি' খাবেন। তারপর যাবেন দলিজঘরে। সেখানে প্রবীণদের ভিড় জমবে। ইজিচেয়ারে বসে তাঁদের সঙ্গে বাক্যালাপ করবেন ডেপুটিমামা। ছড়িটি পাশে ঠেকা দেওয়া থাকবে।

জুলির চোখে চোখ পড়লে সে একটু হাসল। হাসতে পারল দেখে অবাক লাগছিল। তারপর চমক খেলাম তার কপালে কাচপোকার টিপ দেখে। সেদিন সারাদুপুর খিড়কির পুকুরে তাকে একটা কাচপোকা ধরতে সাহায্য করেছিলাম ভেবে একটু পস্তানিও হল। আর সে সুন্দর করে চুল বেঁধেছে, গত ইদের ডোরাকাটা শাড়িটা বের করে পরেছে। মায়ের ভঙ্গীতে খোঁপায় ঘোমটা আটকে রেখেছে (মুসলিম কুমারীদেরও ঘোমটা দেওয়া নিয়ম)। সে কি জানে না ল্যাংড়া মিলিটারিটা সেজেগুজে দলিজঘরের সামনে এসে পৌঁছেছে? আমি ওকে কথাটা জানিয়ে দেব ভাবলাম, কিন্তু সুযোগই পেলাম না। ডেপুটিমামা দরাজ গলায় ডাকতে ডাকতে বাড়ি ঢুকছিলেন, 'অঞ্জু! অঞ্জু কোথা রে?' আমাকে দেখে ভুরু কুঁচকে একটু হেসে বললেন, 'হ্যালো মাই বয়! কত বড়োটি হয়ে গেছ তুমি! চেনাই যাচ্ছে না—অ্যাঁ?'

প্রথা অনুসারে এগিয়ে গিয়ে পদচুম্বন করলে মাথা স্পর্শ করে আশীর্বাদ করলেন। এবার মায়ের পালা। মা পদচুম্বন করে উঠেছেন, হঠাৎ আমার পেছন থেকে কালুর সাইরেন শুরু হয়ে গেল। সে এই প্রথম ডেপুটিমামাকে দেখেছে।

কালুকে বাবা তাড়া করলেন। কিন্তু তার চেঁচামেচি বন্ধ হল না। এমন কি আমিও তাকে বকে দিলাম। তবু সে গ্রাহ্য করল না। খিড়কির দরজায় দাঁড়িয়ে চিক্কুর ছাড়তে থাকল।

ডেপুটিমামার মুখে বিরক্তি ফুটে উঠেছিল। কিন্তু তখন কিছু বললেন না। কিছুক্ষণ পরে বারান্দার তক্তাপোশে গালিচায় বসে কথা বলতে বলতে হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'অঞ্জুর কোন ক্লাস হল এবার?'

'ক্লাস সিক্স।'

'মাশ আল্লাহ্! সাবাস!' ডেপুটিমামা মিটিমিটি হেসে চাপা স্বরে বললেন, কুকুরটা কার?'

শুনতে পেয়ে মা ঝটপট বললেন, 'কারুর না। কোত্থেকে এসে জুটেছে। রাত্তিরে বাড়ি পাহারা দেয় বলে—'

হাত তুলে মাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'বলো তো অঞ্জু, আমার একটা কুকুর আছে ইংরেজিতে কী?'

ভেবেচিন্তে বললাম, 'মাই হ্যাজ এ ডগ।'

ডেপুটিমামা অট্টহাস্য করে বললেন, 'আবতুল্লা! হুস্না! শোনো তাহলে —মাই হ্যাজ এ ডগ!'

বাবা ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন, 'সারাদিন পড়াশোনা নেই—খালি কুকুর নিয়ে খেলা! আই হ্যাভ এ ডগ।'

ডেপুটিমামা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, 'আবদুল্লা, তুমি তো আবার এথিস্ট্। খোদাতালা মানো না, নমাজ পড়ো না। তোমাকে বলা নে। হুস্না, তুমি শোনো!'

মা ঘোমটা একটু টেনে উদ্বিগ্ন মুখে বললেন, 'বলুন ভাইজান!'

'ইসলামি শাস্ত্রে আছে, কুকুর পোষা না-জায়েজ (অসিদ্ধ)। বিল্লির ঝুটো বং পাক, কিন্তু যে-বাড়িতে কুকুর থাকে, সে-বাড়িতে রাতবিরেতে ফেরেশতা দেবদূত) ঢোকেন না।'

বাবা ফিক করে হেসে বললেন, 'খোদা তো সব দেখতে পান। ইন্সপেকশনে াক পাঠানোর দরকারটা কী?'

ডেপুটিমামা চোখ পাকিয়ে বললেন, 'তোমাকে বলিনি। তুমি তো নামে লমান, ভেতরে হিন্দু।'

বাবা বললে, 'সে কী! আমাকে তো এথিস্ট্ বললেন এক্ষুনি! আবার ন্দু বানিয়ে দিলেন?'...

বাবা তাঁর এই ডেপুটি শ্যালকের জন্য গর্বিত ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর সঙ্গে ৰ্ক করতে ছাড়তেন না। তর্কটা অনিবার্যভাবে ইংরেজিতে পৌঁছে যেত। খন একটা আশ্চর্য আবহাওয়ার সঞ্চার ঘটত বাড়িতে। মা মুখ টিপে হেসে জ করে বেড়াতেন, কিন্তু কান থাকত সেদিকেই। জুলি ফ্যালফ্যাল করে

তাকিয়ে থাকত। আমি গর্বিত মুখে লক্ষ্য রাখতাম। বাড়িটাকে আরও সম্ভ্রমে গম্ভীর করে তুলত ইংরেজি ভাষা। মা মাঝে মাঝে ফিসফিস করে বলতেন, 'কোন সাহসে লাগতে যাওয়া? ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন—তার সঙ্গে! একি স্কুলমাস্টারি?'

তবে শেষপর্যন্ত বুঝতে পারতাম, একজন প্রাক্তন ডেপুটি আর এক স্কুল মাস্টারের তর্কটা নিছক শ্যালক-ভগ্নীপতির আড্ডাবিলাস। অবশ্য দলিজে যখন এই ব্যাপারটা ঘটত, তখন সেটা আমাদের পরিবারের গভীরতর খান্দানিরই প্রতীক হত এবং প্রভাব ফেলত। লোকেরা হাঁ করে দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকত।

কিন্তু স্কুলমাস্টারের নাস্তিক্য সম্পর্কে প্রাক্তন ডেপুটির বিশ্বাস এমন পাকা-পোক্ত ছিল যে সেজন্য আমাকেও একবার ভুগতে হয়েছিল। সেবার তর্কের শুরু আমার নাম নিয়ে।

ডেপুটিমামা বলেছিলেন, 'ছেলের নাম তো মরহুম সন্‌-বাবাজি রেখে গেছেন। তুমি হলে হিন্দু নামই রাখতে।'

বাবা বলেছিলেন, 'ভেবে দেখলে ওটা হিন্দু নামও। অঞ্জুমান আর অংশুমান একই।'

ডেপুটিমামা বাঁকা হেসে বলেছিলেন, 'হুঁ, বেঅকুফের কানে একইরকম শোনাবে বটে!'

বাবা জোর দিয়ে বলেছিলেন, 'ভাইজান! আমি বলছি শুনুন। অঞ্জুমান ফার্সিতে হল জ্যোতিষ্ক—শাইনিং স্টার। আর সংস্কৃতে—'

'তোমার মাথা! অঞ্জুমান বা আঞ্জুমান হল সভা—মজলিশ।'

'আহা, সে তো যোগরূঢ়ার্থে। অঞ্জুমান হল জ্যোতিষ্ক আর আঞ্জুমান জ্যোতিষ্কমণ্ডলী।'

'যোগ-ফোগ আমি বুঝি না!'

'না বোঝাটাই তো আপনাদের সমস্যা।' বাবা দুঃখিত মুখে বলেছিলেন। 'ফার্সি অঞ্জুমান আর সংস্কৃত অংশুমান একই শব্দ। অংশুমান মানে যা অংশু বা কিরণ ছড়ায়। আসলে প্রাচীনযুগে ইরান আর ভারতের লোকেরা একই ভাষায় কথা বলত। ফার্সিতে যা নমাজ, সংস্কৃতে তাই নমস্।'

ডেপুটিমামা থামিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, 'আগড়ম-বাগড়ম ছাড়ো! ছেলের খৎনা দিয়েছ?'

মা তো আড়ি পেতে বেড়াতেন। ঝটপট বলেছিলেন, 'কবে দিয়েছি ভাইজান! সে তো পাঁচবছর বয়সেই।'

'আমাকে দাওয়াত করো নাই!'

'আপনি তো তখন কুমিল্লায় পোস্টেড।'

বাবা বলেছিলেন, 'মনে করে দেখুন, চিঠি গিয়েছিল।'

ডেপুটিমামার সন্দেহ কিন্তু ঘোচে নি। সেদিনই দুপুরবেলা দলিজঘরে আমাকে ডাক দিয়েছিলেন। দুপুরের খাওয়ার পর বাড়ি তখন নিঃসাড়। সেদিন ছিল ছুটির দিন। বাবা ভাত ঘুম দিচ্ছেন। মা খিড়কির দোরে গিয়ে বসেছেন আর জুলি তাঁর চুলে চিরুনি চালিয়ে উকুন খোঁজার ভান করছে। আমি উঠোনের কোণায় লেবুতলায় একটা খেলা খুঁজছি। এমন সময় দলিজ-ঘর থেকে চাপা গম্ভীর ডাক ভেসে এল, 'অঞ্জু! কাম হেয়া।'

ভেতরে গেলে আবছা আবছা আলোয় ডেপুটিমামা ফিসফিস করে হেসে বললেন, 'তোর সত্যি খৎনা হয়েছে?'

লজ্জায় কাঠ হয়ে বললাম, 'হুঁউ।'

'কাছে আয়।'

যাচ্ছি না দেখে ধমক দিলেন। তখন কাছে গেলাম। ডেপুটিমামা ভুরু কুঁচকে বললেন, 'ফাঁস না বোতাম?'

বুঝতে পারছি না দেখে আমার জামা তুলে বললেন 'ফাঁস!' তারপর একটানে ফিতের ফাঁসটা খুলে আমার হাফপেন্টুল নামিয়ে দিলেন এবং ক্ষুদে জিনিসটাকে নেড়েচেড়ে পরীক্ষা করে ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে বললেন, 'অলরাইট! ফাঁস আটকে ফ্যাল। আর এই নে বখশিস। খেল্‌গে, যা।'

বখশিসটা একটা অবিশ্বাস্য আধুলি এবং আমার হাফপেন্টুলের বয়সে তার প্রচুর দাম। তবে লজ্জায় এ কথা কাউকে বলিনি। জুলি, যার কাছে আমার গোপনীয় কিছু ছিল না, তার কাছেও না।...

ল্যাংড়া-মিলিটারি বদরুর সঙ্গে জুলির বিয়ের কথা চলার সময় ডেপুটিমামা এসে সামান্য একটা প্রাণী কালুকে শত্রু ভেবে বসবেন, কল্পনাও করি নি। কালু ছিল আমার সারাক্ষণের সঙ্গী। সে আমার সঙ্গে স্কুলেও যেত। যতক্ষণ স্কুলে থাকতাম, তার আনাচে-কানাচে অপেক্ষা করার ইচ্ছে থাকত। কিন্তু বোর্ডিংয়ের

রান্নাঘরের কাছে আড্ডা দিত যারা, তারা তাকে পছন্দ করত না। তাড়া করে আমাদের পাড়ায় ঢুকিয়ে রেখে যেত! স্কুল থেকে ফেরার সময় তার সঙ্গে ঠিকই দেখা হয়ে যেত কবরখানার কাছে। বাড়ি ফিরে তাকে না দেখতে পেলে আমি অস্থির হব, কালু জানত। আর জুলিও কালুকে ভীষণ ভালবাসত। আমি, জুলি ও কালুর একটা পৃথক জগৎ ছিল। সেখানে আমরা তিনজন পরস্পর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলাম, কেউ কাউকে ছেড়ে থাকব না। ডেপুটিমামা এসে যখন ফতোয়া জারি করলেন, কালুকে তাড়াতে হবে, আমার ও জুলির মুখ শুকিয়ে গেল।

আমরা সে-বেলা বাগানে গিয়ে চুপিচুপি পরামর্শ করলাম, কীভাবে কালুকে বাঁচানো যায়। তবে জুলি বলল, 'কথাটা কিন্তু সত্যি। রাত্তিরে কালু চ্যাঁচায় কেন অত, এতদিনে বুঝলাম, জানো অঞ্জু?'

'কেন, জুলি? ফেরেশতা আসে বলে? ফেরেশতা কেমন বলো তো?'

জুলি জানত। বলল, 'তোমার বইয়ে লেখা নেই? শাদা ফিট্‌ কাপড-পরা। মাথায় শাদা পাগড়ি। আঁধারে জ্বলে যেন।'

'কেন আসে?' আসলে আমি রাগ করে কথা বলছিলাম। আসবার দরকারটা কী?'

'বাড়ির মানুষ ভাল, না মন্দ তাই দেখতে।'

'আমরা তো ভাল।'

'ভালই তো। আমরা কি ল্যাংড়া হারামির মতো খারাপ? আমরা কি কারুর গলায় ছুরি চালাই?'

খুব অবাক লাগছিল, ডেপুটিমামা আর কালু দুজনেই তাহলে রাতের আগন্তুক ফেরেশতাকে দেখতে পায়, আর কেউ পায় না! পেলে তো কবে সেকথা বলত। মা না, বাবা না, জুলি না, পাশের বাড়ির হাতেম না—এমনকি মৌলবিসাহেবও না। আমাদের বাড়ি ওঁর খাওয়ার পালা পড়লে কালু ওঁকে দেখে চেঁচামেচি করেছে। তবু তো উনি বলেন নি কালু রাতের ফেরেশতাকে বাড়ি ঢুকতে দেয় না? ডেপুটিমামার এই অসামান্য ক্ষমতা আমাকে ওঁর সম্পর্কে আরও ভয় পাইয়ে দিল। সেই বয়সে প্রবীণেরা এমনিতেই দৈত্যের মতো উঁচু আর বলবান,ডেপুটিমামাকে তাঁদের চেয়েও উঁচু আর ক্ষমতাশালী দেখতে পেলাম। জুলি ও আমি ভেবে-ভেবে কিছুই ঠিক করতে পারলাম না কালু বেচারাকে কীভাবে রক্ষা করব।

প্রথম রাতেই ডেপুটিমামা কালুর চিৎকারে খেপে গিয়েছিলেন। সকালে চোখমুখ লাল করে বললেন, 'হারামি কুত্তা সারারাত ঘুমোতে দেয় নি। ওর একটা ব্যবস্থা করা দরকার। হি মাস্ট বি পানিশড্!' তাঁর ইংরেজি গর্জনে বাড়ি গমগম করছিল। আর কালুও কেন কে জানে, ওঁকে দেখে খেপে গিয়েছিল। সারাক্ষণ চেঁচামেচিতে কান ঝালাপালা করে দিচ্ছিল। কিছুতেই তাকে শান্ত করতে পারছিলাম না। যতবার তাকে বাগানে ঠেলে দিই, বাড়ি ঘুরে সে দলিজঘরের কাছে যায় আর চিৎকার করে। বেলা বাড়তে বাড়তে দলিজঘরের সমাবেশে ডেপুটিমামার ফরমান জারি হল। তারপর আঁতকে উঠে দেখলাম, যোয়ানমদ্দ একদঙ্গল লোক পরোয়ানা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। মা চুপ করে থাকলেন। শুধু বাবা বোকার মতো হেসে বললেন, 'কোনো মানে হয়? ভাইজানের যত বয়স হচ্ছে, তত যেন পাগলামিটা বেড়ে যাচ্ছে। ঘরে ছবি থাকলেও নাকি ফেরেশতা ঢোকে না। তার বেলায় তো উচ্চবাচ্য নেই?' মা অমনি চোখ কটমটিয়ে বললেন, 'থামো তুমি!'

লোকগুলোর হাতে লাঠি, বল্লম, চটের থলে, প্রকাণ্ড ঝুড়ি পর্যন্ত। আরেকবার দলিজঘরের সামনে কালু চেঁচাবার জন্য গিয়ে পড়তেই তারা হইহই করে তাকে তাড়া করল। আমি ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেললাম। জুলি এসে আমাকে টেনে ঘরে ঢোকাল। আশ্বাস দিয়ে বলল, 'পারবে না। কালু খুব চালাক। ডিপুটিসাহেব কদিন আর থাকবেন? চলে গেলেই কালু বাড়ি ফিরবে দেখো।'

তখন দূর থেকে দৈত্যদের বিকট চিৎকার ভেসে আসছিল। চিৎকার আরও দূরে মিলিয়ে গেলে জুলি আমার চোখ মুছিয়ে দিতে দিতে বলল, 'ছিঃ। কাঁদে না! তুমি এখন বড় হয়েছ। কাঁদা মানায় না তোমার। এই ছাখো না, আমার মাথার সমান হয়েছে তোমার মাথা।' সে আমার গালে গাল ঠেকিয়ে উচ্চতা দেখাল। তারপর আমাকে অবাক করে আমার গালে চুমু খেল। তারপর সেই আবছা আঁধারে ভরা ঘরে আমার শরীর নিয়ে সে যা সব করতে থাকল, তা তার সান্ত্বনারই প্রকাশ।

তারপর আর কালুকে দেখতে পাইনি। পাড়ায় না, তার প্রিয় ভ্রমণক্ষেত্র কবরখানাতেও না, গ্রামে না—কোথাও না। আমার জীবন থেকে কালু হারিয়ে গেল চিরদিনের মতো। কেউ আমাকে বলতে চাইত না কালুর কী হল। কিন্তু শুধু কালু না, পাড়ায় ফেরেশতা ঢুকবে না বলে লোকেরা পাড়ার সব

কুকুরের পেছনে লেগেছিল। এভাবে কুকুর-শূন্য হওয়ায় ফেরেশতারা নিশ্চিন্তে লোকেদের বাড়ি ঢোকার সুযোগ পেয়েছিলেন। বেগতিক দেখে মন্দ লোকেরাও ভাল সাজার চেষ্টা করে থাকবে। শুধু মুর্গিচোর কিনুর কথা আলাদা। একরাতে কিনু এসে মায়ের দরমা থেকে 'বাদশা'কে নিয়ে গেল। বাড়িতে চুপিচুপি হাহাকার পড়ে গেল। বাদশাকে মা তাঁর ডেপুটি ভাইজানের বিদায়-ভোজের জন্যই নাকি রেখেছিলেন, অন্যদের ওপর ছড়ি ঘোরানো তম্বি করার জন্য নয়। জুলি আমাকে আড়ালে বলেছিল, 'এই তো শুরু হল। আরও কত কী হবে। দেখি না ডিপটিসাহেবের ফেরেশতা কাকে বাঁচায়।'

তবে একথাও ঠিক যে ফেরেশতা বাড়ি ঢোকায় জুলি তাঁকে নালিশ জানানোর সুযোগ পেয়েছিল। আমাকে শুনিয়েই ফিসফিসিয়ে বলত, 'বাবা ফেরেশতা! আর যার সঙ্গেই হোক, ওই ল্যাংড়াভ্যাংড়ার সঙ্গে যেন আমার বিয়ে না হয়।'

এই শুনতে শুনতে এক রাতে আমি ওকে বলে ফেললাম, 'জুলি! আমি যদি বড় হতাম, আমিই তোমাকে বিয়ে করে ফেলতাম।'

শোনামাত্র আমার মুখে হাত চেপে জুলি সেই পুরনো ধুয়ো তুলে বলে উঠল, 'ছিঃ! আমি তোমার ফুফু হই না?'

কিন্তু একটা ব্যাপার লক্ষ্য করে অবাক হয়েছিলাম। বদরুর সঙ্গে বিয়ের কথাটা কেন যেন চাপা পড়ে যাচ্ছে। তাহলে সত্যি কি রাতের ফেরেশতা বাগড়া দিয়েছেন জুলির প্রার্থনায় মন গলে গেছে বলে?

এবার ডেপুটিমামা অন্যবাবের চেয়ে বেশিদিন ধরে আছেন। গোড়াতেই বলেছি, আমার সেই বয়সে চারপাশে ঘটত সন্দেহজনক সব ঘটনা, যার মাথামুণ্ডু বুঝতে পারতাম না। বাড়িতে যেন তেমন কিছু ঘটছিল। মায়ের মুখে থমথমে ভাব। বাবার সঙ্গে ফিসফিস করে কীসব আলোচনা করেন। বাবা গম্ভীর মুখে বেরিয়ে যান। বেশির ভাগ সময় বাইরেই কাটান। মা কাজ করতে করতে হঠাৎ থেমে আস্তে ডাকেন, 'জুলি, শুনে যা।' কিন্তু জুলি কাছে গেলে বলেন, 'থাক। পরে বলব। দ্যাখ তো, ভাইজান চা-ফা খাবেন নাকি? আর শোন্ ওঁর গেঞ্জি ময়লা হয়েছে বলছিলেন। চেয়ে নিয়ে আয়।'

এক সন্ধ্যায়, তখন বসন্তকাল, মা নামাজ পড়তে বসেছেন, বাবা গেছেন হিন্দুপাড়ায় বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে, ডেপুটিমামা গেছেন মসজিদে, আমি পড়তে বসব কি না ভাবছি, জুলি আমার হাত ধরে খিড়কি দিয়ে বাগানে

টেনে নিয়ে গেল। তারপর শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, 'ও অনু! জানো কী হয়েছে?'

'না তো। কী হয়েছে জুলি?'

'ভাবিজি তার ভাইজানের সঙ্গে আমার বিয়ে লাগিয়েছে।'

প্রায় চিৎকার করে উঠলাম, 'মামুজির সঙ্গে?'

'চুপ, চুপ।' জুলি আমার মুখে হাত চাপল। 'ভাবিজি বলছে, ভাল থাকবি। উনি একা থাকেন। দেখাশোনার কেউ নেই। ডিপটিসাহেবের বউ হবি। মান বাড়বে।'

জুলি ধরা গলায় বলতে থাকল ফের, 'ভাবিজি বলছে, ডিপ্‌টিসাহেবের ছেলেমেয়েরা তো সব পাকিস্তানে আছে। জমিজমার ভাগ নিতে কেউ আসবে না। সব তুই পাবি।' জুলি হু হু করে কেঁদে উঠল। 'সব আমি পাব— ঘরবাড়ি, জমি সম্পত্তি। ছপ্পর খাটে পা ঝুলিয়ে আমি বাঁদির বেটি বেগম সেজে বসে থাকব।'

মা ডাকছিলেন, 'জুলি! জুলি!' মায়ের কণ্ঠস্বর চাপা এবং স্নেহে কোমল। জুলি চোখ মুছে আস্তে আস্তে চলে গেল। সন্ধ্যার বাগানে আমি একা দাঁড়িয়ে। আমগাছটা থেকে মুকুলের মউমউ গন্ধ অন্ধকারে। সারাদিন যেসব পাখি ডাকাডাকি করে, তারা চুপ করে আছে, যেন কিছু ঘটতে চলেছে। আর যে বৃক্ষলতা এমন অন্ধকারে নির্দয় রহস্যে ভরে ওঠে, তাদের সব রহস্য ফাঁকাই হয়ে গেছে। তাদের নিষ্ঠুরতাও জুলির ব্যর্থ প্রণয়কামী ল্যাংড়া গলিটারিটার মতো কোমল হয়ে ভিজে যাচ্ছে—আমি নিঃশব্দে কাঁদছিলাম। ইচ্ছে করছিল তুমুল চেঁচামেচি করে বলে দিই, 'জুলি আমার। একদিন বড় হয়ে আমিই তাকে বিয়ে করব।...

সে-রাতে বিছানায় শুয়ে আশ্চর্যভাবে আবিষ্কার করলাম, কালু তাহলে ঠিকই চিনেছিল। যে প্রাণী অন্ধকার রাতের ফেরেশতাদের দেখতে পায়, সে সত্য চেনে এবং তার পকেটে লুকিয়ে রাখা কালো সিন্দুকটিও টের পায়।

জুলি আমাকে সেরাতে আদরে আদরে অস্থির করে ফেলছিল। সে আমার গালে ঠোঁট রেখে ফিসফিস করে অনর্গল কথা বলছিল। সে বলছিল, শিগগির-শিগগির তুমি বড় হয়ে ওঠ। সোনার ছেলেটা! তুমি যদি বড় হতে, কে সাহস পেত আমাকে বিয়ে করার?' সে দুহাতে আমার মুখটা আঁকড়ে ধরে আবেগে ছটপট করে বলছিল, 'ছোটবেলাকার মতো আমার নাক চুষে

দাও। আমার গাল কামড়ে খেয়ে ফেলো।' আমি চুপচাপ দেখে সে কাত হয়ে চুল খুলে সেই চুল ছড়িয়ে আমাকে ঢেকে দিতে দিতে বলছিল, 'আমার এই চুলগুলো তুমি কত ভালবাসো! এই নাও, তোমাকে চুল দিয়ে লুকিয়ে রাখলাম। ফেরেশতা এসে শুধোবে, অঞ্জু কোথায় গেল, তার নাম লিখব খাতায়? আমি বলব, পারো তো খুঁজে নাও। সে কী মজা হবে বলো তো?' তারপর সে আমার মাথাটা টেনে আমাকে চুলের তলায় লুকিয়ে দিল।···

আমার দয়ালু দাদু দুবছরের অনাথ মেয়েটির বিস্ময়কর চুলের বিশালতায় মুগ্ধ হয়ে তার নাম রেখেছিলেন জুলেখা—কেশবতী।

সেই কেশবতীর চুলে স্বাধীনতার প্রথম সুগন্ধ টের পেয়েছিলাম। যে-সুগন্ধ অবশেষে এক বসন্তকালের বাগানে সন্ধ্যার অন্ধকারকে মাতিয়ে আমার তুচ্ছ একরত্তি জীবনের রন্ধ্র দিয়ে ঢুকে চোখ ফাটিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল শিশিরের ফোঁটার মতো। ভিজিয়ে দিয়েছিল রহস্যের নিষ্ঠুরতাগুলিকে।

জুলির কাছেই পেয়েছিলাম স্বাধীনতার প্রথম সুঘ্রাণ। বলেছিলাম, 'আমাকে বড় হতে দাও।'

কিন্তু দৈত্যের মতো পরাক্রান্ত এক প্রাক্তন ডেপুটি প্রথমে কালুকে পরে জুলিকে আমার জীবন থেকে মুছে দিলে আমি বাকি জীবনের জন্য একলা হয়ে গেলাম।···

পায়রাদের গল্প

এত উজ্জ্বল রোদের দিনে পৃথিবীর কাছে অনেক ভালো জিনিসের প্রত্যাশ থাকে। সম্ভবত সে কারণেই সব শোনার পরেও সুখোর মনে হচ্ছে, আরো কিছু বাকী থেকে গেল। হয়ত বাবার সামনে সেগুলো বলা যায় না, সুখোর ভঙ্গীটি এইরকম। এদিকে-ওদিকে তার বিষণ্ন চাউনি—তবে উড়ন্ত ঘর-পালানে পায়রা খোঁজে যেমন, তেমনটি নয়। অনেকটা রোদ গায়ে নিয়ে সুখো বার বার থুতু গিলছে। ভগ্নদূত ছেলের উপর মমতায় প্রসন্ন সুধাংশু গলা ঝেড়ে বলল—শুনছ? এক গেলাস জল দাও।

কুসুম রান্নাঘর থেকে তখনও বেরোয় নি। গনগনে উনুনে ভাতের জল টগবগ করে ফুটছে। চাল দেবার মন নেই। সে এক-গা ঘামের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। ভ্যাপসা গরমে কেবল স্নান করবার সাধই জাগে। তাতে সেই শেষ রাতে হুড়মুড় করে ওঠা, তারপর কান্নাকাটি, চোখ দুটো লাল, খুব জ্বালা করছে। স্বামীর ডাক শুনে সে তাকাল। শাড়ির পাড়ে চোখের নিচেটা ও নাক মুছল। শেষে উঠল। কুঁজো থেকে জল গড়াতে গিয়ে হয়ত হাতটা থেমেছিল। তখন দেরি দেখে সুধাংশু বিরক্ত হয়ে বলল—এক গেলাস জল আনতে রাত কাবার হবে যে!

মাথার ঠিক নেই, তাই দিনকে রাত বলা। কখনই বা ঠিক থাকে সুধাংশু? এমন উল্টোপাল্টা অনেক সময় সে বলে ও করে। মিলিটারী পেনসনের টাকা এলে বকসী লিখতে পাকড়াশী লিখে সই করে ফেলে। ডাকপিওন বলে—এই মরেছে রে, সেনাপতি মশায়ের মাথা খারাপ হয়েছে।

—উঁ? বলে সুধাংশু বিপন্ন চোখে তাকায়! ছেঁড়া ফাটা খাকি জামার হাতায় হাত ভরে পাঁজর চুলকোয়। ছারপোকা পেলে বাইরে এনে টিপে মারে। আঙুলে রক্ত চটচট করে। সেই রক্তমাখা আঙুল দেখে সে কিছুক্ষণের জন্যে স্তব্ধ থাকে।

একসময় যুদ্ধে ছিল। যুদ্ধ করুক বা না করুক, সে কারণেই সে যোদ্ধা। এবং ডাকপিওনের শিল্পবোধের গুণে সুতরাং সে সেনাপতি। সেনাপতির এই ভুল-ভাল কথায় কিছু অনুমান করে ডাকপিওন যদি শুধোয়—তা এই সুধাংশু পাকড়াশীটি কে?

—অ। তাই লিখলুম নাকি? যেন ছেলেমানুষের মত ভাঙা দুধের দাঁত মুখে সুধাংশু হাসে। আহা, লোকটি বড় ভাল। যুদ্ধে গেলে বা অগত্যা মানুষ মারলেই যে মানুষ মন্দ হয়ে পড়বে, এমন কথা নেই।

এই মানুষ সুধাংশু। খোঁচা-খোঁচা আধপাকা দাড়ি গোঁফ, রুক্ষু কটা চুল, গায়ে কবেকার মিলিটারী হাফশার্ট—ছেঁড়া ফাটা যাই থাক, বেশ পুরু, শীত গ্রীষ্মে সমান আরামদায়ক। ধুতি হাঁটু অবধি গুটিয়ে সে যখন হাঁটে, দেখলে মনে হয়, চারপাশে অবিশ্রান্ত গুলি-গোলার বর্ষণ ভেদ করে এগিয়ে চলেছে একটি মানুষ। ভ্রূক্ষেপহীন, লক্ষ্যবিহীন। নিরস্ত্র দুটি হাত দু পাশে ঝুলছে। যে যুদ্ধক্ষেত্রে হাঁটে, সে সৈনিক ছাড়া কী হতে পারে। দু' পাশে দুটি বড় বড় হাত ঝুলিয়ে সুধাংশু হাঁটে। যেন যুদ্ধে আর সাধ নেই। কোথায় যেতে

কোথায় পৌঁছয়। হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়। বলে—তাই তো! ভুল দেখিয়ে দিলে বলে—অ!

সেই সুধাংশুর তিন মেয়ের নাম বকুল, মুকুল, পারুল। আসল নাম অবশ্য একটা আছে। তবে ওই ডাকনামের মধ্যেই তারা টিকেছে। জল যেমন পাত্র অনুসারে রূপ পায়, এই নামগুলোর মধ্যেও তেমনি একটি করে রূপ তারা পেয়েছে। তাই কদাচিৎ আসল নাম উঠলে হকচকিয়ে যাওয়ার কথা। বাপ সুধাংশুই বলে—জ্যোৎস্নাকুমারী? সে কে রে?···বকুল সামনে দাঁড়িয়ে তখন খিলখিল করে হাসলে বেচারা রীতিমত অবাক হয়।—মেয়েটি কে গা, চেনা-চেনা ঠেকছে!

মেজ মুকুল—তার নাম স্নেহলতা। ছোট পারুল—তার বেলায় যেন সব স্নেহ ফুরিয়ে গিয়েছিল বাপমায়ের মন থেকে। প্রথাসিদ্ধ লৌকিক কাকুতি বহন করা সেই কুখ্যাত নাম আন্নাকালীই রাখা হয়েছিল। তায় পারুল অতি দুরন্ত মেয়ে। দারুণ ছটফটে স্বভাব। হাড়জ্বালানী যাকে বলে। কিন্তু আন্নাকালীতে তার মাথাব্যথা ছিল না। সতের বছর বয়সে সে যখন ছোড়দি-মেজদির মত বরের কথা ভাবছে, এমন কি লুকিয়ে অচেনা নায়কের প্রতি প্রেমপত্রের মুসাবিদা করছে, তখন স্পষ্ট হরফে সই করছে, ইতি অভাগিনী পারুল। বোনেদের দু' বছর করে বয়সের তফাত। মেয়েদের কাছে এটা স্বভাবত কোন প্রশ্ন নয়, সে-কারণে স্বপ্নসাধ নিয়ে যা কিছু আলোচনা করবার তারা একত্রই করেছে। তবে পারুলের একটা আলাদা ব্যাপার ছিল। সেটা যেন তার যত্নে রাখা গোপন রত্ন। মনের অন্ধকার তাকে এক রূপকথার সিঁদুরকৌটো, ছোড়দি-মেজদি তার নাগাল পায় নি। পক্ষান্তরে বকুল জেনেছে, মুকুল কাকে চায়। মুকুল জেনেছে, বকুলদির মন কোথায় দস্তখতে বাঁধা আছে। পীড়াপীড়ি করলে পারুল বলেছে—ধেৎ, ওসব আমার ভালো লাগে না। দিদিরা চুল খামচে বলেছে—তবে কী ভালো লাগে তোর? পারুল মুখ টিপে হেসে বলেছে—পায়রা ওড়াতে।

সবার বড় সুখের ওই নেশা। পায়রা তাকে ম্যাট্রিক অবধিও এগোতে দেয় নি। চলতে চলতে হঠাৎ যেন নীল আকাশে উজ্জ্বল রৌদ্রের ভিতরকার দলছুট পোখরাজ দেখে সব ছেড়ে সে তার পিছনে সাত সমুদ্র তের নদী তেপান্তর পাড়ি দিতে চলে গেল। সেই যাওয়া তার সমানে চলেছে। পথে ঘাটে মাঠে যেখানেই হাঁটুক বা যেভাবেই থাক, চোখ দুটি আকাশের দিকে

ফেরানো। হোঁচট খেয়ে হাঁটু ছড়ে, আঙুল মচকায়, তবু চোখ ফেরে না নিচে। কেমন করে কবে একদিন মুণ্ডুটা আকাশের দিকে কাত হয়েছিল, মুণ্ডু আর ঘোরে নি। (সুধাংশু বলে মা দুগ্গার পায়ের নিচের অসুর যেমন) এইরকম দেখে এক সন্ন্যাসী সুখেনকে বলেছিল—যা ব্যাটা, তুই পাবি। তা সত্ত্বেও মা কুসুম গাল দেয়—ওই ধেড়ে বাঁদরটাকে শুধোও তো, এমনি করে দিন যাবে পর? শুনে সুধাংশু পস্তায়—সত্যি, সুখোটা যে একেবারে নাগালের বাইরে চলে গেল।

কিন্তু কে বাইরে গেল, তার খাঁটি প্রমাণ শেষ রাতে পাওয়া গেছে। মা বাবা দাদাদিদিদের অবাক করে, লজ্জা দিয়ে ও ঘেন্নাপিত্তি নিয়ে ছোট পারুল হঠাৎ রাত থেকে ঘরে নেই। চিরদিন একালষেঁড়ে মেয়ে—তক্তাপোশে ছোড়দি-মেজদি এক দিকে, সে অন্য দিকে শুয়েছে। গরম বলে কুসুম বারান্দায় সুধাংশুর পায়ের কাছে এসে শুয়ে ছিল। সুখেন একতলার ছাদে মাদুর পেতেছিল। আশ্চর্যের কথা, অন্য রাতে সবায় বলেছে—পোড়া চোখে ঘুম নেই একেবারে। আজ তারা কালঘুমে ঘুমিয়ে পড়েছিল! অন্যরকম কিছু বলা যেত। কিন্তু তার আগেই উদো দত্ত পাড়ায় হইচই করে ফেলেছেন। শাক দিয়ে মাছ ঢাকা গেল না। তাঁর স্টেশনারী দোকানের সেই ছোকরা কর্মচারী প্রমথ রাতারাতি কোথায় কেটেছে। ক্যাশবাক্সের টাকাকড়ি নিয়ে গেছে। আর যা সব নিয়েছে, তার হিসেব হচ্ছে: একটি বড় কৌটো পাউডার, একটা স্নো, এক শিশি আলতা, পুরো এক বাক্স গন্ধসাবান, বৃহৎ কেশতৈল··· ইত্যাদি। উদয় দত্ত মশায়ের চশমাটা ড্রয়ারে ছিল। সেটাও নিয়ে গেছে। দত্ত বলছেন—নিলি নিলি, বেশ করলি। তা আমাকে আবার কানা করে গেলি কেন হারামজাদা? বুড়োমানুষের চশমা তোর ছেলেমানুষ চোখের কী কাজে লাগবে শুনি? নিছক রসিকতা, না বদমাইশি এটা?

আর পারুল? সেও নিয়েছে কিছু। তবে গরীব বাপের সংসার। নিয়েছে তিন বোনের একটি মাত্র সুটকেসটাই। তার ভিতর তিনজনেরই কাপড়চোপড় আর যা-যা সব ছিল। বিস্ময় ও কেলেঙ্কারির লজ্জা ঘুচিয়ে বকুল আর মুকুল গুমরে গুমরে কেঁদেছে। কুসুম গর্জে উঠেছে চাপা স্বরে—হতভাগী, যাবি তো নিজেরখানাই নিয়ে যা। দিদিদের ন্যাংটো করে গেলি কেন?

ন্যাংটো হওয়াই একরকম। ক'দিন পরে শ্যামচাঁদের মেলা। ময়দানে সার্কাস আসবে, ম্যাজিক আসবে, সিনেমা আসবে। তার উপর কুসুমের দাদা

অমরেন্দ্র ক'দিন আগে একটা সুখবর এনেছিল ভাগ্নীদের জন্যে। ভাল সম্বন্ধ। সামনে মাসের দোসরা-তেসরা দেখতে আসছে। বড়-মেজ-ছোট, যে-কোন একটা পছন্দ হবেই। এবং সেদিকে পারুল বেশ চোখে-ধরা মেয়ে।…এখনও খবর পায় নি অমরেন্দ্র। সুধাংশুর বিশ্বাস ছিল, মেয়ে স্টেশন থেকেই কেটে পড়বে। বেশী করলে চেঁচামেচিতে তো ও কম যায় না। রাজ্যের লোক জড়ো করবে। তখন, হারামজাদাকে অ্যায়সা মার মারা হবে…

এই ভেবে সে সক্কালবেলা ছেলেকে তিন মাইল দূরের রেল স্টেশনে পাঠিয়েছিল।

রোদের তাপ বেড়েছে টের পেয়ে তারপর সুধাংশু ঘরে ঢুকেছে। ঘরে পৈতৃক নড়বড়ে নক্‌শা-কাটা খাট আছে একটা। তার ওপর গা মেলে শুয়েছে সে। নড়তে-চড়তে ইচ্ছে করে না। অনেকরকম চিন্তা একসঙ্গে মাথার ভিতর—বাইরে থেকে ঘরে ঝড় ঢুকে যেমন সব তছনছ করে। এইটুকু সামলাতেই সে ক্রমশ কোণের দিকে সেঁটে যাচ্ছে।

সুখো কি মিথ্যে বলল তাকে? নিজের ছেলে—বাপকে আবোলতাবোল বোঝাবে, বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না। তবে ঔরসটৌরস ব্যাপারটা নেহাত পাষণ্ডের আব্দার। অনেক দেখেছে সুধাংশু। দেখতে দেখতে চুল সাদা হয়ে এল, দাঁত নড়বড় করতে লাগল—জন্মমাত্র সবাই নিজ নিজ তালে যে যার দিকে পাশ ফেরে। সুধাংশুর ফের সুখোকে ডেকে জানতে ইচ্ছে করে, স্টেশনছুট গাড়ির জানালায় সেই মেয়েটিই যে পারুল নয়, সে বুঝল কিসে? কপালে আধখানা চাঁদের দাগ আছে পারুলের। বেশ কিছু দূর থেকে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যেত। সুধাংশু তো অনেক দূর থেকে সনাক্ত করতে পারে দাগটা। আট-ন মাসের পারুল, কচি মেয়ে পারুল, কী দুরন্ত ছটফটে মাছের মত পিছল সে, সুধাংশুর হাত পিছলে পড়ে গিয়েছিল উঠোনে। কপাল কেটে সারা মুখ রক্তে ভাসছিল। সুধাংশু সবে ছুটিতে বাড়ি এসেছে। তার বুক মেয়ের রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিল। এবং তারপর যতবার বাড়ি এসেছে, অপরাধীর মত বিনম্র আচরণে সে ছোট্ট পারুলের ক্ষতচিহ্নটাকে অজস্র আদর দিয়েছে। ওই চিহ্ন যুদ্ধের মাঠেও তার ঘুম কেড়েছিল। সুখো সেটা চিনতে পারল না!

অনেক সময় চোখের ভুল অবশ্য হয়। তাতে সুখোর চোখ। আকাশ

দেখে, না রেলগাড়ি ; দলছুট পোখরাজ, না পারুল—এও এক সমস্যা। বরং সুধাংশু যদি নিজে যেত। সুধাংশু যুদ্ধের মাঠে হাবিলদারী কম্যাণ্ড হাঁকবার সুরে গর্জাত—অ্যাই হারামজাদী মেয়ে, শীগগীর নেমে আয় বলছি।···পারুল বলত—কে তুমি যে, বলামাত্র নেমে যেতে হবে?···(তাই বলত পারুল? বলতে পারত? পারত। ওরা সব পারে।)···পারুল, আমি তোর বাপ।···বেশ তো। বাপ আছ, বাপই থাকো। বাপের মান নিজেই রাখ। (ইস, এ কেমন কথা! বরং সুধাংশু নরম হবার চেষ্টা করল।)···এমন করে যেতে নেই মা। যাবি তো ভালোভাবেই যা।···এর চেয়ে ভালোভাবে যাওয়া আর কী আছে বাবা? ভালোভাবে যাওয়া মানে তো দিদিরা শাঁখ বাজাবে, মা উলু দেবে, আর তুমি হাতে হাতে সঁপে দেবে মেয়েকে; এই তো? বরং এখনই দাও না। দিদিদের শাঁখে নিশ্বাস কুলোবে না, মা উলু দিতে গিয়ে আর দুটি মেয়ের দিকে চেয়ে থেমে যাবে। ছোড়দি-মেজদির চোখ মাড়িয়ে, মায়ের দীর্ঘনিশ্বাসের মধ্যে ভেসে যাওয়ায় আমার সুখ হবে না। তার চেয়ে এই বেশ ভালো। কেলেঙ্কারির ঘৃণার মধ্যে ডুবে ছোড়দি-মেজদি তাদের ঈর্ষা ধুয়ে ফেলবে।···ঈর্ষা! সুধাংশুর চোখ পিটপিট করতে লাগল। সুধাংশু দেখল, সে জলে ভেসে যাচ্ছে। স্নেহের জলে। তা হলে গেলই পারুল! এই জলেই ভেসে গেল। ছোট মেয়ে কাপড় পরতে শেখবার পর সুধাংশুর চাকরি গেছে। একখানা ভালো কাপড় কিনে দিতে পারেনি। মেয়েদের কতরকম সাধ আহ্লাদ থাকে। একটুও মেটাতে পারেনি। সুতরাং যেতে দাও। যাক্। তত্রাচ সুধাংশুর হাতের থাবা শূন্যে কী খোঁজে? কে কী নিয়ে পালিয়ে গেল? সারা জীবন ধরে তার কাছ থেকে নিয়ে যাচ্ছে ক্রমাগত একটার পর একটা, যৌবন, সাধ, সুখেন···একমাত্র পুত্রকেও···। সুধাংশুর হাবিলদারী হাতটা অসহায় কুঁকড়ে একটা কিছু খুঁজছে। সেই বন্দুকটা। চাকরি ছেড়ে আসবার সময় যেটা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। চোখ দুটিতে পাথরের উপর শিশির জমে ওঠবার মত জল জ্যাবজ্যাব করছে। বন্দুকটাও কেড়ে নিয়েছিল! অপমানের পুরনো পাথর বুকে নিয়ে সুধাংশু চোখ বোজে।

ওদিকে সুখো জল খেয়ে বেরিয়েছে। সোজা আমবাগানের শেষ প্রান্তে চলে এসেছে। সামনে রুক্ষ মাঠ, নদীর চর। উজ্জ্বল খর রোদে অজস্র ভাঁজ

পড়েছে সবখানে। ভাঁজে ভাঁজে রোদের সাদা শতরঞ্চি খোলা হচ্ছে। সে ছায়ায় মাথা বাঁচিয়ে গনগনে নীলরঙা আকাশ দেখছে। আস্তে আস্তে একটা সিগ্রেট টানছে। রীতিমত সিগ্রেটই, বিড়ি নয়। এবং বিড়ি নয় সিগ্রেট তা বোঝবার জন্যে মধ্যে মধ্যে আঙুলের দিকে চোখ ফেরাচ্ছে।

প্রবোধ একটা মুসকি এনেছে কোত্থেকে। নীলচে ডানা, গলার কাছে চিকন সবুজ আর সিঁদুরে দুটো চাকা। খয়েরী ঠোঁট। পা দুটো মারাত্মক লাল। সব সময় থাকে থাকে পাপড়ি মেলা ফুলের মত কেঁপে থাকে পায়রাটা। প্রবোধ বলছিল, সব ভালো। বুঝলি সুখো, সবই ভালো। চরকিবাজি দেখলেও তাক লাগে। কেবল দোষ হচ্ছে, দারুণ বোমকানা। উড়ে গেলে আর বোম চিনতে পারে না। তাই ঘর-ছাড়া করি নে।

সুখোর একটা আছে। নাম রেখেছে হীরা। সেও প্রবোধের মুসকির মত বোমকানা। বুদ্ধি করে বোমের মাথায় একটুকরো সাদা ন্যাকড়া ঝুলিয়েছিল। উড়ন্ত হীরা পাকসাটে তার কাছে আসে, কিন্তু পরক্ষণেই ভয় পেয়ে সরে যায়। নারকেল গাছের মাথায় গিয়ে বসে। বেচারার ছটফটানি বেশ টের পায় সে। শেষ উপায় হচ্ছে সন্ধ্যে অবধি অপেক্ষা করা। সন্ধ্যেয় আগুন জ্বাললে তখন হীরা নেমে আসে। আগুন ওদের চোখ ধাঁধায়। সুতরাং পাছে আগুনে এসে না পড়ে, তার জন্যে সতর্ক হতে হয়। ফলে হীরাকে একরম ঘরবন্দীই করে রেখেছে। ঘরে বসে হীরা মনের সুখে বকম বকম করে।

আর, সুখোর মনে পড়ছিল, হোসেন কাঠুরে নদীর ওপারে জঙ্গলে কাঠ কাটতে গিয়ে দেখে, ডালে একটা সুন্দর মেটেরঙের দুবাজ বসে আছে। হোসেন অবশ্যি ওর জাত চিনত না—শত্তুর বাজকে আশ্চর্য কৌশলে ফাঁকি দিতে পারে ওরা। অথচ কী ঘর-পোষা পাখি, হোসেন গাছকে সেলাম করে যেই প্রথম কোপ মেরেছে, অমনি কাঁধে এসে বসেছে সে। কানের কাছে ডানা মারছে। হোসেন হেসে কেঁদে বাঁচে না।

পক্ষীরূপী তুমি কে বাছা? অ্যাই আমি কোপ বাঁধলুম, এ জন্মে আর নয় বাপধন। ছোটবাবুর গাছ। ছোটবাবু এসে ধমক দিলে হোসেন কাঁধে কুড়ুল আর পায়রা সহ বাড়ি ফিরে আসে। ঘরে হা অন্ন, তত্রাচ সে আর গাছের গায়ে কোপ বসায় না। মজুর খাটবার সুযোগ না পেলে ভিক্ষেও করে। পথে যখন হাঁটে, কাঁধে সেই ধূসর রঙের দুবাজ। তার পায়ে সাধের রুপোলী ঘুঙুর। পথে

ঘুঙুরের আলতো শব্দ পেলে চোখ বুজে বলা যেত, কাঠ-কাটার ব্যাটা যাচ্ছে।

এখন অবশ্যি হোসেনের ঘরে একদঙ্গল পায়রা। মাটির ভাঁড় ভরতি ছোলা মটর গম। তবে গরীব মানুষ, পেটের দায়ে মধ্যে মধ্যে বিক্রি করে দু-একটা। দানীং সে একটা লটকন বেচবার ফিকিরে আছে। দাম হেঁকেছে পুরো দশ টাকা। বলেছে—ইচ্ছে হলে নাও, নয় তো না। প্রবোধ বলে এসেছে—ব্যাটা যেন রাজখদ্দের পাবে। হোসেনের সামনে দশ টাকার নোট ধরলে হোসেন বলবে, অই দেখ গো, আমার পাখি যে কিনবে, সে রাজার ব্যাটা রাজপুত্তুর। লোভে সুখেনের চোখে ঘুমের পোকা নেই। প্রমথকে টাকার জন্যে মুখ ফুটে বলেছিল। প্রমথ দিতেও চেয়েছিল। কিন্তু হতভাগিনী পারুলটা সব তছরূপ করে ফেলল। স্টেশনে এই সিগ্রেটটা দেবার সময় প্রমথ বলল—ভাবিসনি, কোন কষ্ট হবে না। আর দেখ, তোর-আমার ফ্রেণ্ডশিপটা যেন নষ্ট না হয়। গিয়ে চিঠি দেব। ট্রেনটা এত তাড়াতাড়ি ছাড়ল, প্রমথের দেশলাই নিবে গেল তাড়াহুড়োয়, বেশ বাতাস দিচ্ছিল শেষরাত থেকে।—তা সুখো, এবার ওই পাজী নেশাটা ছাড় দিকি। দিদিদের বে দিতে হবে না? বাবা বুড়ো হয়েছেন। টেলিগ্রাফ তারের ওপারে কী একটা উড়ে আসছিল, দেখতে গিয়ে ট্রেনের চাকা স্যেক হাত গড়িয়ে গেছে। পারুল, পারুল তো কথা বলল না এতক্ষণ। পাশে পাশে হাঁটতে থাকল সুখো। ডাকল—পারুল, এই পারুল! তখন পারুল ঘোমটার ভিতর থেকে মুখ বের করল। কী ঠাণ্ডা শক্ত মুখ! ঝড়জলের পর পৃথিবীকে যেমন দেখায়। সে বলল—পায়রা-ফায়রার নেশা ছেড়ে দিও। মা-বাবা দিদিদের প্রণাম দিও। কখন কোন ফাঁকে সিঁথিটা বিশ্রী লাল করে ফেলেছে, ব্যাপারটা সুখেনের কাছে রীতিমত ধাঁধা। সে প্রায় ছুটতে ছুটতে বলছিল—আয়না সেই সঙ্গে? মাথাটা কী বিচ্ছিরি হয়ে গেছে রে! ঠিক তখনই একটা খালাসী আচমকা তার পেটে গুঁতো মারে—এই উল্লুক, তফাত যাও। দৈমণ সুখেনের চোখের সামনে দশটা টাকা আর পারুলকে নিয়ে প্রমথর ট্রেনটা চলিয়ে গেল।

কী একটা উড়ছে, দূর গভীর নীল রঙের উপর সাদা ফুটকি। লক্ষ করতে গিয়ে হঠাৎ চোখ জ্বালা করে। কচলালে জল উপচে আসে। সুখেন বোঝে, আর দেখবার চেষ্টা বৃথা। সব ঝাপসা হয়ে গেছে।

এদিকে পাশের ঘরে বকুল জানালার পাশে চুপচাপ বসেছে। মুকুল বাক্স হাতড়ে কী দেখছে। কখনও ঘরের অন্ধকার কোণগুলোয় তীক্ষ্ণদৃষ্টে তাকিয়ে থাকছে। কখনও উঠে গিয়ে তাক হাতড়াচ্ছে। বকুল দেখেও দেখছে না বা জানতে ইচ্ছে করছে না। সে তার শাড়ির আঁচল শক্ত করে কোমরে জড়িয়েছে। খোঁপা ডাঁটো করে বেঁধেছে। বাইরের বাগানে নিরিবিলি তিন বোনে ঝুলঝুলা খেলত—তার মানে একজন নিচে, অন্য দুজন গাছের ডালে : লাফ দিয়ে মাটি ছোঁবার পথে নিচের জন তাদের কাকেও ছোঁবে, নয়ত থাকো ফের মড়ি হয়ে ধুলোয় ঘাসে, তখন বকুল এইরকম আঁটোসাঁটো হয়ে উঠত। এখন যে সে বাইরে তাকিয়ে আছে, তার চাউনিতে সেইরকম ক্ষিপ্রতা আর চাঞ্চল্য। চোখের কালো মণি দুটি জলে কাচপোকার মত নড়ছে। ভুরু কুঁচকে আছে। তার একটা হাত জানুর উপর ঘুমন্ত কুকুরের মত চুপচাপ, অন্য হাত মরচে-ধরা রঙ ধরেছে। আর মুকুলের শাড়ি অগোছাল। জলে ঢেউ ওঠাপড়ার মত তার শাড়িটা কাঁপছে। আঁচল মেঝেয় লুটোচ্ছে। বার বার ঘষা খাচ্ছে আসবাবপত্রে। বুকের উপর খাঁজে খাঁজে চন্দ্রবোড়া সাপের মত আঁকাবাঁকা স্তব্ধ পাথরের হার—যার একটুখানি দেখা যাচ্ছে। এবং কানে হিজলফুলের শীষের গড়নের সাদা পুঁতির ফুল—সেটা দুলছে, হিজল ফুলের শীষ যেমন বাতাসে দোলে। তার চিবুকে ঘাম, নাকের ডগায় ঘাম, কপালে ঘাম। ঠোঁটের উপরের ঘামটা সে বার বার জিভ দিয়ে চেটে নিচ্ছে। ওর নাকটা একটু লম্বাটে, বকুলের মত চাপা নয়। অবিকল মায়ের নাক, বাকি সবই বাবার। ব্যস্ততায় মায়ের নাকের ফুটো যেমন ফোলে, মুকুলেরও ফুলছে। পুরনো সাদা ময়লা একটা ব্রেসিয়ার কখন থেকে তোরঙ্গে মুখ বাড়িয়ে ছিল। দ্রুত লম্বা আঙুলে জড়িয়ে যেতেই মুকুল সেটা বাঁ হাতে তুলে শূন্যে দোলাচ্ছিল। তারপর ঠোঁট কুঁচকে সেটা তক্তপোশের নিচে অন্ধকারে ছুঁড়ে ফেলল।

চকিতে মুখ ফিরিয়ে বলল—কী রে?

—ওর সেইটে।

—কী?

ফিক করে হেসে ফেলে মুকুল—কাঁচুলি না ফাঁচুলি। তারপর পায়ের কাছে চোখ রাখে। গুচ্ছের ক্লিপ, সেফটিপিন, ভাঙা মাথার কাঁটা, গিল্টির লকেট, টিপবোতাম। একটা ভাঁজ-করা কাগজ খোলে সে। পরক্ষণেই বকুলের কোলে ছুঁড়ে মারে। বকুল ফের চমকে উঠে বলে—কী?

—তোমার বন্ধুর ঠিকানা।

—কার? বকুল ব্যস্তভাবে ভাঁজ খোলে। তারপর চোখ বুলিয়ে নেয়। ফের বলে—ও সুষমার বরের ঠিকানা। আস্তে আস্তে কাগজটা মুঠোয় দলা পাকিয়ে যেতে থাকে। সে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে কাগজটা।

এই সময় দু'হাত তক্তপোশে ভর করে মুকুল ঝুঁকেছে। তার পিঠটা ভীষণ কাঁপছে। সারা শরীরও নড়ছে—দু' পাশে অদৃশ্য ঘুরন্ত ভারী চাকার বেগ থাকলে যেমন কাঁপন হয়। বকুল সাঁত্ করে উঠে এসে ওকে ধরল।—কী রে, হাসছিস? কেন? হাসছিল মুকুল। হাসতে হাসতে তার কোমর থেকে কাপড় খুলে যায়। একটা ডাঁটালো সূর্যমুখীর পাপড়ি খসে গেলে যেমন দেখায়, একমাথা অগোছাল চুল, রোগা শরীর, শাড়ি খসে-পড়া মুকুলকে সবজে সায়া আর খয়েরী আঁটো ব্লাউজে সেইরকম দেখাচ্ছিল। তখন বকুলেরও হাসি পায়। সে পেট টিপে জোর শব্দ করে হাসে—উঃ মরে গেলুম রে থামবি? এই মুকুল!

মা কুসুম রান্না সামলে স্নানের জন্যে তৈরী হয়েছিল। এ ঘরে কাপড় নেবার জন্যে আসছিল সে। ধাড়ী মেয়েদের এমনি হাসতে দেখে তার মাথায় গরমি হঠাৎ ফেটে যায়। আগুন জ্বলে ওঠে। সে দাঁতে দাঁত চেপে দুই মেয়েকে প্রচণ্ড মারতে শুরু করে। মার খেয়ে ওরা তক্তপোশে উবুড় হয়। ফুঁপিয়ে কাঁদে। তারপর কুসুম বেরিয়ে ঘাটের দিকে যায়। ঘাটে উমাশশী তাকে বলে—অ বউ, চণ্ডী আসে নি এদিকে? চণ্ডী-ফণ্ডী কেউ আসে নি। বাড়িতে এমন কাণ্ড। বাইরের লোক আসবার আর মুখ নেই। তাতে চণ্ডী—

শুধু চণ্ডী কেন? অবনী? অবনী ভোরের গাড়িতে কলকাতা থেকে এসেছে। দোকানের কাপড়চোপড় কিনে ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীকে হাওলা করে দিয়েছে। ট্রাকে আসবে। অবনী এসেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়ে তার মা বলেছে—ও অবু, শুনছিস খিটকেলে কাণ্ড? রাতজাগা লাল চোখে অবনী কতক শুনেছে, কতক শোনে নি। কিন্তু শিরদাঁড়ায় ঠাণ্ডা সাপ চলে গেল। চোয়াল এঁটে ফের টিলে হল। কষা থেকে লাল মুছে সে একটু হেসেছে।—পারুল? তাই বলো। ফের ঘুমিয়ে পড়ার চেষ্টা ছিল। কিন্তু ভাবনা ধরে গেল। বকুলের জন্যে কিছু জিনিসপত্র আছে ব্যাগে। এসব ক্ষেত্রে বরাবর যেমন হয়েছে, বকুলের মা বলেছিল—কলকাতা যাচ্ছ অবু, বকুলের জন্যে একটা পিঠকাটা ব্লাউজ এনো দিকি। দাম এখন দেবার একটু অসুবিধে আছে—উনি

বেরিয়েছেন। কখন ফেরেন ঠিক নেই। তা বাবা অবু···। দাম কোন দিনই দেওয়া হয় না। অবনী চাইতেও পারে না। চাইবার পাত্র সে ঠিক নয়। নতুন নতুন ফ্যাশান যা বাজারে ওঠে, দেখা মাত্র কুসুমের মেয়েরা সটান কুসুমের কাছেই কথাটা তোলে। কুসুম বলে—অবুর দোকান রয়েছে। ও আসুক, এলে বলে দেখব'খন। কষ্টের সংসার, ঘরে সব সোমত্ত মেয়ে, কতরকম সাধ-আহ্লাদ থাকে এ বয়সে। কুসুম হয়ত ভাবে—এতে দোষ কী? পাড়াসম্পর্কে দাদা বই নয়। তা ছাড়া এমনি নিচ্ছি না, দাম কোন না কোনদিন শুধেই দেব। তবে অবনীর বাবা একটা যখ। অবনী মাঝে মাঝে ফাঁপরে পড়ে। খাতাকলমে স্টকের মাল নিখুঁত গোনা আছে। কম হলেই অবনীকে ধমক। তখন সে চোখ বুজে সুধাংশু জ্যাঠার নাম করে। এইসবের দরুন খাতায় হিসেব টানা হচ্ছে—একুনে তিপ্পান্ন টাকা পঁচাত্তর পয়সা মাত্র। পয়লা বোশেখের লাল নোটিস গিয়েছিল। বকুল সেটা অবনীকে ফেরত দিয়েছে। সন্ধ্যায় তিন বোন সেজেগুজে হালখাতা করে এল। মিষ্টি আনল এক ঠোঙা। মাঝখানে কিছু টাকা অবনীর খসল। এখন অবনী কেবল বাবার মৃত্যুর প্রতীক্ষায় আছে। যম ছায়া মাড়ায় না কিপটে বুড়ো যখটার।

কলকাতা থেকে এসে অবনীর ঘুম যেটুকু হবার হয়ে গেছে। সে উবুড় হয়ে শুয়ে দু পা আঁকশি করে শূন্যে নাচাচ্ছে। সুধাংশুকে সে মিলিটারী পোশাকে সশস্ত্র দেখছে। সামনে তারকাঁটার বেড়া। সুধাংশু এবার ঠিকই কুকুর চিনেছে। কুকুর দেখলেই গুলি করবে।

চণ্ডী আপিস কামাই করেছিল আজ। সকালে উঠেই নাকি তার শরীর ম্যাজম্যাজ করছিল। সাইকেলে চেপে রোজ তিন মাইল দূরে রেল-স্টেশন ছোটো, ফের ট্রেনে চেপে দশ মাইল শহরে পাড়ি দাও—বছরে এই একটা দিন নাইবা নিয়ম মানল! মা উমাশশী পাড়ার 'টেলিগ্রাম', সকালে বেরিয়েছে। গ্রাম নিঃশব্দে তোলপাড় হচ্ছে। চণ্ডী বেরিয়ে ক্লাবে গিয়েছিল। তার দিকে সকলে এমন তাকিয়ে থাকল যে, কয়েক বাজি তাস পিটেই সে গ্রামছাড়া হেঁটেছে। ঘুরতে ঘুরতে নদীর ধারে চলে গেছে। তরমুজের ক্ষেত দেখে তার তেষ্টা পেয়েছিল। কিন্তু সাদা তরমুজ পছন্দ হয়নি। তখন অল্প জলে পা ভিজিয়ে সে ওপারে বুনো জামের জঙ্গলে ছায়ায় গিয়ে বসেছে।

নানারকম উল্টোপাল্টা কাণ্ড ঘটাতে ইচ্ছে করছিল তার। সে ভাবছিল, হঠাৎ এখনই গ্রীষ্মের শুকনো নদী কূলে কূলে ভরে উঠলে তার বাড়ি ফেরা হবে না। তখন সে কী করবে? কখনও ভাবছিল, পাশ থেকে হঠাৎ সাপ বেরিয়ে কাটলে কী কী সব ঘটতে পারে। এমন কি একরকম অদ্ভুত ভূমিকম্পের দৃশ্যও সে কল্পনা করছিল। ধরা যাক্, সামনের পলিমাটি ফাটিয়ে আচমকা এক সাধুর আবির্ভাব। সাধুবাবা বললেন—ব্যাটা, কী চাই তোর? চণ্ডী বলল—আজ্ঞে? তারপর ভাবনায় পড়ে গেল। কী চাই তার? কাপড়চোপড়? টাকাপয়সা? মেয়েমানুষ? ওই সামান্য জিনিস—যা এমনিতেও পাওয়া যায়, চেয়ে নিজেকে মহাপুরুষের সামনে ছোট করা কেন? চাওয়া দিয়েই নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করা উচিত। তা হলে কী চাইবে সে? মনে আমার শান্তি নেই সাধুবাবা। শান্তি দাও। কিন্তু সত্যি বলতে কী, এ জিনিসটাও রামাশ্যামার মত চাওয়া হয়ে গেল।...তা হোক, এইটাই বেশ দরকার তার।...কিন্তু তার দোনামনা দেখে সাধুবাবা ওদিকে উধাও। একেবারে হাওয়া!

চণ্ডী ভাবল, মরুক গে। শুধু শান্তি নিয়ে কী হবে! গেছে গেছে, আপদ চুকেছে। আচ্ছা, মুকুল যদি হঠাৎ ভুস করে মরে যায়? মরা তো কঠিন কাজ নয়। গলায় ফাঁস দিয়ে ঝুলে পড়লেই হল। তখন চণ্ডী কী করবে। সে যদি মনের দুঃখে বিবাগী হয়, অভাগিনী মায়ের লাঞ্ছনার চরম ঘটবে। না, বিবাগী হওয়া তার উচিত নয়। কিন্তু মুকুল মরবে—তারও তো একটা কিছু করা উচিত। কাঁদবে লুকিয়ে? ধ্যেৎ, সেও খুব বিচ্ছিরি দেখায়। সাতাশ বছরের যুবক কাঁদবে কী! চণ্ডী দেখল, মুকুল মরলেও তার কিছু করার নেই। নিজেকে এত অসহায় আর অবিবেকী লাগল যে, চণ্ডী নিজের মৃত্যুর কথাই ভাবতে লাগল! সত্যি তো, চুটিয়ে প্রেম চালানোর পক্ষে যথেষ্ট পুঁজি যার নেই, খালি হাত পা নিয়ে মেয়েদের কাছে যাবার কোন মানেই হয় না। তার চেয়ে চণ্ডী মরে যাক। না—কেন, চণ্ডীকে তো এমন দিব্যি দেওয়া নেই যে, সে মরবে না। চণ্ডী চিত হয়ে শুল। আকাশ দেখতে লাগল। এখন আকাশ ছাড়া তার সামনে পিছনে কোথাও আর কিছু নেই।

উঠোনের আকাশে একসঙ্গে অনেক ডানার শব্দে প্রথমে সুধাংশু চমকাল, তারপর কুসুম। শেষে বকুল আর মুকুল। সবারই চোখ খড়ি খড়ি, চাউনি

ঘষা। সুধাংশুর হাতে সকড়ি, কুসুমের হাতে ডালের হাতা। বকুলের চুলে চিরুনি আটকানো। আর মুকুল সবে ভেজা কাপড় বদলে নিচ্ছিল। শুকনো আধখানা ভেজা আধখানায় ঢাকা তার শরীর। সবাই আকাশ দেখতে লেগেছে। কড়া রোদে উঠোনে সুখেন দাঁড়িয়ে আছে। তার মুণ্ডুও আকাশে ঘোরানো। সে হাততালি দিচ্ছিল। গনগনে গরম নীলে ঝকঝকে এক ঝাঁক পায়রা উড়ছিল ঘূর্ণিপাকে। বাঁশের লম্বা বোমটা দারুণ দুলছিল। সুধাংশু বলল—অসময়ে ছেড়ে দিলি ?

কেউ জবাব দিল না। সবার চোখ এখন আকাশে। পায়রারা উঠে যাচ্ছে আর যাচ্ছে। নীল রঙটা সর্বগ্রাসী হাঁ-এর মত ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। মাথার উপর কী শত্তুর নিয়ে পৃথিবী বেঁচে আছে !

সে সময় অবনী জানালার ফাঁকে তাকিয়ে আছে উবুড় হয়ে। সুধাংশু জ্যাঠার বাড়ির ওপর তার চোখ ছিল। সুখো অসময়ে সব ছেড়ে দিলে ? কালবোশেখীর দিন—ঝড়বাদল ওঠে যদি ! আর নদীর ধারে চণ্ডীও দেখতে পায়। পায়রাগুলোর বেশ মজা। চণ্ডীর চোখের পাতা দেখতে দেখতে ভারী হয়। তখন ভিতর দিকে সেই পায়রাগুলো উড়তে থাকে। দৃষ্টির থাবায় আস্ত আকাশটা তুলে এনে ভিতরে গুঁজে দিয়েছে।

কেবল একটা ফিরে আসছিল। সেই বোমকানা পোখরাজ হীরা। রাগে সুখেন ঢিল ছুঁড়ল। হীরা ভয় পেয়ে দূরে সরে গেছে ! ফের সুখেন ঢিল ছুঁড়লে সে আরো দূরে চলে গেল। এ বাড়ির সবাই জানল, সব পাখিই একসময় আদর নিতে ঘরে ফিরবে, কেবল হীরা পথ চিনতে পারবে না।

কবির বাগানে

গ্রীষ্মের জ্যোৎস্নায় নবাবী আমলের সেই পুরনো শহরে যে না হেঁটেছে, জীবনে তার কত কী বাদ পড়ে গেছে, জানে না সে। নদীর আকাশে ভুতুড়ে চাঁদ অনেকবার অনেকে দেখে থাকবে, যার ধূসর আলোয় প্রেমিক-প্রেমিকাদের মনে হয় ইচ্ছা-মৃত্যুর শরশয্যায় নীরবে প্রতীক্ষারত—কিন্তু সেই শহরের পাশে নদীর বাঁকের মুখে জ্যোৎস্নায় দাঁড়িয়ে আমি যাদের দেখেছিলাম, তারা উল্টোটাই চেয়েছিল—মৃত্যু নয়, দারুণ টগবগে জীবন। তারা জীবনের তেজী

ঘাড়াগুলোর জন্য অপেক্ষা করছিল। অথচ, শেষ অবধি এসে গেল এক কালো ং়য়ের টাট্টু, তার নাম মৃত্যু।

হ্যাঁ, এইরকম কবিতা দিয়েই গল্প শুরু হল, বলা যায়। সেটাই স্বাভাবিক ছল। কারণ আমার এই গল্প এক কবিকে নিয়ে। তিনিই বলেছিলেন, এই মফস্বল শহরটার পত্তন প্রাচীন নবাবী আমলে। আজ এর সারা গায়ে ত্যুর দাঁতের দাগ। এর ইট-কাঠগুলোয় ক্ষয়ের প্রচুর রেখা। সারারাত ারাদিন ঘুণপোকা একে কুরে-কুরে খায়। আমি তো ভয়ে ঘুমোতেই ারি নে। ঘুণপোকার একটানা শব্দ শুনে বুক টিপটিপ করে। মনে হয়, মামারই মগজ কুরে-কুরে খাচ্ছে ওরা। তাই বড় ভয় হয় বাবা, কখন কী রে ফেলি!'

কবির বয়স ষাটের ওধারে। আমি তাঁর নামও শুনিনি কস্মিনকালে। অথচ দই শহরে তাঁকে বিশেষ করে যুবকরা দেখছিলাম কবি বলে খাতির করে বং তাঁর দারিদ্র্যের জন্যে সরকারের মুণ্ডুপাত করে। নদীর বাঁকের ফলে হরটা যেখানে বেঁকে গেছে, সেখানে একটেরে কবির বাসস্থান। এক াহিত্যসভায় গিয়ে অনেকটা রাতে যখন একটি ছেলের সঙ্গে ঘুরতে বেরিয়েছি, ার সঙ্গে দেখা হচ্ছিল, বলছিল—'কবিকে দেখতে যাচ্ছেন নাকি? যান, দেখে াসুন—ওই তো ওঁর বাড়ি।'

খুব অবাক লেগেছিল ব্যাপারটা। প্রথমত, একবেলার অনুষ্ঠানে আমাকে াবেগময়ী ভাষায় বক্তৃতা করতে দেখেই কি শহরের তাবৎ লোকের তাক লগে গেল? এবং আমাকে চিনে রাখল? দ্বিতীয়ত, শহরের এক নির্দিষ্ট গয়গায় পৌঁছলে ওরা কেন ধরে নিল যে আমি ওদের কবিকে দেখতে যাচ্ছি? তীয়ত, এখানে একজন কবি আছেন, তা আমার জানাও নেই—এবং কেউ লেও নি এর আগে। যাই হোক, সঙ্গী ছেলেটির দিকে সপ্রশ্ন তাকাতেই দ বলেছিল, 'ও হ্যাঁ—আপনাকে বলা হয়নি স্যার, এখানে কবি জগমোহন াড়ুজ্যের বাড়ি। ওই যে—ওখানটা।'

শুধু বলেছিলেম, 'তাই বুঝি?'

ছেলেটি বুদ্ধিমান। বলেছিল 'আপনারা কলকাতার সাহিত্যিকরা ওঁকে নবেন না। তাছাড়া বড় কাগজে ওঁর কবিতা তেমন একটা বেরোয় নি। । কিছু লিখেছেন মফস্বলের কাগজে। নিজের খরচায় খানকতক বইও বের রেছিলেন একসময়।'

'কেমন লেখেন ?'

'তেমন কিছু না। তবে এখানে সবাই ওঁকে ভালবাসে। কবিতা পড়ে ক'জন জানিনে—কবি হিসেবে খাতির করে খুব।'

'চল না, আলাপ করে আসি।'

ছেলেটি একটু ইতস্তত করেছিল।…'যাবেন ? কিন্তু…'

'কিন্তু কী ?'

'সহজে ছাড়বেন না—ভীষণ বক-বক করেন। তাছাড়া…'

'তাছাড়া ?'

ও কেমন হেসেছিল।…'কিছু না—চলুন।'

কবি জগমোহন বাঁড়ুজ্যের বাড়ি এভাবেই আমার যাওয়া হয়েছিল। কবির সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। আর, সত্যি বলতে কী, সে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতাও আমার হল—যার ফলে জীবনকে অনেকটা আলাদা চোখে দেখতে শিখলাম।…

দু-পাশে আগাছার জঙ্গল, মধ্যে এক চিলতে সিঁথির মত রাস্তা, তারপর কবির একতলা সেকেলে বাড়িটা। ধারে-কাছে কোন বাড়ি নেই। টিমটিমে একটা বাল্‌ব জ্বলছে বারান্দায়। ঘরের ভিতরও সেইরকম আলো। ছেলেটি চাপা গলায় বলল, 'অনেক ধরাধরি করে কবির জন্যে ইলেকট্রিক লাইনটা গত বছর পাওয়া গেছে। তবে সেটা দেবুর জন্যেই। দেবু হল মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের ছেলে। ও নিজেও কবিতা লেখে কি না।'

এমন কবিতাগতপ্রাণ শহরের কথা আমার জানা ছিল না। খুব খুশি হলাম। যে যুগে ফিল্মস্টার, গাইয়ে, খেলোয়াড় আর রাজনীতিকদেরই রবরবা ও খাতির, সে যুগে একজন কবিকে এত মনে রাখা নিশ্চয় বিস্ময়কর ব্যাপার।

কবি মানেই গরীবমানুষ, এটা আমাদের ভাবনায় স্বয়ংসিদ্ধ। জগমোহনবাবুর বাড়িতে বিজলী আলো দিয়ে সেই গরিবী হটানোর বদলে যেন হাট করে খোলা হয়ে গেছে। সেকেলে সরু ইটের দাঁত বের করা নোনাধরা দালানটা সামনে দাঁড়িয়ে মুখ ভ্যাংচাল। বারান্দার ভাঙাচোরা দশা দেখেও খারাপ লাগল। তবে বিজলী আলো যখন দেওয়া হয়েছে, কয়েক বস্তা সিমেন্ট দিতেও অনুরাগী শহরবাসীরা কার্পণ্য করবেন না নিশ্চয়।

বারান্দায় উঠে কড়া নাড়তেই দরজা খুলে গেল। একটি চৌদ্দ পনেরো বছরেরমেয়ে হাসিমুখে বলল, 'এস অমুদা।'

অমু অর্থাৎ আমার সঙ্গী ছেলেটি কিন্তু আমাকে ঠেলে দিল সামনে। মেয়েটি অবাক চোখে আমাকে দেখতে দেখতে একটু পাশ দিল। ভিতরে যেতেই কোণার দিকের খাট থেকে এক বুড়ো ভদ্রলোক—তাঁর মুখে ঘন বিশৃঙ্খল গোঁফদাড়ি আর মাথায় প্রচণ্ড চুল, লাফিয়ে উঠে বসলেন। তারপর বাজখাঁই চেঁচালেন, 'কে, কে? কী চাই এ্যাঁ? কী চাই এখানে?'

আমি হতভম্ব। অমু হন্তদন্ত হয়ে খাটের কাছে গিয়ে প্রচণ্ড জোরে চেঁচিয়ে বলল, ইনি আপনাকে দেখতে এসেছেন কবিজেঠা!'

বুঝলাম, কবি কানে কিছু শুনতে পান না। অমু বার তিনেক কথাটা বলার পর উনি একটু সংযত হলেন যেন। বললেন, 'কী কন?'

আপনকে দেখতে।'

মেয়েটি বলে দিল, 'কানের কাছে আস্তে বল অমুদা, তাহলে শুনতে পাবে।'

কবি কিন্তু শুনতে পেলেন। শুনেই মুখ ভেংচে বললেন, 'দেখতে? আমি কি চিড়িয়াখানার জন্তু—না পাঁচটা হাত গজিয়েছে যে দেখতে আসবে। ওসব মতলব ছাড়ো বাবা! সব আমি বুঝি!'

অমু মেয়েটির পরামর্শমত এবার ওঁর কানের কাছে মুখ বাড়িয়ে চাপা স্বরে বলল, 'উনি একজন বড় সাহিত্যিক—কলকাতায় থাকেন। আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।'

কবি আমার পা মাথা মাথাঅবধি জ্বলজ্বলে চোখে একবার দেখে নিয়ে বললেন, 'সাহিত্যিক? কী নাম?'

অমু নামটা বলে দিল। তখন বললেন, 'কে জানে! আজকালকার লেখা আমি পড়ি নে! দুর, দুর! ও কি লেখা নাকি? নচ্ছারমি! বুঝলেন মশাই, আপনাদের চেয়ে ভাল কবিতা লিখতে পারে বিড়িওয়ালা পানওয়ালারা।

অমু বলে দিল, 'না কবিজেঠা, উনি গল্প-উপন্যাস লেখেন।'

কবি ফ্যাঁচ করে হেসে বললেন, 'গল্প? সে লিখে গেছে শরৎ চাটুজ্যে—তারপর আর কেউ কিছু লিখতে জানে নাকি?'

ইতিমধ্যে সেই মেয়েটি একটা মোড়া এনে দিল। 'বলল, 'বসুন দাদা।'

বসব কি না ভাবছি, কবি আঙুল তুলে ইশারা করলেন। তখন বসলাম।

সেই সময় আড়চোখে দেখলাম, ভিতরের দরজার সস্তা পর্দার ফাঁকে দুটি মেয়ের মুখ উঁকি দিচ্ছে। অমু বিছানার একপাশে বসল। কবি বালিশের পাশ থেকে একটা বিড়ি বের করে ধরালেন। তারপর আরামে টানতে টানতে বললেন, 'গল্প লেখা হয় তাহলে! হুঁ—ভালো। তা কলকাতা ছেড়ে এই এঁদো ভূতের শহরে কেন? প্লট খুঁজতে নাকি? দেখুন মশাই, আজকাল প্লট জিনিসটে আর পাবেন না। প্লট ছিল সে-আমলে—যখন মানুষ সৎ ছিল। আর সৎ ছিল বলেই সৎ-অসৎ-এর দ্বন্দ্ব ছিল। এখন তো সবই অসৎ—অতএব দ্বন্দ্ব নেই। তাই প্লটও নেই।'

অমু বলল, 'কবিজেঠা, ইনি আমাদের ক্লাবের ফাংশনে এসেছিলেন।'

'তোদের আবার ক্লাব আছে নাকি?'

সেই যে বিজয়া-সম্মিলনীতে আপনাকে নিয়ে গেলাম আমরা!'

'এবার কী হল? খবর দিসনি যে?'

'আপনি অসুস্থ আছেন, তাই।'

কবি খিক-খিক করে হেসে বললেন, 'নিতে এলেও কি আমি যেতাম ভাবছিস? বাড়ি ছেড়ে যাই, আর সেই ফাঁকে আমার বাগানে ভূত ঢুকে লণ্ডভণ্ড করুক। এ্যাদ্দিন বুঝতাম না যা হবার হয়ে গেছে—আর নয় বাবা! বুঝলেন মশাই, আমার বাগানের দিকে শহরের তাবৎ ভূতের বেজায় লোভ।'

পর্দার ওদিক থেকে তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'বুঁচি, বাবাকে বল তো, বাইরের লোকের সামনে ওসব কী বলছেন!'

বুঁচি অর্থাৎ ঘরের মেয়েটি মুচকি হেসে কবির দিকে ঝুঁকে বলল, 'বাবা, অমিদি তোমাকে বকছে।'

কবি বললেন, 'বকছে? অমি? কেন?'

'যা-তা সব বলছ কেন?'

'কী বলছি?'

'ওই যে বাগান-টাগান—'

কবি ভীষণ হাসলেন। তারপর আমার উদ্দেশ্যে বললেন, 'মেয়েদের আমার সম্মানে লেগেছে, বুঝলেন মশাই? বাগান বলেছি! তা বাগান না তো কী? আমি শালা এক হতচ্ছাড়া মালী, বাগান লাগিয়েছি—ফুল ফুটিয়ে আলো করে রেখেছি—তাছাড়া কী?'

এবার ভিতর থেকে পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়সের একটি মেয়ে সটান চলে এল

বির সামনে, হাত-মুখ নেড়ে বলল, 'তোমার কী হয়েছে কী? যত বয়স ড়ছে—তত অসভ্য হচ্ছ নাকি! ছিঃ! বাইরের এক ভদ্রলোকের সামনে—'

'অমি, আমাকে বকছিস?'

'হ্যাঁ, বকছি।'

'বেশ। তা চা খাওয়া না আমাদের। ওই সাহিত্যিককে দে, অমূকেও । আমরা গল্পসল্প করি।'

অমি চলে গেল তক্ষুনি। এবার এল বছর উনিশ-কুড়ি বয়সের একটি য়ে।

প্রত্যেকের রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। চেহারায় অপুষ্টির ছাপ আছে। তবে মেয়েটির মুখে স্মার্ট ধরনের একটা হাসি আর তীক্ষ্ণতা ছিল। সে এসে মাকে নমস্কার করে একটা খাতা আর কলম এগিয়ে ধরল।…'একটা টোগ্রাফ দিন না। কিছু লিখে দেবেন কিন্তু।'

কবি ভুরু কুঁচকে দেখে বললেন, 'সই নিবি?'

মেয়েটি ধমক দিয়ে বলল, 'তুমি বকবক কোর না তো!'

কবি বললেন, 'আমার মেজমেয়ে সুমি। বি. এ. পড়ছে। আর ও হল া—ওকে বুঁচি বলে ডাকে সবাই। মোটমাট এই তিনটি মেয়ে আমার। চ তোর কোন ক্লাস হল রে?'

বুঁচি বলল, 'ইলেভেন।'

'হুঁ—তাহলে তো অনেক এগিয়েছিস! কিন্তু তারপর?'

বুঁচি বুঝতে না পেরে বলল, 'তারপর আবার কী?'

কবি আবার ফ্যাচ করে হেসে বললেন, 'হাইজাম্প নয়তো লংজাম্প। রপর অমির মত হাড়গোড় ভাঙা দ হয়ে বাড়ি বসে থাকবি।'

এই সব শুনতে শুনতে আমি সুমির খাতায় সই দিচ্ছিলাম। ওপরে খলাম, 'অন্ধকার কি জানার জন্যে অন্তত একবারও ফুঁ দিয়ে আলো নেভানো চত।' এটাই আমার বেদবাক্য। অটোগ্রাফে কেউ কিছু লিখে দিতে লে এই লাইনটা আমি লিখবই। লিখে আবার অস্বস্তিতে পড়ে যাই। হাই, এ যেন একটা প্ররোচনা দেওয়া! অথচ সে মুহূর্তে ওই মুখস্থ বাক্যটাই বায় এসে যায়, নাপিত দেখলে যেমন কারো-কারো নাকি নখ বেড়ে যায়!

ওদিকে বাবার কথা শুনে বুঁচি খিলখিল করে হাসছিল। কবির মেজাজ ার হাল্কা হয়েছে বোঝা যাচ্ছিল। সুমি আমার মাথার পিছনে ঝুঁকে তার

খাতায় লেখা দেখছিল যতক্ষণ, কানে ও চুলে তার চাপা প্রশ্বাসের ঝাপটা লাগছিল। সে একটু সরে গেলেও সেই জায়গাগুলো সুড়সুড় করছিল। কি তার দিকে না ঘুরেও টের পাচ্ছিলাম, সে তখনও সেই বাক্যগুলো অনবর মনে মনে পড়ে যাচ্ছে। মানে বোঝার চেষ্টা করছে নিশ্চয়। মানে বোঝ তার বয়সী শিক্ষিতার পক্ষে খুবই সোজা। তবু হয়তো ওর বিস্ময় জেগেছে কেন ওকথা লিখে দিলাম ওকে! ব্যাপারটা কি খারাপ ভাবে নেবে সুমি আমি অস্বস্তিতে পড়ে থাকলাম। সেই সময় কবি আচমকা হাঁক দিলেন, 'এ্যা সুমি, দেখি তোর খাতাটা!' আর ব্যস, ভয়ে আমার হৃৎপিণ্ডে খিল ধরে গে প্রায়।

সুমি বলল, 'ও তুমি কী দেখবে?'

কবি ঘোলাটে চোখে তাকিয়ে হুঙ্কার দিলেন, 'দে বলছি!'

'ও তুমি বুঝবে না।'

কবি খাট নাড়া দিয়ে চেঁচালেন, 'আমি বুঝব না—তুই বুঝবি? বোবা কথা বোবায় বোঝে, তা জানিস? কবি হয়ে আমি বুঝব না, তুই বুঝবি?'

অগত্যা বিরক্ত মুখে সুমি খাতাটা ছুঁড়ে দিল। কবি সেটা আলোর দিকে ধরে তাকিয়ে থাকলেন মিনিট দুই। ঘরে ও বাইরে তখন কোন শব্দ নেই— পৃথিবীর ঘড়ির কাঁটা থেমে গেছে যেন। আমি একটা বিস্ফোরণ আশ করছিলাম।

কিন্তু না, তেমন কিছু ঘটল না। কবি আমার দিকে হাসিমুখে ঘুরলেন আমি থতমত খেয়ে বললাম, 'আপনি খালি চোখে এখনও দেখতে পান! বাঃ

কবি মাথা দোলালেন।…'তা আপনি যা লিখেছেন, বুঝলেন মশাই…'

বাধা দিয়ে বললাম, 'আমি আপনার ছেলের বয়সী। আমাকে 'আপনি' বলছেন কেন?'

''তুমি' বলব? বেশ।'

কবি দেখলাম, একটা বিশেষ পর্দায় কথা বললে দিব্যি স্পষ্ট সব শুনতে পান আমি মাথা দোলালাম।…'নিশ্চয় বলবেন।'

কবি বললেন, 'তুমি যা লিখেছ—আশ্চর্য, সারাজীবন আমি তাই লিখেছি অন্ধকার লিখেছ তুমি, আমি লিখতাম পাপ। মাঝে মাঝে স্বেচ্ছায় পাপ কর ভাল। বোস, তোমাকে সেগুলো পড়ে শোনাই। বুঁচি, মা, খাটের নিচে থেকে তোরঙ্গটা বের কর তো!'

ই সেরেছে! এবার বুড়োর পদ্য শুনতে হবে। অমু আমার দিকে কাচু-মুখে তাকাল। আমি সুমির দিকে তাকালুম। সুমির চোখে দুষ্টুমি করছিল। তোরঙ্গটা খাটে তুলে দিল বুঁচি। সেই সময় অমি চা নিয়ে ট্রেতে। কাপগুলো পরিচ্ছন্ন ও নতুন বলে মনে হল। অমি খাটের পাশে ট্রে রেখে নিঃশব্দে চলে গেল।

তারপর শুরু হল রীতিমত একটা কবিতার আসর। সে আসর শেষ হতে ঃ একটা বেজে গিয়েছিল।···

কবি জগমোহনের সঙ্গে এভাবেই আমার ভাব হয়ে গেল বলা যায়। তার ঃ পরদিন অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওঁর বাড়ি নেমন্তন্ন রাখতে হল—যার দরুন কলকাতা াতে বেশ দেরি হয়ে যায়।

সেদিন সকাল থেকে দুপুরে খাওয়ার সময় অবধি জোর কবিতাপাঠ ও কাব্য লোচনা হল। কবিতাগুলো ছেঁদো নয়, তা স্বীকার করাই ভাল। কবির জ্ঞান খুব টনটনে। কুমুদরঞ্জন-কালিদাস রায়ের অনুগামী জগমোহন মূলত ীপ্রাণ কবি। কিন্তু না—এসব শোনার জন্য আমি একটুও ব্যস্ত ছিলাম । কবি বলেছিলেন, বাগান বসিয়েছেন।—হ্যাঁ, সেই বাগানে ভ্রমণের গোপন নন্দ নিতেই যেন পা বাড়িয়েছিলাম। এ বাগানে তিনটি ফুল—খুব উজ্জ্বল হোক, সুগন্ধ তত থাক বা না থাক, কোথায় কী যেন রহস্য থমথম করছিল দের পাপড়ির নিচে। যেমন প্রথমে বুঁচির কথাই ধরা যাক। ওর ভাল য় নমিতা। কাল রাত একটায় যখন ও-বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছি, াকে ও পিছু ডেকে ফিসফিস করে কী বলেছিল। তারপর অমু পকেট ক কী একটা দিতেই ও দৌড়ে ঘরে গিয়ে ঢুকল। অমুকে জিগ্যেস করলে নছিল, 'ও কিছু না।'

তারপর সকালে যখন আমি ও-বাড়ি গেলাম, মিউনিসিপ্যালিটির য়ারম্যানের ছেলে দেবুকে দেখলাম ভিতরে অমির সঙ্গে গল্প করছে। একটু র সে বেরিয়ে গেল। কবি তখন কবিতা পড়ায় ব্যস্ত। চোখ তুললেন না।

দুপুরে খাওয়ার পর সুমি হাত ধোবার জায়গায় হঠাৎ চুপি চুপি আমাকে ন বসল, 'ফুঁ দিয়ে আলো নেভাতে বলেছেন—কিন্তু আপনি নিজে কখনও কি ভয়েছেন?'

সে আমার হাতে জল ঢালছিল। খানিকটা জল এসময় ছলকে ওর কাপড়ে গিয়ে লাগে। আমি সেই নিয়ে হাঁ হাঁ করে ওঠায় জবাবটার ব্যাপারে পাশ কাটানো সম্ভব হয়।

এই তিনটে প্রসঙ্গ একসঙ্গে আমার মগজে ঘুরপাক খাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, আলো নিভিয়ে অন্ধকারের স্বাদ কি সুমি কখনও নেয় নি? হয়তো ওকে আমি খুঁচিয়ে সচেতন করে দিয়েছি বড় জোর। তাই ও যেন অস্থির হয়ে পড়েছে। আর বড়বোন অমিতা এমনিতেই গম্ভীর স্বল্পভাষিণী মেয়ে। সবসময় একা ভিতরের ঘরেই কাটাচ্ছে। সংসারের ঝক্কি একা সে সামলায় দেখছিলাম। বুঁচি আমাকে বার বার অমুর কথা জিগ্যেস করছে। অমু নিশ্চয় এসে যাবে। যাই হোক, বাগানের মালী ভদ্রলোক অর্থাৎ কবির অগোচরে অন্ধকারের দাঁত ক্ষয়ের দাগ কেটে এ বাড়ির ভিত আলগা করে ফেলছে, তাতে আমার সন্দেহ নেই।

জগমোহন অসুস্থ মানুষ। খাটে বসেই একা খেলেন। তারপর ভিতর থেকে আমি খেয়ে এলে বললেন, 'বলছিলাম কী, এখন ট্রেন ধরলে কলকাতা পৌঁছতে তো রাত্রি হয়ে যাবে। বরং আজ থেকেই যাও, বাবা। কাল ভোরে ট্রেনে যাবে। কেমন?'

বুঁচি উৎসাহে অধীর হয়ে বলল, 'হ্যাঁ দাদা, তাই থেকে যান।'

আমি বললাম, 'না না—অনেক কাজ আছে। ক্ষতি হয়ে যাবে।' অথচ ভিতর থেকে একটা প্রতিবাদ উঠে আমার কণ্ঠস্বরকে দুর্বল করে ফেলল।

কবি বললেন, 'কোন কথা শুনব না! আজ রাত্রিবেলা এক অদ্ভুত কাণ্ড হবে—বুঝেছ? তোমাকে নিয়ে চলে যাব—সোজা নদীর চড়ায়। জ্যোৎস্না আছে চমৎকার। আহা, নদীর বালিতে বসে কাব্যচর্চার মত সুখ আর কিছুতে নেই।'

অগত্যা থাকতে হল। কাব্য আলোচনা নিয়ে আমার মাথাব্যথা কোনকালেই নেই। কবির বাগানের গভীর রহস্যে তলিয়ে যাবার সাধ আরো প্রবল হল এই যা। মন্দ কী, যদি পেয়ে যাই কোন উপন্যাসের থিম।

কথা বলতে বলতে কবি চিৎ হয়ে নাক ডাকাতে থাকলেন। ভিতর থেকে অমি বলল, 'ওঁকে জিগ্যেস কর তো বুঁচি, শোবেন নাকি। শুলে বিছানা করে দে।'

খাওয়ার পর ঘুমোনো অভ্যাস আছে। বুঁচি বিছানা করে দিয়ে বেরোল।

তারপর স্মি এসে মেঝেয় একটু তফাতে বসল। একটু হেসে বলল, 'সত্যি ঘুমোবেন, নাকি একটু ডিসটার্ব করব?'

'না—না। ডিসটার্ব আর কী! বলুন না, কী বলবেন।'

'আচ্ছা, আপনারা যা সব লেখেন, সত্যি ঘটনা—না বানানো?'

লেখকদের প্রতি সেই চিরকেলে প্রশ্ন। হেসে বললাম, 'আপনার কী মনে হয় শুনি?'

'বানানো।'

'তাহলে তাই।'

'কেন—সত্যি ঘটনা লেখেন না কেন?'

'পাচ্ছি কোথায় বলুন? পেলে তো লিখি।'

'আমি একটা দিতে পারি। কিন্তু…'

'কিন্তু কী?'

একটু ইতস্তত করল স্মি। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াল। তারপর অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনাকে তাহলে দশটা টাকা দিতে হবে!' এবং বলার পর চাপা হেসেও ফেলল।

বললাম, 'এ আর কী! দেব!'

'উঁহু—আগে দিন। তারপর বলব।'

আমি রসিকতা ভেবে একটুখানি বোঝাসুঝি করলাম। কিন্তু স্মি সত্যিসত্যি টাকা না পেলে সত্যি ঘটনাটা বলবেই না। তখন ব্যাগ বের করে একটা দশটাকার নোট ওর দিকে এগিয়ে দিলাম। মুহূর্তে আমাকে তাজ্জব করে ও টাকাটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে ব্লাউজের ভিতরে লুকিয়ে ফেলল। এসময় ওর মুখের রংটা কেমন চাপা দেখাল, শ্বাসপ্রশ্বাসও দ্রুত হচ্ছিল, যেন নার্ভাস হয়ে পড়েছে ও।

এবং আমিও। ব্যাপারটা যে মোটেই রসিকতা নয়, টের পেয়ে গেছি।

কিন্তু চট করে সেটা সামলে নিয়ে বললাম, 'তাহলে বল তোমার সত্যিকার ঘটনা।'

স্মি সাদা মুখে একটু হাসল।…'মুখে বলতে লজ্জা করবে। আমার খাতায় সব লেখা আছে। খাতাটা আপনাকে দিচ্ছি।'

সে উঠে দাঁড়াল। তারপর বাবার খাট ও ভিতর ঘরটা দেখিয়ে ঠোঁটে আঙুল রেখে বলল, 'যেন কাকেও বলবেন না।'

তক্ষুনি একটা পাতলা ছেঁড়াখোঁড়া এক্সারসাইজ বুক এনে আমার হাতে গুঁজে দিল সে। তেমনি রুদ্ধশ্বাসে বলল, 'খবর্দার। এখানে নয়! আপনার ব্যাগে রাখুন—ফিরে গিয়ে পড়বেন।'

খাতাটা আমি চোরের বমালের মত ভারি হাতে নিলাম। ব্যাগে ভরে ফেললাম। আমার নার্ভাসনেসটা বেশ বেড়ে গিয়েছিল। ব্যাগে রাখার পর দেখি সুমি পা টিপে টিপে বেরিয়ে গেল। ভাতঘুমটা পণ্ড হয়ে গিয়েছিল—আর এল না। খাতাটা খুলে দেখার জন্য তীব্র কৌতুহল হচ্ছিল। চোখ বুজে পড়ে থাকলাম। সুমির টাকা নেওয়ার কারণটা কী? কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলাম না। ক্রমশঃ আমার মাথায় কী সন্তর্পণ একটা ইচ্ছা কিংবা লোভ জেগে উঠল। তাকে কি পাপ বলব? মনে হল, আমি একটা নিষিদ্ধ জায়গায় ঢোকার জন্যে খুব গোপনে গুড়ি মেরে এগোচ্ছি।···

বিকেল হতে না হতে কবি জগমোহন বুঁচি ও সুমির সাহায্যে একটা শতরঞ্চি, সেই ছাপানো বই এবং কবিতার পাণ্ডুলিপি বোঝাই বাক্স আর একটা হারিকেন নিয়ে বেরোলেন। লাঠি হাতে খুব আস্তে হাঁটছিলেন ভদ্রলোক। অমু নামে ছেলেটির আর পাত্তা পেলাম না। কিংবা ওদের ক্লাবের কেউ আর খোঁজখবর নিল না আমার। সেটাই হয়তো স্বাভাবিক ছিল।

গ্রীষ্ম বলে নদীতে জল তেমন নেই। মাঝামাঝি একফালি তিরতিরে হালকা স্রোত বইছে, পায়ের তলাটা তাতে ভেজে মাত্র। সোনালি বালির চড়ায় কবি তাঁর সম্পত্তি নিয়ে বসলেন। তারপর মেয়েদের বললেন, 'মাঝে মাঝে আমাদের চা দিয়ে যাবি। আর—খবর্দার, ঘর ছেড়ে এক পা-ও নড়বিনে। হাড় ভেঙে দেব তাহলে। সাবধান।'

সুমি আর বুঁচি আড়ালে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে হাসতে হাসতে চলে গেল। তারপর শুরু হল কবির কবিতাপাঠ। আমি সিগ্রেট খাচ্ছি (কবির হুকুম নেওয়া হয়েছে) আর নিসর্গদৃশ্যে চোখ রেখেছি। মন পড়ে আছে কবির বাগানের তিনটি ফুলের দিকে। কোন পাপবোধ আর টের পাচ্ছি না। শুধু মনে পড়ছে, সুমি আমার কাছে দশটা টাকা নিয়েছে।

হয়তো আমাদের মনে এক স্বার্থপর কৃপণ বিষয়ী বুড়ো আছে। নাকি এক কুকুর আছে, যার নাকে টাকাপয়সার ঘ্রাণ মাংসের চেয়ে তীব্র। ঘুরে ঘুরে

শুধু মনে পড়ছে নোটটাকে। এ কি আমার জিত হল, না হার? সুমি কি কাল আমাকে?

ইতিমধ্যে বার দুই সুমিরা চা এনে দিয়েছিল। হাতের রেখা সন্ধ্যার অন্ধকার খন মুছে দিল, কবি হারিকেন জ্বাললেন। অবশ্য পিছনে চাঁদ উঠছিল। দীর বুকে খোলামেলায় হুহু হাওয়া বইছিল। শরীর আরাম পাচ্ছিল প্রচুর, কিন্তু মনে অস্থিরতা—বাগানের ফুলগুলো দুলছিল আর দুলছিল। এবং াত্রির আদিমতা তাদের গন্ধকে হাজারগুণ বাড়িয়ে দিচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, াগানের পক্ষে এমন আগড়হীনতার অবাধ সুযোগ কখনও আসে নি, তাই খানে ষড়যন্ত্র চলেছে কিসের।

একসময় হঠাৎ কোত্থেকে একটা দমকা বাতাস এসে হারিকেনটা নিভিয়ে দল। কবি অস্ফুট কাতরোক্তি করলেন, 'ওই হল তো!' তারপর ঘাড় ুরিয়ে চাঁদ দেখে বললেন, 'গ্রীষ্মের জ্যোৎস্না বড্ড ধোঁয়াটে। শরৎকাল হলে দব্যি পড়া যেত। তবে এখন কিছুক্ষণ বাস্তব কাব্য চাক্ষুষ করা যাক। কী বল?'

উনি বিড়ি জ্বাললেন। তারিয়ে তারিয়ে টান দিতে দিতে ফের বললেন, দেখছ? কী সুন্দর দৃশ্য! চাঁদ, জ্যোৎস্না, নদীর স্রোতে কেমন ঝিকিমিকি, াহা! পৃথিবী যে এত সুন্দর, এত চমৎকার জায়গা—শালারা টের পায় না, টাই আশ্চর্য। এইসব সময় শহরের শালারা কী করে জান? সব মালফাল খেয়ে দমাইসি করে বেড়ায়। আর বোল না বাবা। আমি একসময় পাপকে ছুঁয়ে দখতে বলতাম, আজ পাপ এখানে আষ্টেপিষ্টে বানের জলের মত ঢুকে গেছে। াকে বিশ্বাস করব? কাকে শ্রদ্ধা করব—স্নেহ করব? সব মুখোশ পরে ুরে বেড়াচ্ছে। সব ব্যাটা ঠক, জুয়াচোর, মতলববাজ। মেয়ে তিনটিকে যে ী কষ্টে দুহাতে আগলে রেখেছি, কহতব্য নয়। সবসময় ছোকরাগুলো হানা দবার তালে থাকে। আমি একটাকেও বাড়ির ত্রিসীমায় পা বাড়াতে দিই ন। অবশ্যি, দুএকজনের কথা আলাদা। তারা আমাকে সত্যিকার শ্রদ্ধা রে বলেই পাত্তা দিই।'

কবির এসব কথা শুনছিলাম, কিংবা শুনছিলাম না। শুধু মনে হচ্ছিল, বির বাগানে এই জ্যোৎস্নারাত্রে কি জীবনের সেই সাদা তেজী বল্গাছাড়া ঘাড়াগুলো ঢুকে পড়েছে?

কিন্তু একটা কিছু বলা উচিত বলেই মুখ খুললাম।...'না, না। আপনাকে খানে সবাই কবি বলে খুব শ্রদ্ধা করে দেখলাম।'

'কী দেখলে ?'

'শ্রদ্ধা করে সবাই।'

কবি জ্যোৎস্নায় মুখ উঁচু করে হাসলেন, 'কচু! সব আমার বাগানে দিকে চোখ রেখে কথা বলে। তুমি জান না, মেয়ে তিনটে না থাকলে কো শালা কি ভুলেও আমার নাম মুখে নিত? ও আমি বেশ জানি। সারাদি শালারা এসে জালাতন করার তালে থাকে। জন্মদিনে ফুল-টুল নিয়ে আসে সন্দেশও আনে। কিন্তু আসল ব্যাপারটা কী, আমি জানিনে? এই সেদি একদল এসে বললে, আপনার বই বের করব—কবিতাগুলো দিন। আমি তক্ষুনি ভাগিয়ে দিলাম। বুঝলে কি না—ওই ছিলে আমার বাগানে ঢোকা মতলব! থুঃ থুঃ! সব পচে ভুটভুট করছে বাবা। এ এক অভিশপ্ত শহর সেজন্যেই তো ওই কবিতাটা লিখেছি:

বাগানে আমার ফুটিয়াছে ফুল
করিয়াছে রূপে আলো
গন্ধে মাতিল চৌদিক তাই
আসিছে ভ্রমর কালো।'

কবিতাটা বলার পর হঠাৎ 'আসছি' বলে লাফ দিয়ে উঠলেন জগমোহন লাঠিটা নিয়ে নড়বড় করে পা বাড়ালেন। ব্যস্ত হয়ে বললাম, 'কী হল হঠাৎ?'

'আসছি। তুমি বোস তো বাবা!' বলে উনি জ্যোৎস্নায় কেমন হন্তদন্ত হয়ে এগোতে থাকলেন। আমার ভয় হল, পাড়ে ওঠার সময় আছাড় খেয়ে না পড়েন।

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে আছি। তারপর কবির ভাঙা গলায় চিৎকা শুনতে পেলাম। কিছুটা দূরে মেয়েদের নাম ধরে ডাকাডাকি করছেন। আমি আর বসে থাকা সঙ্গত মনে করলাম না। সব পড়ে রইল। এগিয়ে গেলাম কিন্তু কাছাকাছি কোথাও দেখতে পেলাম না ওঁকে। হতভম্ব হয়ে ওঁর বাড়িতে গেলাম। কিন্তু বাড়ি একেবারে আলোবিহীন। একটা পোড়ো হানাবাড়ি মত দেখাচ্ছে। ভয় হল, অশরীরি ভূতগুলো আমাকে পেয়ে বসবে।

না—সারা শহর অন্ধকার, অর্থাৎ ইলেকটিরি ফেল যাকে বলে। তবে অন্ধকা বলা ভুল, জ্যোৎস্নায় ভাসছে শহরটা। তাকে ধূসর কবরখানা দেখাচ্ছে। কবি বাড়ির দরজায় ডাকলাম, 'সুমি, সুমি!' কোন সাড়া পেলাম না। ব্যাপার কী কোথায় গেল সব?

আস্তে আস্তে আবার নদীর দিকে গেলাম। চড়ায় নামবার সঙ্গে সঙ্গে কাকে দৌড়ে আসতে দেখলাম। একি গোলমেলে ব্যাপার হচ্ছে? অস্ফুট স্বরে বলে উঠলাম, 'কে?' অমনি মূর্তিটা আমার দিকে এগিয়ে এল।

ঠাহর করে দেখি, ঝুমি! সে হাঁপাচ্ছে। আমাকে দেখে রুদ্ধশ্বাসে বলল, বাবা ডাকছিলেন না? কই?'

'কী ব্যাপার বল তো তোমাদের? কোথায় ছিলে?'

ঝুমি হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'ওইখানে—বেড়াতে বেরিয়েছিলাম।'

'ঝুমি!'

'আমি যাই! বাবা ক্ষেপে গেছে।'

'ঝুমি, শোন!'

'আঃ, যা বলবার, তাড়াতাড়ি বলুন।'

'খুঁচি, তোমার দিদি—ওরা সব কোথায়?'

'কেন? বাড়িতে নেই?'

'না।'

'তাহলে বেড়াতে বেরিয়েছে। আমি যাই!'

আমার সেই চাপা লোভ এতক্ষণে আচমকা বেরিয়ে পড়ল। প্রচণ্ড ঠকারিতায় ওর একটা হাত ধরে ফেললাম। ঝুমি একটা অদ্ভুত লাস্য দেখিয়ে আমার বুকে ভেঙে পড়ার ভঙ্গীতে ছিটকে এল।...'আঃ, কী হচ্ছে? বাবা এসে পড়বে যে!'

অবশ্য ঝুমিকে আমি চুমু খেতে পারতাম, কিংবা...কিন্তু পরমুহূর্তে কী একটা ঘৃণা, নাকি আক্রোশ, নাকি অসহায়তা, আমাকে আড়ষ্ট করে ফেলল—মাথায় বাড়ি মারার মত আঘাতে নেতিয়ে দিল। কবির বাগানের এই লটিকে জ্যোৎস্নার রাতে খুব ধূসর পুরনো একটা বাতিল জিনিস মনে হল। তাছাড়া, আলো ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে অন্ধকারের স্বাদ পাবার মত সাহসী ও ঝুঁকি নেওয়ার মত পুরুষ হয়ত নই। যা খাতায় লিখেছি, তা নিছক বাণী। হাত ছেড়ে দিলাম। ঝুমি চলে গেল।

অন্যমনস্কভাবে হাঁটছিলাম। সেই জায়গাটা এখন খুঁজে পাওয়া কঠিন হল দেখছি। খুঁজতে খুঁজতে একখানে গিয়ে দেখি, কে একজন চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। কবি জগমোহন! কাছে গিয়ে বললাম, 'আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি! কী ব্যাপার? এখানে কী করছেন?'

কবি কোন জবাব দিলেন না। তখন দেখি. আশ্চর্য, ভদ্রলোক চুপচা' দাঁড়িয়ে এখানে কাঁদছেন।

কী বলা উচিত, মাথায় এল না। শুধু ডাকলাম, 'কবি!'

জগমোহন মুখ ফেরালেন!...'কী বললে? কবি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

জগমোহন আস্তে আস্তে বললেন, 'হ্যাঁ—কবিই বটে। কবি ছাড়া প্রে: ভালবাসাকে আর কে-ই বা শ্রদ্ধা করবে? আমি প্রেমকে খুব বড় মূল্য দিই বুঝলে বাবা? কিন্তু না না—যা ঘটছে, তা তো প্রেম নয়, মোহ—রক্তমাংসে: লোভ। তা কুৎসিত। তা পাপ। আশ্চর্য, আমিই শখ করে বলতাম. পাপকে মাঝে মাঝে ভালবাসতে হয়। অথচ বাস্তবে তা আজ সইতে পারলাম কই' এখন জানলাম, শুধু মিথ্যের বোঝা নিয়ে আমরা জীবন কাটাই। সেখানে একরাশ বাজে বুলি মাত্র। তা না হলে কেন একাজ করে বসলাম? কেন আমি অমিকে—ও হো হো!'

হঠাৎ দুহাতে মুখ ঢেকে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন জগমোহন। ভাঙ্গা গলায় ফের বলে উঠলেন, 'ওঃ, অমি—আমার বাগানের সেরা ফুল! তোমরা আমাকে ফাঁসি দাও।'

বিকট এই চিৎকার। কিন্তু নদীগর্ভে উদ্দাম বাতাসের দরুন দূরে কেউ হয়তো শুনতে পাচ্ছিল না। ওঁকে সামলানো উচিত ভেবে আমি যখন ওঁর হাত ধরলাম, তখনই দ্বিতীয়বার চমক খেলাম। ওঁর সাদা পাঞ্জাবির হাত জুড়ে এবং হাতে থকথকে বা চিটচিটে কিছু লেগে রয়েছে। পরক্ষণে ওঁর পায়ের কাছে চোখ গেল। অমনি জ্যোৎস্নায় ঝকমক করে উঠল একটা লম্ব বাঁকানো কিছু...তা যে ইস্পাতের কোন ধারালো অস্ত্র, বুঝে নিতে একটুও দেরী হল না। গলার স্বর চাপা হয়ে গেল আমার। রুদ্ধশ্বাসে বললা... 'আপনি কাকে খুন করে এলেন জগমোহনবাবু?'

কবি জগমোহন রক্তাক্ত হাতে নাক ঝেড়ে বললেন, 'অমি—অমিকে!'

—

কাঁটলে ঘাটের বুড়োবাবু

হুজুর পাটনীর ফুটফুটে সুন্দর মেয়েটাকে এই সেদিনও রেললাইনে কয়লা কুড়োতে দেখেছেন আদিনাথ। খালি গায়ে ছেঁড়া হাফপেণ্টুল পরে ঘুরত। সব সময় নিচের দিকে চোখ, সামনে বা পিছনে হুইসল দিতে-দিতে কালো রঙের সর্বনাশটা এগিয়ে আসছে, সে খেয়াল নেই। স্টেশনঘরের উঁচু বারান্দা থেকে আদিনাথ বাঁজখাই চেঁচাতেন—এ্যাই! এ্যাই!

আদিনাথের এটা অভ্যাসে দাঁড়িয়েছিল। রেললাইনের দিকে চোখ পড়লে প্রথমে ওই মেয়েটাকেই খুঁজতেন। আর চাঁদঘড়ি খালাসি সিগন্যালের হাতল হ্যাচকা টানে নামালে সেই শব্দে আদিনাথ চমকে উঠতেন। প্রায় গেল-গেল ভঙ্গীতে বেরিয়ে এসে আপ-ডাউন ডাইনেবাঁয়ে ঘুরে সিংহাবলোকন করতেন। ছোটবাবু অর্থাৎ এ এস এম শিবশম্ভু বলতেন—বড়বাবুর খুলির ভেতর গণ্ডগোল আছে।

মেয়েটা কা আনমনা ছিল ভাবা যায় না। কিন্তু তার চেয়েও লক্ষ্য করার ব্যাপার আদতে ও কুড়োত কী? আদিনাথ নিচু প্ল্যাটফর্মে এদিকওদিক দৌড়াদৌড়ি করে ডবলিউ টি পাকড়াতে গিয়ে আড়চোখে দেখতেন ছোট্ট ঝুড়িতে কয়লা আছে নামে মাত্র—খালি রঙীন কাগজের টুকরো, বাতিল টিকিট আর সিগারেটের রাংতা কিংবা ছেঁড়াফাটা প্যাকেট। বাড়ি ফিরে বাপের কাছে নিশ্চয় ঠেঙানি খায়। আদিনাথ ভাবতেন। খাওয়া উচিত বই কি। ভাগ্যচক্রে আদিনাথ স্টেশনমাস্টার না হয়ে পারঘাটার হুজুর পাটনী হয়ে জন্মালে কী রামপেঁদানি পেঁদাতেন চুলের ঝুঁটি ধরে, ভাবতে হাত নিশপিস করে এবং তাঁর রোগা রুখোসুখো শরীর সিঁটিয়ে যায়। কচি খুকীটি তো নয়। ধিঙ্গি হয়েছে রীতিমতো। কদমতলায় বসে গ্যাংম্যানরা আজকাল চোখ নাচিয়ে পাথরকুচি ছোড়ে বুকের দিকে। আদিনাথ তাও লক্ষ্য করতেন। সামনে এলে ধমক দিতেন, ভাগ! ভাগ এখান থেকে। ভাগ বলছি।

পাটনীর মেয়েটা তাঁকে গ্রাহ্যই করত না। পারঘাটায় কখনও গেলে আদিনাথ হুজুরকে শাসাতেন—তোমার মেয়েটা কবে চাকার তলায় যাবে হুজুর। ওকে বকে দিও। তো যেমন মেয়ে, তেমনি তার বাপ। হলুদ দাঁত বের

করে হুজুর পাটনী বলত—ভাববেন না মাস্টেরবাবু। সেদিকে বড্ড সেয়ান আপনাদের আশীর্বাদে।

কিন্তু কিছুতেই বলতে পারতেন না—মেয়েটাকে একটা ফ্রক-ট্রক কেন কি দাও না হে? আসলে এদিককার রকমসকমই আলাদা। ধিঙ্গি-ধিঙ্গি গেঁয়ে মেয়েদের খালি গায়ে ঘুরে বেড়াতে দেখেছেন। মেঘে মেঘে বেলা বেড়েছে সে-হুঁশ তাদের নিজেদেরও নেই, বাপমায়েদেরও নেই। অথচ্যে ক অক্ষ গোমাংস ভূতপেবেতের জায়গা। টিকিট কিনতে পর্যন্ত দরাদরি করে অনেকে ভাবা যায়? আদিনাথ কত ছোট-বড় স্টেশনে থেকেছেন, এমন স্টেশন থাকতে পারে কল্পনাও করেন নি।

লুপলাইনের এ স্টেশনটা সদ্য হয়েছে। আগে ছিল হল্ট। এলাকার জনপ্রতিনিধি যেন আসলে রোয়াব দেখাতেই খোদ দিল্লিকে সাধাসাধি করে নাকি এই কাণ্ডটি বাধিয়ে বসেছেন। এক পয়সা আয় নেই রেলের। ভাগ্যে ভোগায় যাত্রী জোটে কদাচিৎ দু-চারজন। সেও মামলাবাজ, নয়তো ছানার কারবারী জনাতুত্তিন ঘোষের পো। তবে হ্যাঁ, অ্যাস্ত যাত্রী যাই জুটুক, এবেলা ওবেলা মড়া-যাত্রী জুটবেই জুটবে। ট্রেন আসতেই বেমক্কা আচমকা ফাটানো চেঁচানি শোনা যাবে—বলো হরি। হরিবোল। বলো হরি। হরিবোল।

প্রথম-প্রথম ভড়কে যেতেন। পরে ঠাহর হয়েছিল ওই তো পেছনে শ্মশানঘাট গঙ্গার পাড়ে। তার পাশে পারঘাটা। কাজেই কাঁটালেঘাট নামে গণ্ডগোল নেই। কিন্তু বলিহারি রেলের বাকচাতুরী! হলুদবোর্ডে লেখা আছে: কাঁটালিয়াঘাট রোড! আদিনাথ এসেই এদিক-ওদিক হাতড়ে রোড খুঁজে না পেয়ে অবাক হয়েছিলেন। পরে শুনেছেন, সত্যি সত্যি একটা রোড আছে। তবে সেটা মা-গঙ্গা পেরিয়ে কমপক্ষে এক ক্রোশ অড়হরক্ষেত, পাটক্ষেত আখের ক্ষেত একটা মজাহাজা ঝিল ইত্যাদি পেরিয়ে গেলে দেখতে পাওয়া যাবে। কিন্তু সেও এক ধাঁধা। ওটার সরকারী নামে মোটেও রোডটোড এমন ফালতু শব্দ নেই। ওটা হল গে ন্যাশনাল হাইওয়ে নং চৌত্রিশ! দুচ্ছাই! আদিনাথ দুঃখে হেসেছিলেন। সত্যি বড় আজব জায়গা এই কাঁটালেঘাট। এখানে নাকি সবাই মড়া। চাঁদঘড়ির কাছে শোনা কথা—কাঁটালেঘাট যাচ্ছি বললে লোকে ফিক করে হেসে বলবেই বলবে বালাই ষাট! এই বয়েসে? রেলের কলিগদের সঙ্গে দেখা হলে তাই আদিনাথও হাসতে-হাসতে বলেন—কাঁটালেঘাটের মড়া হয়েছি। মড়ার আবার ভালমন্দ থাকা কী!

আদিনাথ বরাবর কিঞ্চিৎ নীতিবাগীশ মানুষ। তাই এখানে এসে বিস্তর চোট খেয়েছিলেন এবং কালক্রমে সামলে উঠেছিলেন। পরে আর রাতের দিকের গাড়ি এলে একচোখো লণ্ঠনের আলোয় প্ল্যাটফর্মের দু মুড়ো দৌড়াদৌড়ি করে পা খুঁজে বেড়াতেন না। বলতেন—আমি কি পক্ষিরাজ ঘোড়া যে মাঠজঙ্গল ভেঙে ডবলিউ টির পেছনে উড়ব? ওসব শিবশম্ভু কিংবা চাঁদঘড়ি পারে তো করুক। চাঁদঘড়ি খালাসি পুরনো লোক। সে ওসবে নেই। একদঙ্গল শুওর নিয়েই ব্যস্ত। লাইনের ওপাশে নয়ানজুলির জলেকাদায় রাত-দুপুরেও চিলেচেঁচানি শোনা যেত—যা চাঁদঘড়ির, না তার শুওরের, আদিনাথ বুঝতে পারতেন না। আর শিবশম্ভু নতুন বিয়ে করেছে। নতুন কোয়ার্টারে নতুন বউ। তাকে গণ্য করেন না আদিনাথ।

কাজকর্ম কম। হাতে অঢেল সময়। নিঃঝুম খাঁ খাঁ স্টেশন। কাছাকাছি বসতি নেই। থাকবার মধ্যে একটু তফাতে ওই মাগঙ্গার পারঘাটার ধারে কয়েকটা কুঁড়েঘর। কাঁটিলে গ্রামটা বেশ দূরে। পারঘাটার ওপাশে শ্মশানেও একটা আটচালা আর টালির ঘর আছে। শ্মশানের ঘাটবাবুর আখড়া। আদিনাথ গঙ্গাস্নানে কিংবা অবরেসবরে গিয়ে ওদিকটায় ঘোরাঘুরি করে আসতেন। নেই কাজ তো খই ভাজার মতো যা কিছু চোখে পড়ত খুঁটিয়ে দেখতেন। লোক দেখলে যেচে আলাপ করতেন। এবং এই করতে করতেই মন বসে গিয়েছিল এখানে। অভ্যাসে সব সয়। কিন্তু তার চেয়েও অদ্ভুত ব্যাপার, নিজের অজান্তে আদিনাথ চুলদাড়ি ছাঁটা বন্ধ করে শেষটায় নিজের চেহারাকে সন্ন্যেসী করে তুলে ছিলেন। ঘাড় পেরিয়ে গিয়েছিল চুলের ধারা। দাড়ির ডগা নাইকুণ্ডল ছোঁয়া-ছোঁয়া অবস্থা হয়েছিল। আর এই দেখে লোকেরা তাঁকে বুড়োবাবু বলতে শুরু করেছিল। দেখাদেখি শিবশম্ভু কিংবা তার বউ মিনতিও বলেছে বুড়োবাবু। আদিনাথ মনে মনে রাগতেন। মুখে হাসতেন। কিন্তু শেষ অব্দি এমন কী হুজুর পাটনীর আনমনা ধিঙ্গি মেয়েটাও তাকে বুড়োবাবু বলে ডাকতে ছাড়ল না। প্রথম-প্রথম নিরাপদ দূরত্বে কাঁচুমাচু মুখে বলত—ও বুড়োবাবু, একটা টিকিট দাও গো!

আদিনাথ তাড়া করতে গিয়ে হেসে ফেলতেন।—এ্যাঁ? আমায় বুড়োবাবু বলছিস? আমি কি বুড়ো? ছাখদিকি, আমার চুল পেকেছে, না দাঁত ভেঙেছে?

আদিনাথ চুলের ডগায় স্প্রিং বানিয়েছিলেন শেষঅব্দি। সেই স্প্রিংগুচ্ছ

আলতো লম্বা আঙুলে তুলে এবং দাঁত দেখিয়ে বলতেন—এ্যাই বাঁদরমুখী! আমি কি বুড়ো?

মেয়েটার এককথা।—একটা টিকিট দাও না বুড়োবাবু!

আদিনাথ অগত্যা বলতেন—টিকিট? কী করবি টিকিট, শুনি?

মেয়েটা দূরের দিকে চঞ্চল চোখ রেখে বলত—হুই কাটোয়া যাব রেলগাড়িতে চেপে।—আমার খালা (মাসি) আছে।

আদিনাথ বলতেন—তা হ্যাঁ রে মেয়ে, রেলগাড়িতে কখনও চাপিসনি বুঝি?

মাথাটা জোরে দোলাত। রুক্ষু কটা রঙের চুল উড়ত গাঙ্গেয় বাতাসে। আদিনাথের মনটা নরম হয়ে যেত। এবং ঠিক এই সব সময় তাঁর খুলির ভেতর কিছু অদ্ভুত ইচ্ছে কিলবিল করে নড়ত। ওকে যদি একটা রংচঙে ফ্রক কিনে দিতে পারতেন! পরমুহূর্তে বেজায় লজ্জা পেয়ে ভাবতেন—আ ছি ছি! আমি কি কিছু খারাপ কথা ভাবছি? ধরো, আমি যদি বিয়েটিয়ে করেই ফেলতুম এবং একটা মেয়ের বাপও হতুম—হতুম কি না? তাহলে?

সবাই লক্ষ্য করত, কাঁটালেঘাট রোডের স্টেশনবাবু আপন মনে কী সব বিড়বিড় করেন। ঠোঁট নড়ে। দূরের দিকে তাকিয়ে কার দিকে ভ্রূ কুঁচকে যেন ধমক দেন নিঃশব্দে। আর চাঁদঘড়িও আড়ালে ছোটবাবু শিবশম্ভুকে বলত—আমাদের বুড়োবাবুর মাথায় ছিট আছে। তাই না ছোটবাবু? শিবশম্ভু বলত—সেটা এ্যাদ্দিনে বুঝলি তুই?

পারঘাটার দিকে গেলে লোকেরা আদিনাথকে দেখে কেন মুচকি হাসত, প্রথম প্রথম বুঝতে পারতেন না আদিনাথ। পরে টের পেয়েছিলেন। কিন্তু গ্রাহ্য করতেন না। আর তাঁকে দেখলেই হুজুর পাটনী বাঁশের মাচায় ছেঁড়া-খোঁড়া কম্বল ভাঁজ করে বিছিয়ে বলত—আসুন মাস্টেরবাবু। বসুন। গঙ্গাদরশন করুন। হ্যাঁ গো, আজ না কাল অমাবস্যে পড়বে বলুন দিকি?

হাসতেন আদিনাথ।—তুমি মোছলমানের পো। অমাবস্যা নিয়ে করবে কী হে হুজুর?

হুজুর কপালে জোড়া হাত ঠেকিয়ে বলত—আই বাপ রে বাপ! সে কী কথা গো মাস্টেরবাবু? ও হল গে শাস্তর। গঙ্গাপুজোর দিন বিষ্টিবাদলা হবেই লক্ষ্য করেছেন—না করেন নি? তারপরে মশাই রথযাত্রার দিন? ইদ্দিকে আকাশের অবস্থাটা দেখুন অনগ্রু করে। নামুতে যা ওপরে বাবা। যা শুকিয়ে

খটখটে হচ্ছেন। বাবার চোখে আগুন। হ্যাঁ গো, ই কলহ-খিচখিচি কবে মিটবে, সে কথাটাই তো জিগ্যেস করছি। ছিক্ষিত লোক। পাঞ্জি কী বলছে তাই বলুন দিকি ?

সেবার প্রচণ্ড খরা হয়েছিল বটে ! গঙ্গা শুকোলে হজুর পাটনীর রোজগার বন্ধ। এই অখদ্দে ঘাটে একে তো লোক পারাপার খুব কম। জল শুকোলে তার পক্ষে আরও বিপদ—টাকাগুলো গচ্চা। অনেক ধরে পাকড়ে ঘাটের ডাক পেয়েছে। ঘুষঘাষ সমেত ওর হিসেবে সাড়ে তেরোকুড়ি। হজুর কপাল চাপড়ে ফের হা হা করে হাসত—কবে দেখবেন কাঁটলেঘাটে জুটলে যা হয় তাই হয়েছি। পিঠে শকুন নিয়ে উবুড় হয়ে মাগঙ্গায় ভাসছি। এ হজুরকে আতভাই ছোঁবে না মাস্টেরবাবু।

আদিনাথ জিজ্ঞেস করতেন—কেন হে ? কী দোষ করেছ তুমি ?

—দোষ ? আকাশে চোখ তুলে পাটনী বলত। দোষ না করি, গোনাহ করেছি।

—বলই না বাবা, করেছটা কী ?

—সে আনেক কথা মাস্টেরবাবু। বলি কাকে, শোনেই না কে ? শোনাই খালি ওই মাগঙ্গাকে—তেনার দয়ায় কোনোগতিকে বেঁচে আছি। তেনার কোল না পেলে কবে মুখে লোহু (রক্ত) উঠে মারা পড়তুম।

এই সব বলে ফোঁসফাঁস করে নাক ঝাড়ত হজুর পাটনী। তারপর লম্বা-চওড়া কাঁচাপাকা গোঁফটা মুছে মাথার ফেট্টি ফের জড়িয়ে হাঁক দিত—ইরানী ! এ্যাই ইরানী ! একবার ইদিকে আয় তো বিটি !···

আদিনাথ বলেছিলেন—মেয়ের নাম ইরানী বুঝি ?

—আজ্ঞে হাঁ মাস্টেরবাবু। যিবারে কলাবেড়ের ঘাটে ছিলুম সিবারেই মেয়ের জন্ম হল। ঘাটের ওপর চটান ছিল। সিবার ওই চটানে একদঙ্গল হাঘরে ইরানী এসেছিল। জানেন তো ? ওনারা দাওয়াইপাতিয়া দেয়, হাত গুনতেও পারে। পোয়াতি বউটার হাত গুণে বললে, মেয়ে হবে। তা বললে বিশ্বেস করবেন না মাস্টেরবাবু···

—করব। করব।

—আজ্ঞে, ঠিকঠাক সেই মেয়েই হল। অবিকল ওনাদের মতন নাক মুখ চোখের গড়ন। দেখুন না—ভাল করে দেখুন। পাটনী ফের হাঁক দিয়েছিল—এ্যাই ইরি ! কথা কানে যায় না হারামজাদী ?

মেয়েটা খোলামেলা উঠোনটুকুতে বসে আছে দুপা ছড়িয়ে। লাউগাছের গোড়ায় রঙান সেই সব কুড়োনোবাড়ানো জিনিসপত্তর দিয়ে দোকান সাজিয়েছে। নাকি রঙের বাজার সাজিয়ে মুগ্ধ দৃষ্টে তাকিয়ে আছে? আদিনাথের চোখে পড়েছিল ব্যাপারটা। বলেছিলেন—আচ্ছা থাক থাক। দেখতে তো পাচ্ছি।

বিটির দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে বাপ বলেছিল—মোনে হয় না মাস্টেরবাবু? গায়ের অঙটাও দেখুন। নেহাৎ গরীব-গুরুবো ছোটলোকের মেয়ে তো? ওদেহাওয়ায় ঘোরে। দুবেলা দানাটা পানিটা জোটে না ঠিক মতো—তাই অঙটা পুড়ে গিয়েছে। আপনার বেক্ত দিষ্টি। দেখুন, ভাল করে দেখুন।

আদিনাথ আনমনে বলেছিলেন—হুঁউ দেখছি।

—মোনে হয় না মাস্টেরবাবু?

আদিনাথ তাকে বুঝি খুশি করতে চেয়েই একটু হেসে বলছিলেন, কেমন করে হল হে হুজুর? এ্যাঁ?

—সেটা এক গোহ্য কথা মাস্টেরবাবু।

—এ্যাঁ? গুহ্যকথা? বলো কী।

—আজ্ঞে, পোয়াতি মেয়েরা বিয়োবার ঠিক-ঠিক আগে যখন বেথা ওঠে, তখন যে মুখখানা ভাবে সেই মুখ নিয়ে ছন্তান জন্মায়। হুজুর তার গুহ্যতত্ত্ব চাপা গলায় জানিয়েছিল। মাস্টেরবাবু, ওনারা হাতটাত দেখে দাওয়াইপাতি দিয়ে পাঁচপা গিয়েছে না গিয়েছে, বেথা উঠল।

—তাই বুঝি?

হুজুর প্রায় চেঁচিয়ে একটু নড়ে বসেছিল।—হ্যাঁঃ পাঁচপা গিয়েছে না বেথা উঠেছে। আর মায়ের মোনে ত্যাখনও সেই আঙাপানা সোন্দর মুখখানা ভাসছে। এবারে হিসেব করুন। দুয়ে দুয়ে চার হল কি না?

—হল।

আদিনাথ হাসতে হাসতে উঠে এসেছিলেন। পরে মনে হয়েছিল, পাটনীর কথায় কিছু সত্য আছে বটে। সত্যি মেয়েটির চেহারা একটু অন্যরকম। এলাকার যা সব মুখের আদল, তার সঙ্গে মেলে না যেন। নাক মুখ চোখ, চুল, গায়ের রঙ। তারপর হঠাৎ চমকে উঠেছিলেন, হুজুর পাটনী যাযাবরদের একটা মেয়ে চুরি করে আনে নি তো? যাযাবরেরাই নাকি দল বাড়াতে ছেলেমেয়ে চুরি করে নিয়ে যায়। এক্ষেত্রে উল্টোটা হওয়া অসম্ভব নয়। আর ওই যে বলল,

পাপ বা গোনাহ করেছে বলে জাতভাই ওর মড়া গোরে দেবে না। ব্যাপারটা জানা দরকার।

সেই সময় একদিন কাঁটলে গ্রামের জহুর ব্যাপারী এল স্টেশনে। টিকিটের জানালার রডে নাক ভরে দিয়ে সে অভ্যাস মতো বলল—সালাম বুড়োবাবু। ডাউন গাড়ির লেট আছে নাকি?

জহুরকে দেখেই আদিনাথের মনে পড়ে গিয়েছিল হুজুর পাটনীর কথাটা। ডেকে বললেন—জহুর নাকি হে? কাটোয়া যাবে বুঝি? গাড়ির অনেক দেরি এখনও। এস, ভেতরে এস।

জহুর ব্যাপারী ভেতরে এল। আহ্লাদে গদ্‌গদ। এখানকার লোককে একটু খাতির দেখালেই গলে যায়। টুল দেখিয়ে আদিনাথ বললেন—বসো জহুর। খবর বলো।

তারপর একথা-ওকথার পর আদিনাথ পাটনীর কথা তুললেন।—হ্যা হে জহুর, পারঘাটার ওই হুজুরকে তো চেনো।

জহুর একটু হেসে মাথা নেড়ে বলল—খুব চিনি। টাকা পয়সা ধার দিয়েছেন নাকি? খবর্দার বুড়োবাবু। মহা হারামি লোক। মনে করুন, টাকা গঙ্গায় দিয়েছেন।

—না হে, না। হুজুর টাকাকড়ি চায় নি কোনোদিন। তো লোকটার বাড়ি কোথায় বলো তো?

জহুর ব্যাপারী নাকমুখ কুঁচকে বলল—ওর বাড়ি? কোথায় বাড়ি কী বিত্তোন্ত কে জানে? তবে শুনেছি, নিমতিতের ওদিকে কোথায় থাকত। হাঘরেদের একটা মেয়ে নিয়ে ভেগেছিল।। তারপর হিল্লিদিল্লি ঘুরে জান বাঁচিয়ে বেড়াত। হাঘরেরা তো সহজ লোক নয়। পেলে কলজেয় চাকু ঢুকিয়ে দেবে। তো ওই করে ছত্রিশঘাটে ঘুরে শেষে কলাবেড়ের ঘাটে নৌকায় মাঝি হয়েছিল। সত্যি মিথ্যে বলতে পারব না বুড়োবাবু, শুনেছি, কলাবেড়ের ঘাটে থাকার সময় মেয়েটা খুন হয়ে যায়।

আদিনাথ চমকে উঠেছিলেন—খুন? কে খুন করল?

—সেটা নাকি জানা যায় নি। তবে কলাবেড়েওলার সন্দ নেই হাঘরেরাই হয়তো এতদ্দিনে সুলুক-সন্ধান পেয়ে জাতনাশা মেয়েটাকে চাকু মেরে গিয়েছিল।

আদিনাথের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—আহা রে!

জহুর বলেছিল—হ্যাঁ, শুনলে কষ্ট হয়। তবে আসল কথাটা কী জানেন

বুড়োবাবু? হুজুর বউয়ের লাশটা গোরে দেয় নি। গঙ্গায় ফেলে দিয়েছিল। জাতভাইরা চটে আর না চটে বলুন? তাছাড়া মোছলমান ও কোন কম্মে? না নামাজ, না রোজা। ভুলেও পশ্চিমমুখো হয় না। চালচলনে একেবারে হাঘরে নিচু জাত। বিটিটার অবস্থা তো স্বচক্ষে দেখছেন।

আদিনাথ বলেছিলেন—দেখছি।

চাঁদঘড়িকে টিকিট কাটার ঘণ্টা বাজাতে বলে আদিনাথ বারান্দায় গেলেন। জহুর পাশে গিয়ে শেষ কথা বলার মতো বলে গেল—ওই বিটি যদি কাঁটলেঘাটের এক বেশ্যা না হয়, আমার কানদুটো কেটে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেবেন।…

জহুরের কথাটা মনে পড়ে যেত মেয়েটাকে দেখলেই। আদিনাথের মনে একটা অসহায়তার দুঃখ খচখচ করে বিঁধত। খালি ভাবতেন, ওই ফুটফুটে সুন্দর মেয়েটা—টাটকা ফোটা ফুলের মতো, নিষ্পাপ আনমনা আর নির্বোধ মেয়েটা কি সত্যি নষ্ট হয়ে যাবে? আপন মনে ঘাড় নাড়তেন আদিনাথ—এ ঠিক না, এ ঠিক না। হুজুর পাটনীর এসব ব্যাপারে জ্ঞানগম্যি কম থাকাই স্বাভাবিক। তাছাড়া সে গরীবগুরবো ঘাটমাঝি। সকাল থেকে সন্ধে নৌকো বেয়ে দিন কাটায়। রাতে শ্মশানঘাটার ঘাটোয়ারীজীর আটচালায় গিয়ে নেশাভাং করে। মেয়ে নিজে-নিজে বড়ো হচ্ছে। কোথায় তীক্ষ্ণ হুইসল দিতে দিতে কালো এক সর্বনাশ ছুটে আসছে, সে-খেয়াল ওর নেই। এটাই যত ভয়ের কথা।

নিচু প্ল্যাটফর্মে একটা কদমগাছ আছে। তার তলায় বসে দুপুরবেলা গ্যাংম্যানরা জিরোত। আর ইরানীকে দেখে দল বেঁধে চেঁচাত—ইন্নি! এ্যাই ইন্নি! অশ্লীল ফচকেমি করত। এমন কী শিবশম্ভুও কেমন চোখ নাচিয়ে কথা বলত ওর সঙ্গে। রাগে রি রি করে জ্বলে মরতেন আদিনাথ। ইরানী আনাচেকানাচে এলে বাজখাঁই গলায় ধমক দিতেন—এ্যাই! এ্যাই! আবার এসেছিস তুই? ভাগ, ভাগ এখান থেকে!

ইরানী আর তত ভয় পেত না বুড়োবাবুকে। ফিক করে হেসে একটু তফাতে সরে যেত। শিবশম্ভু হাসতে হাসতে বলত—ওকে দেখলে তাড়া করেন কেন বলুন তো দাদা? কিছু চুরিচামারি করে গেছে নাকি?

আদিনাথ গোমড়া মুখে শুধু বলতেন—ওদের আস্কারা দিতে নেই।

ব্যাপারটা আরও কিছুটা গড়িয়েছিল। দেখতেন, প্রায়ই ইরানী প্ল্যাটফর্মের শেষ দিকটা থেকে আপ কিংবা ডাউন ট্রেনে সুড়ুৎ করে উঠে পড়ছে। তক্কে-তক্কে থাকতেন আদিনাথ। দেখতেন, পরের গাড়িতে তেমনি শেষ দিকের কামরা থেকে প্রায় ঝাঁপ দিয়ে নেমে এদিক-ওদিক তাকাতে-তাকাতে তারের বেড়া গলিয়ে কেটে পড়ছে। হেসে ফেলতেন আদিনাথ। মজা করার জন্যে চেঁচাতেন—পাকড়ো পাকড়ো! ইরানী নয়ানজুলি ডিঙিয়ে ততক্ষণে পারঘাটায় চলে গেছে।

কিন্তু এমন করে কোথায় যায় মেয়েটা? নিশ্চয় পরের, কিংবা তার পরের স্টেশন অব্দি গিয়ে ফিরে আসে। আপনা আপনি বেড়ে ওঠা ছেলেমেয়েদের এ স্বভাব আদিনাথ সব লাইনেই দেখেছেন। হুজুর পাটনীর মেয়েটা নতুন কিছু করছে না। অথচ আদিনাথের কেমন কষ্ট হয়। খালি ভাবেন চোখের ওপর একটা সরল মেয়ে খারাপ হয়ে যাবে।

একদিন কথায়-কথায় শিবশম্ভুকে বললেন আদিনাথ—হ্যাঁ হে শম্ভু, একটা কথা বলছিলুম।

—বলুন দাদা!

আদিনাথ মিথ্যা করে বললেন—হুজুর পাটনী আমার কাছে এসেছিল। মেয়ের জন্যে একটা পুরনো জামা চাইতে। তা আমি বললুম, আমি তো সংসারী লোক নই বাপু। মেয়েছেলের জামাটামা কোথায় পাব? তুমি বরং ছোটবাবুকে চেও।

শিবশম্ভু হাসল।—আমার তো মেয়ে নেই দাদা! থাকলেও সে জামা ইন্নির গায়ে হত না।

আদিনাথ খুব হাসলেন!—কেন? বউমার একটা ছেঁড়াখোঁড়া ব্লাউস থাকলে দিও না? গা ঢাকা নিয়ে কথা। হুজুর দুঃখ করে বলছিল, মেয়েটা সোমত্ত হচ্ছে। একটা জামা জোটাতে পারে না।

শিবশম্ভু হঠাৎ জানলার দিকে ঘুরে বলে উঠল—হা দাদা, প্রব্লেম সলভ্ড। ওই দেখুন।

আদিনাথ ঘুরে তাকিয়ে অবাক হলেন। তারপর আশ্বস্ত হলেন। হাঁফ ছাড়ার মতো বললেন—বাঃ! বাঃ! বেশ মানিয়েছে তো মেয়েটাকে।

জানলার ওধারে ঘাসের ওপর থেকে রঙীন কাগজ কুড়োচ্ছিল ইরানী। পরনে রঙচঙে নতুন ফ্রক। এদিকে তাকিয়ে ছুই স্টেশনবাবুর সঙ্গে চোখাচোখি

হতেই লাজুক হাসল। আদিনাথ জানলায় মুখ রেখে বললেন—কী রে ইন্নি! নতুন জামা পরেছিস দেখছি যে? এঁ্যা? খুব মানিয়েছে রে!

ইরানী হাত বাড়িয়ে বলল—একটা টিকিট দেবে বুড়োবাবু? দেব বলেছিলে না?

—দেব, দেব। প্রমোশন হয়েছে যখন! তা হ্যাঁ রে, কে কিনে দিল? এঁ্যা?

—উই ঘাটোয়ারীজী।

—বলিস কী?

শিবশম্ভু টরেটক্কা করতে করতে বলল—খেয়েছে! বলেই আদিনাথের উদ্দেশে জিভ কাটল।

আদিনাথ গুম হয়ে সরে এলেন। মড়ঘাটার নচ্ছার লোকটাকে তিনি ভালই চেনেন। সিধু ডোমের বউকে সেই নাকি সাজিয়েগুজিয়ে পুষছে। সিধু তো মাতালের হদ্দ।

কতক্ষণ পরে আদিনাথের মনে হয়েছিল তাহলে কি শেষঅব্দি ঘাটোয়ারীই তাঁকে হারিয়ে দিল?

এর পর একদিন নাইতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন আদিনাথ। মড়ঘাটা আর পারঘাটার মাঝামাঝি জায়গায় একটা বটগাছ আছে। তার তলায় বাঁশের মাচান আছে। মাচানে উবুড় হয়ে শুয়ে আছে ঘাটোয়ারীজী। আর তার পিঠে বসে ডলাইমলাই করছে হুজুর পাটনীর মেয়ে। পরনে সেই রঙীন ফ্রক। মাথায় লাল ফিতে বাঁধা। এবং দু হাতে দুটো লাল বালাও পরেছে এতদিনে। কত সোমত্ত লাগছে মেয়েটাকে। কদিনেই যেন হুহু করে বেড়ে গেছে।

বুড়োবাবুকে দেখে সে চেঁচিয়ে উঠল—বুড়োবাবু, আমার টিকিট? ঘাটোয়ারীজী মুখ তুলে দেখে 'রামরাম বড়বাবু' সম্ভাষণ করে ফের বাঁ হাতে থুতনি গুঁজল।

আদিনাথ গোমড়ামুখে ঘাটে নামলেন। যতক্ষণ সূর্যপ্রণাম করলেন, খালি দেখেন লালহলুদ একটা বিশাল ব্যাপ্তির মধ্যে ফ্রকপরা কিশোরী মেয়েটা কার পিঠে চেপে দলাইমলাই করছে। অসহ্য লাগছিল।

আর একদিন বিকেলে অভ্যাসমতো হাঁটতে হাঁটতে শ্মশানঘাটের ওপাশে বসে গঙ্গাদর্শন করছেন আদিনাথ। হঠাৎ চোখে পড়ল, নির্জন আটচালার সামনে একটা চেয়ারে বসে আছে ঘাটোয়ারীজী। আর ইরানী তার পিঠে বুক

রেখে পাকা চুল খুঁজছে। সিধুর বউ সেজেগুজে তাদের কুঁড়েঘরের সামনে খোলামেলায় বসে উনুনে লকড়ি গুঁজছে। ধোঁয়ার জন্যই হয়তো ব্যাপারটা তার চোখে পড়ছে না। সে-বেলা শ্মশানে মড়া আসে নি। সিধুকে স্টেশনে দেখে এসেছেন আদিনাথ। চাঁদনড়ির কাছে গাঁজা টানতেই গেছে।

আদিনাথ পারঘাটার দিকে হুজুরকে খুঁজছিলেন। একটু পরে দেখলেন, সে উদাসভাবে কোমরে দু হাত রেখে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে আছে।

সেদিনই রাতে স্টেশন ঘরে ঢুকেই আদিনাথ বললেন—শম্ভু, একটা কথা বলছিলুম।

শিবশম্ভুর ডিউটি শেষ। বউয়ের কাছে যাবার তাড়া লেগেছে মনে। পা বাড়িয়ে বলল—বলুন দাদা। ক্ষিদেয় নাড়ি চোঁ চোঁ করছে।

আদিনাথ একটু ইতস্তত করে বললেন—ইয়ে, সন্ধ্যেবেলা ঘাটে গিয়েছিলুম। হুজুর পাটনী কথায় কথায় বলল, ওর মেয়েটাকে ঝিয়ের কাজে রাখব নাকি? সব কাজই পারে। তো আমি বললুম, আমার দরকার নেই। একা মানুষ বরং ছোটবাবুকে বলব। হ্যাঁ শম্ভু, তোমারও তো কাজের লোক দরকার। বউমা বলছিল…

কথা কেড়ে শিবশম্ভু বলল—দাদার কি মাথা খারাপ? মোছলমানের মেয়ে রাখব কী। না—মানে, আমি ওসব মানি-টানি নে। আপনার বউমার ব্যাপার তো জানেন। ভীষণ মানে টানে।

বাইরে গিয়ে ফের ঘুরে শিবশম্ভু বলল—আর দাদা! আপনার ওই পরোপকারী স্বভাবটা এবার ছাড়ুন তো। এত ঠকেও শিক্ষা হল না আপনার?

হঠাৎ আদিনাথ ভীষণ চটে গেলেন।—থাক। পণ্ডিতী ফলিও না, পণ্ডিতী ফলিও না। মুখের ওপর যাতা বলা অভ্যেস হয়ে গেছে তোমার। বরাবর দেখছি, তুমি আমাকে ওই টোনে কথা বলো। ভেরি ইনসাল্টিং।

শিবশম্ভু গ্রাহ্য করল না। চলে গেল চাপা হাসতে হাসতে। রামধন পয়েণ্টসম্যান লণ্ঠন হাতে ঘরে ঢুকে বলল—বড়াবাবু, চাপাটি বানা চুকা। আভি আনবে, না থোড়া বাদ খাবেন? গর্ম খানে সে আচ্ছা হোতা না বড়াবাবু?

—আধঘণ্টা পরে। বলে আদিনাথ বারান্দায় গিয়ে নক্ষত্র দেখতে থাকলেন।…

এসব কথা দু বছর আগেকার। কিন্তু এখনও কয়লাকুড়োনো টুকটুকে ফর্সা আনমনা মেয়েটাকে মনে মনে দেখতে পান বুড়োবাবু আদিনাথ অগস্তী। চোখে ভাসে রেলে বালান্স রেখে এক হাত পাখির ডানার মতো বাড়িয়ে তরতর করে চলেছে, আর টালখেয়ে পড়লেই আপন মনে হেসে খুন হচ্ছে। চাঁদঘড়ি ঘন্টা বাজালে চমকে ওঠেন আদিনাথ। ডিসট্যাণ্ট সিগনাল পেরিয়ে শিস দিতে দিতে এগিয়ে আসছে কাটোয়া লোকাল ডাউন ট্রেন। ইচ্ছে করে চেঁচিয়ে উঠতে— এঁাই! এঁাই! তারপর টের পান, মনের ভুল। হুজুরের মেয়ে এখন কত সেয়ানা।

শিবশম্ভুর লোক আছে ওপরে। ট্রান্সফার ম্যানেজ করে চলে গেছে। এসেছে আরেক ছোকরা ছোটবাবু বিনয় বিশ্বাস। পায়ের ধুলো নিয়ে বলেছে—দাদার কত প্রশংসা শুনেছি। দেখবেন দাদা। আমি আপনার ছোটভাই।

শুনেই বুঝেছেন, শিবশম্ভুর চেয়ে এক কাঠি সরেস। তবে এখনও ব্যাচেলার। আর পয়েণ্টসম্যান অলকের বাড়ি কটক জেলায়। ভাল রাঁধে-টাধে। বড়বাবু-ছোটবাবু একসঙ্গে খাচ্ছেন। দু ভাগ করা সিঙ্গল-রুম কোয়ার্টার। শিবশম্ভু বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া করত। এখন ওদিকটা সুনসান। বিনয় খালি নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে ওস্তাদ। আর চাঁদঘড়ি? সে আছে। সে স্থানীয় লোক। তার মুরুব্বী আছে মস্তো। তার শুওরের পাল বেড়েছে।

আদিনাথ রয়েই গেলেন কাঁটালেঘাটে। ধরাধরির লোক নেই। স্তোকবাক্য খালি। শেষে ধরে নিয়েছেন এখান থেকেই রিটায়ার করতে হবে। কিন্তু মনও বসে গেছে জায়গাটাতে। ইচ্ছে করে, পারঘাটার কাছাকাছি একটু জায়গা কিনে বাড়ি করে ফেলবেন। মন্দ কী। কাঁটালেঘাটের দিনকাল হুহু করে বদলাচ্ছে। এরই মধ্যে স্টেশনের পেছনে ঘাটঅব্দি কয়েকটা দোকানপাট বসেছে। ওদিকে একটা ইটখোলা হয়েছে। টালির চিমনীভাটাও হয়েছে। চোখের ওপর কাঁটালেঘাট হুজুর পাটনীর মেয়েটার মতো দেখতে দেখতে বড়ো হয়ে উঠল। উড়া কথার মতো কানে আসে, লুপলাইন ও গঙ্গার পাশে পাশে হাওড়া অব্দি পাকা রাস্তাও হয়ে যাবে নাকি।

কাঁটালেঘাটে ট্রেন বা মালগাড়ি থেকে মড়া নামার ব্যাপারটা যেমন ছিল, তেমনি আছে। কিন্তু নতুন এক উৎপাত শুরু হয়েছে চালের চোরাচালান। প্রথম-প্রথম আদিনাথ খুব তড়পেছিলেন। নীতিবাগীশ লোকের এই জ্বালা।

পরে টের পেয়েছেন, তাতেও তাঁর কিছু করার নেই। বিনয়, অলক চাঁদঘড়িরা পয়সা পাচ্ছে বোঝেন। কিন্তু করবেনটা কী? মাঝে মাঝে জংশন থেকে রেলপুলিশ আসে। কখনও এন ভি এফের ঝাঁক এসে ঘোরাঘুরি করে যায়। তখনকার মতো চাল-চালানীরা ঘাপটি পাততে পাততে যায় আড়ালে। ওরা চলে গেলে মাছির মতো ভনভন করে বেরিয়ে আসে। আদিনাথ স্টেশনঘর থেকে আগের মতো বারান্দায় বার বার গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন না। নেহাত গাড়ি পাস করাতে হলে দাঁড়াতেই হয়। অফ-ডিউটির সময় চলে যান গঙ্গার দিকে। নিরিবিলি জায়গায় চুপচাপ বসে গঙ্গাদর্শন করেন।

পারঘাটার এখন জমাট অবস্থা। হুজুর পাটনীর হাতছাড়া হয়ে গেছে কাটলেঘাট। তাতে কী? নৌকো বেচে ওপাশের মড়ঘাটের ওপর পানবিড়ির দোকান করেছে। সে-হুজুর আর নেই। তেল চুকচুকে চেহারা হয়েছে এখন। হাঁটু অব্দি গোটানো ধুতি গায়ে নীল পপলিনের হাফশার্ট আর পায়ে স্যাণ্ডেল— হুজুর যায় জংশনের বাজার থেকে মাল আনতে। বাজার সেরে বরোজ থেকে পান আনতেও যায়। রাঙা দাঁত বের করে বলে—সালাম মাস্টেরবাবু। ডাউনের লেট নেই তো?

—কোথায় চললে হে হুজুর?

—আজ্ঞে, একবার কাটোয়াবাগে যাই। মালপত্তর আনি গে।

—হ্যাঁ হে, মেয়ের বিয়ে দিচ্ছ কবে?—আদিনাথ টেনে টেনে হাসেন। আমাদের খাওয়া পাওনা কিন্তু। দেখো বাবা, ফাঁকি দিও না।

হুজুর হঠাৎ কেমন গম্ভীর হয়ে যায় একথায়। শুধু বলে—সে আর বলতে, মাস্টেরবাবু! কিন্তু আদিনাথ যখনই একথা তুলেছেন, দেখেছেন হুজুর কথাটা যেন এড়িয়ে যাচ্ছে।

মেয়েটিকে অনেকবার চালচালানীদের দলে দেখেছেন। ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরেছে। রাতারাতি কী আশ্চর্য বদলে গেছে চেহারা! পুরোপুরি যুবতী হয়ে উঠেছে ইরানী। দূর থেকে একদিন দেখেছিলেন, ঘাটের ধারে সেজেগুজে দাঁড়িয়ে আছে। শেষবেলার রোদ পড়েছে শরীরে। আদিনাথ বিষণ্ণ মনে ভেবেছিলেন, চেষ্টা করলে হয়তো ওকে বাঁচাতে পারতেন। পারেন নি। ঘাটোয়ারী লোকটা তার আগেই ওকে গিলে ফেলেছিল। খালি মনে হয়, সময়মতো তখন যদি সাহস করে একটা ফ্রক কিনে দিতেন! আসলে আনমনা বোকা মেয়েটা টের পায় নি, তার রঙের বাজারে ক্যামোফ্লেজ করে এগোচ্ছিল

চুপিসাড়ে এক সর্বনাশ। কেউ চেঁচিয়ে ওঠেনি আদিনাথের মতো—এ্যাই! এ্যাই!

জহুর ব্যাপারী বলেছিল—ও যদি কাঁটলেঘাটের বেশ্যা না হয় তো আমার কান কেটে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেবেন। তাই হল শেষ পর্যন্ত। জহুর স্টেশনে এলে একগাল হেসে কান দেখায়। বলে—কী বুড়োবাবু হল তো! কাঁটলেঘাটে এখন মেয়েটাকে নিয়ে ছেঁড়াছেঁড়ি চলছে, জানেন?

আদিনাথ বলেন—তাই বুঝি? আমি ওসব সাতেপাঁচে কান পাতিনে।

—সে কথা আর বলতে? তবে কবে দেখবেন, মায়ের মতো মেয়েট খুন হবে।

—কেন? কেন জহুর?

জহুর চুপকথার ভঙ্গীতে বলে—কম্পিটিশন বুড়োবাবু। বুঝলেন? জোর কম্পিটিশন চলছে! একদিকে ইটখোলার প্রাণকেষ্টবাবু, আরেকদিকে আমাদের গাঁয়ের সোরাবহাজির ছেলে জাফর, অন্যদিকে ঘাটের মড়া ঘাটোয়ারীজী জাফর বলেছিল, নিকে করব। দশ বিঘে জমি লিখে দেব। ইস্নি বলেছে থু থু! আমি কি অত শস্তা? জাফর শাসিয়েছে। লুঠে নিয়ে যাবে। সেই ভয়ে আর চাল বেচতে যায় না—লক্ষ্য করেছেন ইদানীং?

যায় না বটে। আদিনাথ বেশ কিছুদিন ওকে চালচালানীদের দলে দেখেননি। জহুরের কাছে এসব শুনে ভেতর-ভেতর উদ্বেগ বোধ করেন রাতবিরেতে ঘাটের দিকে গণ্ডগোল শুনলে কান পাতেন। বুক কাঁপে। ভাবেন সোরাবহাজির ছেলের প্রস্তাবটা তো ভালই ছিল। কেন রাজি হল না হতচ্ছাড় মেয়েটা? গেরস্থবাড়ি বউ হয়ে মানসম্মানে থাকত। আসলে পাপ যাকে ছোঁয়, তার মাথার ঠিক থাকে না। আর ভেবে দেখলে, জাফর ছেলেটার উদারতাও প্রশংসনীয়। জেনেশুনে ওকে বউ করে ঘরে তুলতে চাইছে! কি ওদের সমাজ তা মেনে নেবে তো?

কথাটা একদিন জহুর ব্যাপারীর কাছে যাচাই করে নিলেন আদিনাথ জহুর পানখেকো কালো দাঁতের ফাঁকে কাঠি খুঁচিয়ে পণ্ডিতী চালে বলল—হুঁউ! একশোবার। মৌলবীর হাতে তৌবা করলেই সাতখুন মাফ সাতঘাটের খানকিও সতীসাবিত্রী হয়ে যাবে। চলে এস, চলে এস তা খালি।...জহুর খ্যাক খ্যাক করে হাসতে লাগল।

আদিনাথ এইসব শুনে খুব আশা নিয়ে ঘাটে গেলেন। হতচ্ছাড়ী বোধ

ময়েটার জীবনে একটা ভাল রকমের হিল্লে হতে পারে। এমন চান্স ছাড়তে যাছে? হুজুর নেশাখোর হলেও বাপ। তা তার নিজের ঔরসে ওর জন্ম হাক বা ওকে হাঘরে ইরানীদের কাছ থেকে চুরি করেই আনুক, এতটুকু বয়স থকে লালনপালন করেছে। আর এই আদিনাথ—যাঁর সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নই, জাত আলাদা, মানসিকতা আলাদা, কালচার আলাদা—অথচ সেই ছাটবেলা থেকে দেখে আসছেন ফুটফুটে, ফর্সা, সুন্দর আনমনা নিষ্পাপ ময়েটাকে, তাঁর মনেই যদি কর্তব্যবোধ জেগে থাকে—হুজুরের কেন জাগবে ।? এ হচ্ছে কিনা মানুষের ভেতরকার ফাণ্ডামেণ্টাল ব্যাপার। আদিনাথ সব কথা ভাবতে ভাবতেই গেলেন।

হুজুর তার পানবিড়ির ঘাটে বসে মড়াযাত্রীদের সঙ্গে জমিয়ে গল্প করছিল। কটু তফাতে দাঁড়িয়ে দোনামনা করছিলেন আদিনাথ। হুজুরের গল্পটা কানে মাসছিল। লোকটা বরাবর আমুদে। কবে নাকি এই কাঁটলেঘাটে একটা ডা ভেসে এসে ঠেকেছিল। মড়ার গায়ে চন্দনের গন্ধ। ঘাট ম ম। সেই বর শুনে খুব ভিড় হল। মেয়েরা এসে শাঁখে ফু দিল। ঢাকীরা এসে ঢাক জাল। ছিরুটির ঠাকুরমশাই এসে ঘণ্টা নেড়ে মন্ত্র পড়ে জবাফুল ছুঁড়তেই ডা নড়লেন-চড়লেন। আবার ভেসে চললেন মাঝগঙ্গার দিকে। মেয়েরা উলু দিতে লাগল। খৈ ছিটোল। পয়সা বিলোল। তেমন ধুম কাঁটলেঘাটে যাজঅব্দি হয়নি। তেমন মড়া আর কখনও আসেনও নি।…গল্পটা শুনে সবাই হাহো করে হেসে উঠল। হুজুরও দুলেদুলে হাসতে লাগল।

মাথায় লালফেট্টি বাঁধা, হাতে মস্তো লাঠি, বাগানের এক ঘোষের পো গাঁকে তা দিয়ে বলল—ইটার মাহাত্ম্য কী হে?

হুজুর বলল—অ্যানেক। সব পুরনো পাপ কুড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি।

—হুঁ, তাই বটে। আর কবে আসবেন হে হুজুরভাই? অ্যানেক পাপ জড়ো হয়েছে ঘাটে।

মুচকি হেসে চোখ নাচিয়ে কথাটা বলতেই হুজুর টাটছাড়া হয়ে বেমক্কা চাল—খবরদার! মুখ সামলে! আর লোকটাও লাঠি তুলে তড়পাল। সঙ্গে সঙ্গে হইচই বেধে গেল। আদিনাথ কান করে শুনছিলেন। বুঝতে পারলেন না, হুজুরের হঠাৎ খাপ্পা হওয়ার কারণ কী। দুজনকে লোকেরা মধ্যস্থতা করে থামাতে চাইল। এদিকওদিক থেকে লোকেরা দৌড়ে এল। আদিনাথ ঘাবড়ে গেলেন।

কাছে এসে একটা অচেনা লোক বলল—মদমোতালের কাণ্ড, বুড়োবাবু ঘাটে সারাবেলা এরকম। চলে আসুন এখান থেকে। এ মড়াঘাটায় ভদ্রলোক আসে নাকি? ছ্যা ছ্যা!

আদিনাথকে কত লোক চেনে। তিনি কজনকেই বা চেনেন! মনটা তেতো হয়ে গেল। ধুর ধুর, তাঁর খেয়েদেয়ে কাজকম্ম নেই, ভূতের পেছনে হন্যে হচ্ছেন। তিনি কি প্রফেট, না অবতার?

পা বাড়াতে গিয়ে চোখ পড়ল, হুজুরের মেয়ে সেজেগুজে দোকানের ওপাশটায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। তখন লক্ষ্য করেননি। মুখে স্নোপাউডার ধপধপ করছে। একগাদা, ভুরু ও চোখে কালি বুলিয়েছে, এবং ঠোঁটে রংও। এতক্ষণে বুঝলেন, লালফেট্টি বাঁধা লোকটার মন্তব্য এবং হুজুরের রাগের কারণটা কী।

কিন্তু মেয়েটাকে দেখামাত্র যেন চোখে কুটো পড়ল। দৃষ্টি সরিয়ে আদিনাথ হনহন করে স্টেশনের দিকে পা বাড়ালেন।

সেই সন্ধ্যায় অভ্যাসমতো স্টেশনঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আদিনাথ মুখ উঁচু করে নক্ষত্র দেখছিলেন। নক্ষত্র দেখতে দেখতে হঠাৎ হুজুরের গল্পটা তাঁর মনে পড়ে গেল। চন্দনের গন্ধ ছড়ানো একটা মড়া ভেসে এসেছিল। কাঁটালেঘাটের সব পাপ কুড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল। গল্পটা ভারি মজার। আপনমনে খিলখিল করে হেসে উঠলেন আদিনাথ। আবার একটা চন্দনের গন্ধমাখা মড়া আসা খুব দরকার।

কিন্তু তারপর হঠাৎ টের পেলেন, শিউরে উঠলেন, নাক তুলে শুঁকতে থাকলেন, যেন সত্যি সত্যি চন্দনের গন্ধ পাচ্ছেন। শরীর ভারি বোধ হল আদিনাথের। বুক ঢিপঢিপ করল। চন্দনের গন্ধে ম ম করা সন্ধ্যারাতের বাতাস ঘূর্ণির মতো তাঁর চারপাশে পাক খাচ্ছে। তারপর শাঁখ বাজা শুনতে পেলেন। উলুধ্বনি শুনলেন। হাজার হাজার ঢাক বেজে উঠল চারদিক থেকে। ঘণ্টার শব্দ হল। আদিনাথ দুহাতে মাথা চেপে ধরে অতিকষ্টে ডাকলেন—বিনয়! বিনয়! আমায় ধরো। ধরো!

আলো নেড়ে মেলট্রেন পাস করিয়ে চাঁদঘড়ি ঘুরতেই চোখে পড়ল, বড়বাবু টাল খেয়ে গড়িয়ে পড়ছেন। সে চেঁচিয়ে উঠল—ছোটবাবু! ছোটবাবু

বিনয় দৌড়ে এল ঘর থেকে। অলক এল। ধরাধরি করে স্টেশনঘরে নিয়ে গিয়ে টেবিলে শুইয়ে দিল। নাকের ফুটো আর কষায় রক্তের ফোঁটা। ঠোঁট কাঁপছে। বিড়বিড় করে কী বলার চেষ্টা করছিলেন। সাতটা পাঁচের ডাউনে জংশন হাসপাতালে পাঠানোর আগেই কাঁটালেঘাটের বুড়োবাবু আদিনাথ ভগন্তী মারা গেলেন। রিটায়ার করার বয়স হয়েছিল। মাস তিনেক আগেই চলে গেলেন।

ডাক্তারী মতে স্ট্রোক। কিন্তু চাঁদঘড়ির মতে, ব্যাপারটার পেছনে ভূতটুত আছে। সন্ধ্য ঘাট থেকে ফিরলেন আর আচমকা পড়ে গেলেন মুখ থুবড়ে। নাকে, কষায় রক্ত। তাছাড়া, চাঁদঘড়ি মাকালীর দিব্যি কেটে বলেছিল, কানের কাছে মুখ নিয়ে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলুম—কী বলছেন বড়বাবু? খালি বললেন, চন্দনের গন্ধ। স্পষ্ট শুনেছি। ভুল হবে কেন? কাঁটালেঘাটের এ বদনাম বরাবর আছে। রাতবিরেতে শুওর খেদাতে গিয়ে তো কম্ট পাইনি। অবিকল চন্দনের গন্ধ

জ্যোৎস্নায় রক্তের গন্ধ

ওই রেলগাড়িটা কি দিল্লী যেত? দক্ষিণের রেললাইনে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তার পেটের অংশটুকু মধ্যরাতে পুড়ছিল। তখন ঠিক মধ্যরাতে যেন চতুর্দিক কালনিশার ঘোর কালো অন্ধকার। আর সেই অন্ধকার হা হা হা হা আগুনের দাঁত বার করে হাসছিল। দিল্লীযাওয়া রেলগাড়ি জ্বালিয়ে দক্ষিণের ফাঁকা মাঠে কারা পালিয়ে যাচ্ছিল। দমকলের ঘণ্টা বাজছিল উত্তরের জাতীয় মহাসড়কে। ফকিরচাঁদ খামরু স্টেশনের রিকশোস্ট্যাণ্ডের তেকোণা চত্বরে হামাগুড়ি দিচ্ছিল কারণ পিছনে দুম্ দাম্ কট্ ফটাস্···এইপ্রকার কানফাটানো আওয়াজ। আওয়াজে একটা নেড়ীকুত্তা লেজগুটিয়ে পালায়। ফকিরচাঁদ খামরুর নাইকুণ্ডলের ভিতর থাবা পেতে বসে যে কুত্তাটা কাঁইকুঁই করছিল এবার বেরিয়ে পড়ে পথ দেখবার তালে, বুড়ো ফকিরচাঁদের মনে এইরূপ ভ্রম

সে আড়চোখে চেয়ে পিছন ফিরতেই স্টেশন বাজারের সব আলো মুহূর্তে

[illegible] গেছে

দিল্লীযাওয়া রেলগাড়ি জ্বলছিল। এই দেখে মধ্যরাতে একটি মেয়েমানুষ

হঠাৎ তার আলোর ছটায় দাঁড়িয়ে হি হি হি হি হেসে খুন। গোডাউন শেডের নীচ থেকে পিলপিল করে গোটা চার ন্যাংটো ছোট-ছোট মানুষ বেরিয়ে এসে প্যাট প্যাট করে তাকায় আর চোখ বুজে ক্যালে বারংবার। ঠিক এইসময় ফকিরচাঁদ অদূরে পিপুল গাছের গুঁড়িতে সেঁটে থেকে বলে ওঠে—'একি আগুন? এ কী আগুন!'

'দ্যাখো নি তো দেখে লাও…' মেয়েমানুষটি হাততালি দিয়ে যেন হাসে। তাদের পিছনে শহর। পিছনে কলকারখানা বড় বড় চিমনি। চিমনির কালো রঙের পরে দিল্লী যাওয়ার রেলগাড়ির আগুনের চমক। পিছনের শহরে ঠিক মধ্যরাতে থেকে-থেকে বিষম চিৎকার। ফকিরচাঁদ খামরু আর সেই চারছেলের মা মেয়েমানুষ দ্যাখে, ঠিক মধ্যরাতে তাদের পিছনে শহরে দারুণ জাগরণ 'আহা হা, এখন মনিষ্যির ঘুমের সময়'…ফকিরচাঁদকে বলতে শুনে ছেলেপুলের মা লক্ষ্মীদাসীর ছটালাগা চোখ জ্বলন্ত হয়—'থাম্ রে বুড়ো, বক বক করিসনে' ফকিরচাঁদ বলে, 'হুই দ্যাখো আবার আগুন, থামবার যো নাই'…ছেলেপুলের মা আঙুল মটকায় পটপট করে 'মনের আগুন, বাছাদের মনের আগুনে স জ্বলেপুড়ে ছাই…'

জ্বলেপুড়ে ছাই হচ্ছিল পিছনে শহর সামনে দিল্লীর রেলগাড়ি। ঠিক ত মধ্যরাত। তখন দমকলের ঘণ্টা বাজছিল ঢঙ ঢঙ ঢঙ ঢঙ। সর্বনাশের ঘণ্ট পথের উপর গুলি কাঁদুনে গ্যাসের শেল ফাটানোর আওয়াজ। হল্লা কদাচি কদাচিৎ জ্বলেওঠা আগুনে একদল মানুষের মুখ। হামাগুড়ি দিয়ে বে পালিয়ে আসে শহর ছেড়ে। রেললাইন পেরিয়ে মাঠের দিকে পালায়।

তারপর হঠাৎ অতি কাছে কখন আগুন জ্বলে উঠেছে। স্টেশনঘরের ক ফাটানো বিশ্রী আওয়াজ। স্টেশনবাবু লম্বা টেবিল থেকে ধুড়মুড় করে জানালা গলিয়ে ময়দানে লাফ দিলেন। ছেলেপুলের মা ছুটে এসে ছেলেপুলেদের পালকঢাকা দিয়ে পিপুলগাছের নিচে চলে এল। বুড়ো ফকি চাঁদ খামরু একটু সরে বসল। তার গলা ঘড়ঘড় করছিল। উদ্দাম কা সামলাতে সে ক্রমাগত কাঁপছিল। আর স্টেশনের দেয়ালে গুলির আওয় শুনতে শুনতে ছেলেপুলের মা ফিসফিস করে উঠল…'আমি মধুপুরের লক্ষ্মীদা গো, মধুপুর চেনো নি, হুই হে…' ফকিরচাঁদ অতিকষ্টে বলল—'আমি পলা গাঁর রতন খামরুর নাতি ফকিরচাঁদ। আমাদের উপাধি খামরু। বড় সাতটা খামার ছিল…'

কথা বলতে বড় সুখ এখন। যদিও চারপাশে আগুন জ্বলছে, পালানো মানুষের ইসারা পাওয়া যাচ্ছে অস্পষ্ট অন্ধকারে, যদিও ময়দানে রাতচরা ছুটো গাধা বিষম ভয় পেয়ে দৌড়ে অন্ধকারের দিকে পালিয়ে গেল, ছ্যাকরা ঘোড়া গাড়ির কোচোয়ান ইসমাইল যাত্রীদের বিশ্রামালয় থেকে ছুটে এসে জোতা থেকে তার ঘোড়াদুটিকে খুলে নিতে পারল না তাই ককিয়ে উঠছে বারংবার, …বলতে ভালো লাগে, আমরা কে কী ছিলাম। যেন বিক্ষোভের প্রচণ্ডতার মধ্যে এই কাহিনীকে ঠাঁই দেবার প্রয়াস। যেন চারপাশের বহ্নিমান ক্ষোভের মধ্যে নিজ নিজ দাবিকে যোগ্য মর্যাদাদান করার ইচ্ছা। কিংবা…কিংবা যেন মধ্যরাতের অন্ধকার ফাটিয়ে বেরিয়েপড়া লেলিহান শিখাবিশিষ্ট দীপ্তিমান মহাসূর্যের সামনে দাঁড়িয়ে বিচারপ্রার্থনা—যে মহাসূর্য তার দ্বাদশ দ্বার উন্মোচিত করে ডাক দিয়েছে, এসো!

'লক্ষ্মী, লক্ষ্মীদাসী!' ফকিরচাঁদ বিড়বিড় করছে। 'আর নাম বুঝি থাকতে নাইরে মা! কী ভুল, কী ভুল!' আক্ষেপে পিঠ ঘষছে গাছে। খসখস শব্দ জন্তুর মতন। স্টেশনের আগুন থেকে রাশি রাশি স্ফুলিঙ্গ ঠিকরাচ্ছে। উৎকট ধুঁয়োর গন্ধ নাকে লাগে। দমকলের ঘণ্টা অতি কাছে। টর্চের আলো ময়দানে চারপাশে, বোমা ফাটল পথের ওপর। ইসমাইল কোচোয়ানের ঘোড়া দুটি নয়ানজুলিতে গাড়ি টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ইসমাইলের চিৎকার ডুবিয়ে ফের গুলির আওয়াজ। একবার হল্লা। ফের সব চুপ। দুটো দমকল থেমে গেল স্টেশনের সিঁড়ির কাছে। যেন দাঁড়িয়ে ঠায় মজা দেখছে।

পালকে বাচ্চাদের ঢেকে মেয়েমানুষ লক্ষ্মীদাসী ফিসফিস করে বলল—'তুমি আমার বাবা, সাতজন্মের মেয়ে তোমার। ফেলে পালিয়ো না…'

'ভয় কী, চুপ করে বসে থাকো।'

'বাবা, বাবা গো!'

'বা?'

'শুধু আগুন দেখি, লোক দেখি না—শুধু চেঁচানি শুনি, লোক কই?'

ফকিরচাঁদের থলথলে চোখে রহস্য। দেখলে গা ছমছম করে। এই বুঝি তবে নাটের গুরু!

'বাবা, কথা বলছো না কেন?'

'উঁ?'

'লোকজন কই?'

'অন্ধকারে লুকিয়ে আছে।'

'তুমি দেখেছ তাদের ?'

'হুঁ।'

লক্ষ্মীদাসী একটু সরে বসল। কী জানি, এই বুঝি আসল লোকটি। ন্যাংটো ছেলে চারটি কাঠ দুজানুর ওপর, পায়ের ফাঁকে আর বুকের ওপর। 'পাতকুড়ো !'

'উঁ ?'

'ঘুমোস নে।'

'ঘণ্টা ?'

'অ্যাঁ !'

'জেগে থাকিস্।'

'পন্টে !'

'মা !'

'ঘুমিও না।'

বুকেরটির পিঠে হাত বুলিয়ে কানের কাছে সোহাগী স্বরে বলল—'চাঁপু রে, তুই শুধু ঘুমো।'

বুড়ো একদৃষ্টে আগুন দেখছিল। মুখ ফিরিয়ে এদিকে তাকাল, অল্প হাসি অন্ধকার চিবুকের ওপর ছলছল করে কাঁপছে আলোর ছটায়। দেখে মনে হয়, মতলববাজ। লক্ষ্মীদাসী ছেলেপুলেদের শক্ত করে ধরেছে। কী জানি, হঠাৎ তুলে ছুঁড়ে ফ্যালে নাকি আগুনে।

'মা কি ভয় পাচ্ছিস্ রে ?'

'কই, না তো !'

আ মর্! আঙুল তুলে পায়ের ফাঁকের বড় ছেলে পন্টেকে দেখায় বুড়ো। ঘড়ঘড় করে বলে—'দুই রকম ছেলের একটা মড়া ময়দানে এখনও পড়ে আছে…'

'হেই বাবা, চুপ্ করো…'

'বিকেলে দল বেঁধে বেরিয়ে পড়েছিল।' ফকিরচাঁদ নির্বিকারভাবে বলে। 'সকলের আগে দুই রকম গোলগাল মুখ, ঢ্যাপসা গতর, একটা ইস্কুলের ছেলে…'

'আমার ছেলেকে ইস্কুলে দেবো না !'

'তাতে কী ! আরও অনেক ছেলে ইস্কুলে যায়।'

'সেটা কি এখনও ওখানে পড়ে আছে?' লক্ষ্মীদাসী তীক্ষ্ণদৃষ্টে বাঁপাশের মাঠের দিকে তাকায়। সেই গাধাছুটি নির্ভয়ে ঘাস খাচ্ছে এখন। প্রথম চমকটা সামলে নিয়েছে। কে জানে, এখন অব্দি গাধাছুটি ক'বার একটি ইস্কুলে যাওয়া ছেলের রক্তাক্ত লাশ ডিঙিয়ে ঘাস খেল।

ফকিরচাঁদও দেখছে সেদিকটা। 'আছে। থাকবার কথা। বিকেল থেকে পুলিশ মাঠের চারপাশে বন্দুক হাতে পাহারা দিচ্ছে। বড়কর্তা না আসা অব্দি ওই ভাবে থাকবে, বুঝলে?'

'উঃ মাগো!'

'কী হলো?'

'কিছু না। বলো।'

'একপলক দেখেছিলাম। তখন দেবতা ঢলে পড়েছেন। রোদ নিবিয়ে আসছে। ছেলেটার বুকে দগদগে রক্ত—আগুন ফেটে বেরিয়ে গেছে—' ফকিরচাঁদ ফ্যাকফ্যাক করে হাসল।

'ওই রকমই। আজকাল দুধের বাচ্চাদের মনে আগুন পোষা! পণ্টা ঘণ্টাকে নিয়ে অই জ্বালায় জ্বলছি না! সামলে রাখা দায়। কেবল পাতকুড়োটা বেশ শান্ত। খিদে পেলেও কাঁদে না।'

শুনে ফকিরচাঁদ এমন ভাবে হাসছে, লক্ষ্মীদাসীর গা ছমছম করে। কী মতলব কে জানে। পাতকুড়োকে সে ধরে থাকল।

'দুজন সেপাই ছুটে গিয়ে ধরাধরি তুলে আনল ছেলেটাকে। নিজ চোখে দেখলাম। কারুর হাতে দেবে না ওকে। আগে বড় কর্তা আসুন দিল্লী থেকে সেও আগামীকাল বেলা দুপুর গড়িয়ে যাবে।'

আসবে ক্যামনে? র‍্যাললাইনে আগুন যে গো?'

'ঠিক বলেছ। আসবার যো নাই। সোতরাং...'

'মড়াটা পড়ে রইল তাইলে। মা-বাবা বুক চাপড়াবে। আহা হা বুকে আচমকা ঘা খেয়ে কী বলেছিল—মা না বাবা, কে জানে!'

'মা। মাকেই ডাকবার কথা। পাতকুড়োর মত শান্ত ছেলে তো বটেই...' ফকিরচাঁদ ফ্যাকফ্যাক করে হাসছে।

'আহা হা রে! ওকথা বলোনা, বলোনা'...ঘণ্টা পণ্টাকে ছেড়ে পাতকুড়োকেই চেপে ধরল বেশী করে।

'কেঁদোনা লক্ষ্মীমণি, কাঁদতে নাই।'

'কাঁদিনি। আমার পাতকুড়ো যদি অমন করে'

দমকল দুটো চুপচাপ দাঁড়িয়ে আগুন দেখছে। অনবরত খট্‌খট্ ফটাস্ফট্ শব্দ, প্যাটকেল পড়ছে সম্ভবত। যাত্রীদের বিশ্রামালয়ের পেছনে ঘন জঙ্গল থেকে কারা ছুঁড়ছে। দমকলের লোকগুলি উবুড় হয়ে পড়ে আছে লাল গাড়ির ওপর। দেখেটেখে ফকিরচাঁদ হাসতে থাকল নিঃশব্দে। বোঝা যায়, পলাশগাঁয়ে থাকতে এই বুড়োর সারাজীবন তুখোড় রসিক পুরুষ বলে প্রসিদ্ধি ছিল।

লক্ষ্মীদাসীর চোখে অন্য দৃশ্য নেই। রেলিঙঘেরা মাঠে খাবলা খাবলা আলোর ওপর পিছলে যাচ্ছে নিষ্পলক তার দৃষ্টিটা। অন্ধকারের খাদ থেকে আলোর ঢিবিতে ফের খাদে—এইরকম একটা কষ্টকর চলাফেরা। শুধু কোথায় যেন শুধু দুটি ঘাসখেকো নিশ্চিন্ত গাধাকেই দেখতে পায়, লাশ দ্যাখে না। লক্ষ্মীদাসীর বুক তোলপাড়—তার ছেলের লাশ যদি পড়ে থাকত, সে এই নিশি রাতের বিক্ষোভময় পৃথিবীতে মাতৃসুলভ যন্ত্রণায় সকল বিপদ অগ্রাহ্য করে রেলিঙ টপ্‌কে মাঠের মধ্যে ঢুকে যেত। আর এই ভাবনায়, আহা, কী গরব কী প্রচণ্ড সুখ, লক্ষ্মীদাসী রেলকোম্পানীর ময়দানে রক্তাক্ত ছেলেকে বুকে জড়িয়ে চিৎকার করত—'আমি এর মা!'

এবং আস্তে আস্তে তার মুখটা সোজা হল তখন। প্রাজ্ঞ জজসায়েবের বিচক্ষণতা ওতপ্রোত মুখের রেখায়, গাম্ভীর্যে অটল তার আস্থা—সে ধীর স্থির শান্তকণ্ঠে প্রশ্ন করল—'ছেলেটা কী করেছিল?'

ফকিরচাঁদ মুখ ফেরাল। হঠাৎ যেন ক্ষুব্ধ। অদূরে রেলগাড়ির দগ্ধ পাটাতন থেকে দক্ষিণের হাওয়ায় স্ফুলিঙ্গ উড়ছে ঝাঁকে ঝাঁকে। উড়ে আসছে পিপুল-গাছের শীর্ষভাগে। একবার বোমা ফাটবার নির্ঘোষ, ফের কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধতা। সেই স্তব্ধতা দারুণ গুমোট—মনে হয় টীনের গুদামঘরে বসে আছে তারা এবং গমগম করে তার ছাদ কাঁপিয়ে লক্ষীদাসীকেই এ মুহূর্তে গালমন্দ করতে ইচ্ছে করে।

তা পারল না। মেয়েমানুষ, নিতান্ত অবোধ মেয়েমানুষ। ফকিরচাঁদ অন্যদিকে ফিরে সকৌতুকে বলল—'পেটে কী একরকম জন্তু ছিল, বুঝলে? মহাজন্তু। তার...'

মধুপুরের ছেলেপুলের মা হেসে বাঁচে না। এই সব বুড়োরা ঘরছাড়া হলে কী হয়? রসের জ্বালা। 'ও মা, তাই নাকি!'

'তার জন্তুটাকে নিয়ে বড় জ্বালা। নেহাত্ বাচ্চা বয়স, ঢাকতে জানে না।

দিলে ফাঁস করে। কারা তখন বললে, তবে বড়কর্তার কাছে যাও। সে বড়কর্তার তল্লাসে যাচ্ছিল। তারপর...'

'বেশ গল্প জানো বাপু। তারপর ?'

'এদিকে বড়কর্তার লোকেরা পথ আটকেছে সঙ্গে সঙ্গে। কী জানি, পেটের জন্তু হাঁউমাঁউ করে বেরিয়ে পড়ে বড়কর্তার সুমুখে। গিলেটিলে খায় নাকি, বাস্ রে, তা হবে না।'

ঘণ্টাপণ্টা শুনছিল তাহলে। সোজা হয়ে বসেছে একেবারে। খাড়া কান, বড় বড় চোখ। ঘণ্টার বোধ করি, ঠোঁট ফাঁক হয়ে গেছে। নালা টপকাচ্ছে কি না কে জানে—ওইরকম অভ্যেস। সে সাড়া দিয়ে বলল—'ভারী মজা।'

'মজা বেরোচ্ছে !' ফকিরচাঁদ দাদুসুলভ ধমক দিয়ে বলল...'তখন তোমার মশাই, জন্তুটাকে আগেভাগে বিনেশ করাই উচিত...দিলে বন্দুকের গুলি ছুঁড়ে।'

বয়স্ক পণ্টা না বলে পারল না—'আমি দেখেছি।'

লক্ষ্মীদাসী ধমকাল 'পণ্টা, জ্যাঠামি করিসনে।'

পণ্টা কানে না নিয়ে ফের বলল—'দেখেছি।'

লক্ষ্মীদাসী পিটে চাপড় মারল—'পণ্টে, তুই চুপবি ?'

ফকিরচাঁদ বলল, 'ষেতে দাও, ছেলেমানুষ। তবে একটু আগলে-টাগলে রেখো। গতিক ভালো না। দিনসময় সুবিধে ঠেকছে না।'

পিছনে শহরে কিংবা মাঠের ওপ্রান্তে জাতীয় মহাসড়কে ফের হল্লার শব্দ, ফের কানফাটানো তীব্র গর্জন। ঝলকে ঝলকে আগুন। স্টেশনের দমকল-দুটো আচমকা স্টার্ট দিয়েছে। পালাচ্ছে হয়তো।

লক্ষ্মীদাসী বলল—'পেটে জন্তু সবাই পুষছি। তবে কথা কী জানো বাবা ওটা বলতে নেই। ঢাকতে হয়—মা বাবার এই রকম শিক্ষা ছিল। এই যে আমাকে দেখছো, আমি কিন্তু মরে গেলেও পারবো না, জেনো। শুধু ঘণ্টা-পণ্টারা ছেলেমানুষ...'

বুড়ো বলল—'সমিস্তেটা এখেনেই।' ঠিক যেমন করে পলাশগাঁয়ের চণ্ডী-মণ্ডপে বসে সমস্যার জট ছাড়াতো, সেই ভঙ্গি অবিকল। হাতের তালুতে আন্দাজ করে ফের বলল—'ছেলেমানুষগুলো কিছু বোঝে না। কেবল চেঁচায়।'

'চেঁচায়। আজ সারাদিন চেঁচাচ্ছে। গোলমালের ভয়ে বেরোতে পারি নি, ঘন্টাপণ্টাদের মুখের দিকে তাকানো যায় না।'

'কেঁদো না। আমার কাছে একটা পাউরুটি আছে। এই নাও।'

হাতড়ে হাতড়ে ফকিরচাঁদ পাউরুটি বের করে। ঘণ্টা-পণ্টা লাফিয়ে উঠে বসেছে। লক্ষ্মীদাসী পাতকুড়ো আর চাঁপাকে খামচায়—'ওঠ, দাদু কী এনেছে ছাখ···পাতু, চাঁপু, ওরে!'

আগুন কতরকম হয়, শীতই বা কত প্রকার! হিমবাহের মধ্যে আগুনের কুণ্ড ঘিরে বসে থাকার ধুম পড়ে গেছে। পাউরুটিটা যেন জ্বলছে। কাগজের মোড়ক খোলার দায় নেই। লক্ষ্মীদাসী বলে—থাম্, ওরে তোরা ব্যস্ত হস্‌নে। ভাগ করে দিই। বাবা, তোমাকেও দেব একটুখানি?'

ফকিরচাঁদের চোখে অন্যরকম দৃশ্য ভাসে। অন্ধকারে লক্ষ্মীদাসীর মুখে যেন লম্ফ জ্বলে। কিসান বৌ তার ভাতার বাটা শ্বশুর-শাশুড়িকে লম্ফ জ্বেলে যেন ভাত বেড়ে দিচ্ছে। 'আহা, হা···এ কী দৃশ্য দেখি'···বুড়ো কিসান তার থ্যাবড়া খুরপীধরা হাতের চেটো অন্ধকারে তুলে কী পরখ করে। দ্বারকা—বেহুলা—বাঁকী নদীর গেরুয়া জলের গন্ধ, নাকি তাদের প্রান্তবর্তী উর্বর নরম মাটি এখনও লেগে আছে। কিংবা সেই বাবলতলীর নাবাল মাঠের কচি গমের স্পর্শ। বুড়ো বলে, 'আহা হা হা··· '

'বাবা!'

'উঁ?'

'দিই এট্টুকুন!'

'থাক্ মা, খিদে নাই।' ফকিরচাঁদ এক নিশ্বাসে বলে। 'ইষ্টিশানের সিঁড়ির কাছে বুকে হাঁটছিলাম, তখন হঠাৎ এটা ঠেকে গেল হাতে। হয়তো আরও পড়ে আছে। চায়ের দোকানটা পুড়ে গেছে, তখন বোধ করি তাড়াহুড়ো মাল সামলাতে পড়ে গেছে টীন উজোড় করে।' তারপর পাতকুড়োকেই হঠাৎ খোঁচায়—'এই বাছা, যাবি নাকি?'

'না, না।' লক্ষ্মীদাসী আটকাল।···'না, না, বাবা; ও খুব শান্ত ছেলে। ওকে ঘাঁটিও না!'

বিশ্রামাগারের ওদিকে গাড়ির শব্দ। হেডলাইট নেই। গোঁ গোঁ গর্জন, তারপর ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষেছে। অমনি ভারী বুটের শব্দ, দড়বড়িয়ে সেপাইরা বুঝি নামল। পরক্ষণেই ছোটাছুটি ব্যস্ততা, গুলি ছোঁড়া অন্ধকারে, বিশ্রামাগারের ছাদে ক্রমাগত পাটকেল পড়ার শব্দ। শুনে ও দেখে লক্ষ্মীদাসী ততক্ষণে আশ্বস্ত।

পিপুল গাছের গোড়ায় সিমেন্টের চত্বরে নিচে এরা লুকিয়ে পড়েছে। লক্ষ্মীদাসীর শরীরের নিচে চারটে ছেলে। বুড়ো ফকিরচাঁদ যেন নিশ্চিন্তে চিৎ হয়ে শুল। ফিসফিস করে বলল, 'চারদিক থেকে লড়াই দিচ্ছে। বড়কর্তা আসবার আগেই লাশটা ওরা কেড়ে নিয়ে যেতে চাচ্ছে। কর্তা-টর্তার ধার ওরা ধারে না।'

লক্ষ্মীদাসীর মুখে রুটির শেষ দলাটা। গিলে নিয়ে চুপি চুপি বলল—'এত জেদ ভালো না কারুর।'

ফকিরচাঁদ হঠাৎ ক্ষুব্ধ। একটু মাথা তুলল। 'তুমি মা, একথা ভুলো না, বাছা।'

ছেলেপুলের মা নীরব সঙ্গে সঙ্গে। মুখ বুজে ভর্ৎসনা সইতে রাজী মুহূর্তে।

'ওই নামটা সবার মানসম্মান।'

'ঠিক বাবা, ঠিক।'

'ওটার জন্যে কতকাল লড়াই চলবে, তার লেখাজোখা নাই।'

এই সময় পন্টা বলল—'জল খাবো।'

শুনে ঘণ্টা বলল—'জল খাবো।'

পাতকুড়ো চিঁচিঁ করে ওইপ্রকার কী ইচ্ছে জানাল।

ফকিরচাঁদ বলল—'পালটফরমে জল আছে। কিন্তু যাওয়া ঠিক হবে না এখন। সকাল হতে দাও।'

পিপুলগাছের ঘন পাতার ভিতর হঠাৎ আগুনের ঝিলিক। প্রচণ্ড নির্ঘোষে এরা কাঠ হয়ে গেছে পলকে। ফকিরচাঁদ বাদে সবকয়টি চোখ বুজে গেছে। ফকিরচাঁদ শুয়ে থেকে দ্বারকা বেহুলা বাঁকীনদীর মাঠে শুয়ে থাকার কথা ভাবছে। ঝড় আর শিলাবৃষ্টির ঋতুতে এমনি করে ছোট্ট খড়ের কুঁড়ের ভিতর শুয়ে থেকেছে। ফকিরচাঁদের মন বলছে, চলো, চলে যাই, ফকিরচাঁদের গতর নড়ে না। কতদিন থেকে এই প্রত্যাবর্তনের সাধ মাথার ভিতর মগজ কুরে কুরে খায়, সে পা বাড়াতে পারে না। কোথাও একটা বাধার পাঁচিল, প্রচণ্ড তুফানকাঁপা নদী, হা হা হা হা ঝড়! আর শীত, এ কী শীত, বুকে দাঁত বসানো নিষ্ঠুর হিম, এ ঘোর নরক, 'আহা হা…' ফকিরচাঁদ ককায়। হঠাৎ বিষম শীত, হাড় কাঁপে থুথুর করে। ফাল্গুনের নিশিরাতে হাওয়া শিরশির করে পিপুলগাছের পাতায় পাতায়। পাতা ঝরে। শরীর গুটিয়ে ফকিরচাঁদ খামক বলে—'আহা হা হা!'

'বাবা, কী হলো? ও বাবা?'

'উঁ!'

'কথা বলছো না কেন?'

'বড় ঠাণ্ডা লাগে…'

'তা একটু ঠাণ্ডা আছে। নাকি জ্বর জ্বালা…' কপাল খুঁজে হাত এগিয়ে চলে লক্ষ্মীদাসীর!

ফকিরচাঁদ থামরু বলে—'তোমার হাতটা গরম, মা। এট্টুখানি রাখো।' তারপর পাশ ফিরে শোয়। গুলিবর্ষণ, বোমা বিস্ফোরণ, দমকলের ঘণ্টার শব্দ আগুন, ভস্মীভূত দিল্লীগামী ট্রেনের পৃথিবী ছাড়িয়ে সে দূরের দিকে চলে যায়, আরও দূরে। যেমন করে একদিন সে দ্বারকা-বেহুলা-বাঁকী নদীর প্রান্তবর্তী ফসলের ক্ষেতের দিকে থুপ থুপ করে হেঁটে গেছে।

কতক্ষণ পরে ফের সব স্তব্ধ হয়ে গেছে। দিল্লীর রেলগাড়ি জ্বালানো আগুন কখন ফের নিজ বিবরে যেন আত্মগোপন করেছে। ইতিমধ্যে পূর্ব শিয়রে ভাঙা চাঁদ। রুগ্ন জ্যোৎস্না থমকানো অন্ধকারের গায়ে এসে হেলান দিয়েছে। যেন ঝড়ের ধুলোয় ম্লান কাচের ওপারে মানুষের শহর এখন রূপ-কথার মায়াপুরী।

দেখতে দেখতে ফকিরচাঁদের মনে প্রতীক্ষা—বিবরবাসী আগুন আবার বেরিয়ে আসতে দেরী কিসের? সে বুক চেপে ধরে ঘড়ঘড় করে বলে—'এইতে হয়ে গেল?' আর ভৌতিক জ্যোৎস্নায় রেলিঙঘেরা মাঠটার দিকে সে তাকায় 'লাশটা কি নিয়ে যেতে পেরেছে?' সে ফিসফিস করে বলে—'পাতকুড়ো, ঘুমোস্ নি বাছা।'

লক্ষ্মীদাসী চমকে মুখ তুলেছে। সেও যেন চ্যাপটা মোটানাকওয়ালা ইস্কুলের ছেলের লাশটাকে দেখবার চেষ্টা করছে! অথচ বার বার কেবল ঘাসখেকো সকরুণশীল নির্বিকার গাধাছুটো জলছবির মতন ফুটে ওঠে। একবার মনে হয়, গাধাছুটো এ মাঠে যথেষ্ট ঘাস পায় নি। আর এ মাঠের রক্তমাখা ঘাসের ওপর হেঁটে হেঁটে হয়তো বা বড় বিমর্ষ তারা। হয় তো বা মুখ তুলে ফাটল-ধরা চন্দ্রোদয় দেখছে। কিংবা এই শহরের বুকে এখন গুরুতর শোক—এখন রাতের তৃতীয় যামে সেই শোকের স্তব্ধতায় বুঁদ হয়ে গাধাদুটি একান্তমনে বিষাদপান করছে আকাশের দিকে মুখ তুলে।

মধুপুরের ছেলেপুলের মা-হিসেবে খুবই রেগে গেল লক্ষ্মীদাসী। চাপা স্বরে ফোঁসফোঁস করে বলল, 'বাবা, ও বাবা!'

'উঁ?'

'ওই মাঠে দুটো গাধা আছে।'

'দেখেছি।'

'ওদের মরণ নাই?'

ফকিরচাঁদ হাসবার চেষ্টা করল। করে বলল—'না'

'ইচ্ছে করে পাটকেল ছুড়ে তাড়িয়ে দিয়ে আসি।' লক্ষ্মীদাসী ধুড়মুড় করে উঠল।

'উঁ হু হু হু। তা করো না।'

চাঁপাকে স্তন থেকে ছাড়িয়ে দিয়ে লক্ষ্মীদাসী বলল—'বড় খারাপ লাগে কিন্তু। বুঝলে?'

ফকিরচাঁদ কী জবাব দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু ঘণ্টাপণ্টারা একই সঙ্গে ধুড়মুড় করে উঠে পড়েছে। 'জল, জল খাবো মা!'

লক্ষ্মীদাসী থাপ্পড় চালাল এলোপাথাড়ি। 'চুপ চুপ সব্বনেশে ডাকাতেরা, মরণ শিয়রে, পা বাড়াতে নাই, জানিসনে?'

ঘণ্টাপণ্টারা ফোঁসফোঁস করে কাঁদছে। কেবল পাতকুড়ো চুপ করেছে।

ফকিরচাঁদ বলল—'তা জল এখন খাওয়া যায়। প্লাটফরমে কল আছে।'

এই শুনে লক্ষ্মীদাসী উঠল। 'এই রাক্কস খোক্কস, ওঠ…চল্…' কিন্তু যেই উঠে দাঁড়ালো, একঝলক জোরালো আলো এসে পড়ল। তারপর জুতোর নালে ইটের চত্বরে খট্খট্ আওয়াজ। ব্যস্ততা আর দৌড়াদৌড়ি। কি একটা দারুণ গরম চুলের উপর দিয়ে ছুঁই ছুঁই করে ছুটে গেল আর প্রচণ্ড বিস্ফোরণের বীভৎসতা। লক্ষ্মীদাসী অস্ফুট কণ্ঠে চিৎকার করে উবুড় হয়ে পড়েছে সঙ্গে সঙ্গে। ঘণ্টাপণ্টা পাতকুড়ো একদৌড়ে বুড়োর কাছে চলে এসেছে—দুজানুতে তলপেটে মুখ ঘষছে। পাশে চাঁপা চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল।

নাঃ, মরেনি লক্ষ্মীদাসী। বুক ঘষড়ে এগোচ্ছে। 'বাবা, বাবা গো…'

'মা…'

'আর এট্টু হলেই…'

'পালিয়ে আয়।'

বুটের শব্দ স্টেশনের ওদিকে। টর্চের আলো ক্রমশঃ বড় হতে হতে পিপুলতলার অন্ধকার জগতে সর্বগ্রাসী হয়ে উঠছে। তারপর খুবই কাছে—

'কে? কারা এখানে?'

অভিজ্ঞ ফকিরচাঁদ উঠে বসে বলল—'সেলাম বড়বাবু! আমি ফকিরচাঁদ। ও লক্ষ্মীদাসী, আমার মেয়ে।'

লক্ষ্মীদাসী ঝড়ের মুখে ঝোপের মতন নিজেকে গুটিয়ে নেবার চেষ্টায় ব্যস্ত। মুখ তুলল না। যাদের হাতে তার প্রাণ যেত, আর প্রাণ গেলে ঘণ্টাপণ্টারা 'মা' বলে কাঁদত, একা, অসহায় কয়েকটি ছেলেমেয়ে এই পৃথিবীতে—তাদের দিকে তাকাতে বড় ত্রাস। জানু পাথরের অধিক গুরুভার। বুক কাঁপছে ধুক ধুক ধুক ধুক। রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। তার বলার ইচ্ছে—'ওগো জজপুরুষেরা, দয়া করে চলে যাও'…এই ইচ্ছে পাথর আর ঠাণ্ডাভরা দেহ, দেহের সর্বত্র অবরুদ্ধ পোকার মতন নিঃসহায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। অথচ কী নিরুপায়।

'বড়বাবু, আমরা ভিখিরী। ইষ্টিশেনে ভিক্ষে করে খাই, বাবু।' ফকিরচাঁদ ফোকলা মুখ হা করে হাসছে।

'চালাকি করছো না তো?'

'আজ্ঞে লা।' না শব্দটা ফোকলা হাসিতে 'লা' হয়ে গেল।

'মিছিলে এসেছিলে, লুকিও না!'

'আজ্ঞে তাও লা।'

কিছুক্ষণ স্তব্ধতা। তারপর বিশ্রামাগারের ছাদে দড়বড় করে পাটকেল পড়ার আওয়াজ। তারপর শাণ্টিং লাইনের ওদিকে হঠাৎ এতক্ষণ পরে কোন অকেজো বগিতে আগুন জ্বলে উঠল দাউদাউ করে। বন্দুকের নল ঘুরিয়ে এরা ছুটল সঙ্গে সঙ্গে।

ফকিরচাঁদ বলল—'তামাশা করছে বড়বাবুদের সঙ্গে। বুঝতে পারলে গো?'

লক্ষ্মীদাসীর নীরব কান্না এতক্ষণে ফেটে পড়ল! 'বাবা, বাবা গো, যদি মরে যেতাম…'

'চুপ করো। হুই ভাখো, আবার লড়াই বেধে গেছে।'

আবার লড়াই বেধেছে। রেলিঙের পার্কটা কেন্দ্র করে শেষ রাতে এবার চরম লড়াই। চ্যাপটা মোটা নাকওলা ইস্কুলের ছেলেটির মৃতদেহ সবার চোখের ঘুম কেড়েছে। যে হাত আগুন জ্বালল, তার চোখে ওই ছবি। আর যে হাত গুলি ছুঁড়ল, তারও চোখে ওই ছবি।

পিপুলগাছের উত্তরে, ঠিক বৃত্তাকার চত্বরটার নিচেই একটা গভীর খাদ। গুড়ি মেরে এরা সেখানে এসে গড়িয়ে পড়েছিল একসময়। কারণ উপরের পৃথিবীতে তুলকালাম কাণ্ড শুরু হয়ে গিয়েছিল। ভোর রাতের অস্পষ্ট আলোয় অপেক্ষমান ঐক্যবদ্ধ কণ্ঠস্বর ফেটে পড়ছিল। পার্কের এককোণে গাধা দুটি তখনও ঘাস খাচ্ছিল নির্বিকারভাবে।

'পাতকুড়ো, পাতকুড়ো কই?' হঠাৎ আলো-আঁধারিতে ছেলেদের দিকে তাকিয়ে লক্ষ্মীদাসী অস্ফুট চিৎকার করল।

ফকিরচাঁদ খামরু তখন ঝিমোচ্ছিল। সে একটা স্বপ্ন দেখছিল। কিংবা দেখবার চেষ্টা করছিল। এমনি ফাল্গুনের সারাটি রাত গত বছরও সে বাবলতলীর নাবাল মাঠে তার ছোট্ট গমের ক্ষেতে কাটিয়েছে। এমনি হিমনম্র কুয়াশাময় রাত। আর ঠাণ্ডা ভেজা ন্যাকড়ার মতন চাঁদ যখন দ্বারকা-বেহুলা-বাঁকা নদীর পশ্চিম শিয়রে ঝুলছে, তখনও ফকিরচাঁদ খামরু বুড়ো নড়বড়ে গতরে খুরপী চালিয়েছে নরম অস্পষ্ট মাটিতে। শেষ রাতে দূর গোকরণের হাটুরেরা বেলডাঙার হাটের পথে যেতে যেতে চেঁচিয়ে ওকে বলেছিল—'হেই খামরু বুড়ো, রাত যে পুইয়ে গেল!' গেল তো গেল, ভ্রূক্ষেপ নেই। কোথা দিন কোথা রাত কী গ্রীষ্মবর্ষা কী শরৎশীত ফকিরচাঁদ খামরু ক্ষেতে কাজ করে।…'শীতে মরে যাবে, বুড়োমানুষ!'…এইতে ফকিরচাঁদ হেসে বাঁচে না।…'তা অনেক শীর্ত আমি দেখেছি। দেখতে দেখতে যাই।'…

ফকিরচাঁদ সেই স্বপ্ন দেখছিল। পলাশগাঁর মুকুন্দ কুনাই তাকে ডাকছিল—'চলো, চলো খামরু হে, মাঠের বাগে যাই।' 'আর এই সময় কোথাকার মধুপুরের লক্ষ্মীদাসী তাকে শুঁতোচ্ছে—'ও বাবা গো আমার পাতকুড়োটা কই?'

ক্রুদ্ধ ফকিরচাঁদ নড়বড় করতে করতে বলল—'কী জালাতন! ছাখ গে না কোথা তোর হাতকুড়ো না কাতকুড়ো…'

লক্ষ্মীদাসী বুক চেপে ধরেছে দুহাতে। ওঠবার সাধ্য নেই। ওপরে বিষম গোলযোগ। কী সব চলছে, কে জানে।

'ওরে পাতকুড়ো রে মানিক আমার…'

ফকিরচাঁদ সামলে নিয়েছে। কোথায় বাবলতলীর মাঠ, কোথায় রূপপুর রেলস্টেশন! সে মাথা তুলে ওপরটা দেখল। স্টেশনের সিঁড়ির নিচে—অসংখ্য

দলপাকানো মোড়কআঁটা পাউরুটির দলা—আর তার উপরে আছে হাত পা ছড়িয়ে একটা ন্যাংটা ছেলে।

পাতকুড়ো ছাড়া কে হতে পারে! ইস্কুলের ছেলেরা তো পোশাক পরে থাকে। সুতরাং…

'মা, লক্ষ্মীদাসী, তোকে একটা কথা বলি। উতলা হবি না তো?'

'না, বাবা, না। বলো, কী দেখলে?'

'খাবলা খাবলা মানুষ।'

'আর, আর কী?'

'সবখানে হু হু আগুন জ্বলছে।'

'আর, আর কী দেখলে?'

'বেড়া ভেঙে একদল লোক ঢুকেছে ওই মাঠে।'

'ইস্কুলের ছেলেটাকে নিতে বুঝি?'

'হ্যাঁ। আর…' ফকিরচাঁদের থলথলে ফ্যাকাসে চোখ ক্রমশ বড় হয়ে উঠেছে। আলোর হাত তার পাকা চুলের গোছা খামচে ধরেছে। তার চোখদুটি লক্ষ্মীদাসীর দিকে এগিয়ে আসছে।

'বাবা, অমন করে চেয়ো না। আর কী দেখলে?'

ফকিরচাঁদ স্তব্ধ।

লক্ষ্মীদাসী তাকে ঝাঁকুনি ভায়—'বলো, দোহায় তোমার!'

'উঁ!'

'পাতকুড়োকে দেখলে?'

'হুঁ।'

'দেখলে, সত্যিসত্যি দেখলে?' লক্ষ্মীদাসীর মাতৃজঠর থেকে আলো ছুটে এসে মুখমণ্ডলকে উদ্ভাসিত করে।

'দেখলাম।'

'ও হতভাগা কী করছে ওখানে?'

'রুটি খাচ্ছে…' ব্যস্তভাবে ঝোলাঝুলি গোছাতে থাকে ফকিরচাঁদ। ফ্যাক ফ্যাক করে হাসে কিংবা কাঁদে।

তখন লক্ষ্মীদাসী উঠল। খাদের উপর মুখ তুলল। পাউরুটির ওপর শুয়ে থাকা ছেলেকে দেখল। হাতে একটুকরো পাউরুটি, তার উপর রোদের আলো—রক্ত। 'কী দেখলাম কী দেখছি বাবা,…' লক্ষ্মীদাসী চিৎকার করে বাইরে চলে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

আর ফকিরচাঁদ থামকও উঠল। ঘন্টা পন্টা তার দুপাশে খাড়া হয়েছে। লোভে মুখ চকচক করছে তাদের। কিছু একটা সুখকর ঘটেছে সম্ভবত। ঘুমন্ত মেয়ে চাঁপাকে কোলে তুলে নিয়ে খাদের পাড়ে উঠে গেল ফকিরচাঁদ। লক্ষ্মী-দাসী হাত তুলে চিৎকার করে বলল—'খবরদার, এসো না এখেনে। ডাকাবুকো বুড়ো, সকল নাটের গুরু তুমি…।'

বড়কর্তা আসবার আগেই ইস্কুলের ছেলের লাশে ফুলের মালা পরিয়ে শহর শান্ত হচ্ছিল। দীর্ঘ শোভাযাত্রা চলছিল জাতীয় মহাসভাকে। ঘন্টা-পন্টা চাঁপাকে তার মায়ের কাছে পৌঁছে দিয়ে ফকিরচাঁদ ফিরে আসছিল স্টেশনে পিপুলগাছের দিকে। গভীর দুঃখে সে আড়ষ্ট। পিছনে সারা শহর যেন তাকেই ষড়যন্ত্রকারী বলে ধিক্কার দিচ্ছে।

লক্ষ্মীদাসী তার ছেলেপুলেদের নিয়ে শোভাযাত্রার ভিড়ে এগিয়ে গেছে। শহর এতদিন পরে লক্ষ্মীদাসীকে মায়ের মর্যাদা দিয়েছে—তাই সে অহঙ্কারে মাথা উঁচু করে হাঁটছে। শোকের অহঙ্কারে শহরের মাথাও খুব উঁচু হয়ে গেছে।

এদিকে ভাঙা রেলিঙ গলিয়ে পার্কে নামল ফকিরচাঁদ। গাধাদুটি কি মালিকবিহীন? এখনও ঘাস খাচ্ছে। ফকিরচাঁদ দেখতে দেখতে ক্ষেপে গেল। তাড়া করল ইঁট তুলে। তারা নির্বিকার। মার খেলেও নড়ে না।

ঘাসের উপর রক্ত দেখবার সাধ হয়। ফকিরচাঁদ হাঁটু দুমড়ে বসে। ঘাসে রক্ত খোঁজে। তারপর নাক ঘষে। গন্ধ শোঁকে। একটু দূরে দাঁড়িয়ে গাধাদুটি যেন বিস্মিত। প্যাটপ্যাট করে তাকায়।

ঘাসে মানুষের রক্তের গন্ধ নেই। গন্ধ ধরা পড়ে না! তবু ফকিরচাঁদের মনে হয়, সারা জীবন এমনি করে মাটির উপর ঝুঁকে পড়ে সে কী একটা গন্ধ শুঁকবার চেষ্টা করেছে কেবল। মানুষের রক্তের গন্ধ—যা পাতকুড়োর ভুক্তা-বশিষ্ট রুটিতে সে পেয়েছে—যা সে পেতে চেয়েছিল লুণ্ঠনাবশিষ্ট রুটিগুলিতে।

—

মালী

লোকটাকে একরকম পথ থেকে ধরে এনেছিলাম। কোমরে একফালি নোংরা ন্যাতা, একমাথা রুক্ষ চুল, খোঁচা খোঁচা গোঁফদাড়ি, থ্যাবড়া নাক, হলুদ দাঁত—সে ছিল একজন সত্যিকার পথের লোক। সম্ভবত পথেই সে শুত ঘুমোত বসে থাকত খেত এবং হাঁটত। অন্তত তাকে দেখে সেই রকমই মনে হয়েছিল। অসম্ভব ঢ্যাঙা আধন্যাংটো একটা দেহ—নিতান্ত দেহ, যখন খুব আস্তে আস্তে পা ফেলে হেঁটে যায়, সহজেই মনে হতে পারে যে সে থামতে পারে না। তার সামনে শুধু বাধাবিহীন পথ—যে পথে গাড়ি চলে না, লোকজন হাঁটে না—তাই সে একা। এবং এরকম পথ কদাপি তো জনপথ নয়; সবটাই তার ব্যক্তিগত। খুব ছেলেবেলা থেকে অশেষ পরিশ্রমে মাটি কুপিয়ে জঙ্গল সাফ করে জনপদ ভেঙে যেমন এ পথ সে তৈরি করেছে তার হাঁটবার জন্যে। আমৃত্যু সে শুধু হাঁটবে আর হাঁটবে।

শহরতলির দিকে থাকি। বাড়ি ফেরার সময় ট্রেন থেকে নেমে তাড়াহুড়োয় রিকশোর সঙ্গে দরাদরি করছি। একগাদা জিনিসপত্তরের বোঝা আছে। রিকশোটা গড়াতেই হঠাৎ কোত্থেকে বিশাল ভূতের মতন লোকটা সামনে এসে দাঁড়াল। বড় বড় হলুদ দাঁত বের করে হাসল সে। তারপর আঙুল দিয়ে রিকশোর চাকার কাছটায় কী দেখাল।

আরে, তাই তো! একটু ঝুঁকে দেখি, নিনির জন্যে কেনা মস্তো পুতুলের প্যাকেটটা কখন পড়ে গেছে নিচে। রোখো, বলে চেঁচিয়ে লাফ দিয়ে নামতে যাচ্ছিলাম, লোকটা দৌড়ে এসে প্যাকেটটা কুড়িয়ে দিল। মুখে সেই অদ্ভুত হাসি—চমকে উঠলাম। এ কী হাসি! সারা মুখটা হাসছে। পুরু ভুরুর নিচে কোটরগত উজ্জ্বল আশ্চর্য একজোড়া চোখ! অবিশ্বাস্য—ভিখিরিদের এ চোখ আমি কখনও দেখিনি।

আমার মেয়ে নিনির জন্মদিনের এ পুতুল। ভিতরের দিকে খুব নরম জায়গায় টুং করে বাজল। কৃতজ্ঞতায় ওর হাতে একটা দশপয়সা গুঁজে দিতে গেলাম। নিল না—পিছিয়ে গেল। মুখ থেকে হাসিটা নিভে গেল হঠাৎ। সেই উজ্জ্বল আশ্চর্য চোখে দেখতে পেলাম কী যেন আকৃতি। কপালের ভাঁজ-

গুলোকেও মনে হল ওরা সব বিষণ্ণতার রেখা। রিকশোওলা দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলল, আব্বেরে জামাই! ভাগ ব্যাটা।

আমি বললাম, ওহে রিকশোওলা, এক মিনিট ভাই।…পকেট থেকে আস্ত একটা আধুলি বের করলাম। হাসতে হাসতে বললাম, ঠিকই তো। দশ পয়সার আবার দাম আছে আজকাল? এই নাও ভাই…

রিকশোওলা বলল, আরে, ওকে ওসব কী দিচ্ছেন? ও নেবেই না দেখুন। ব্যাটা ভূত কোত্থেকে এসে উদয় হয়েছে—আস্ত বোবা। কথা বলতে পারে না। ওই দেখুন না কাণ্ড। বুঝতে পারছেন কী চায়?

লোকটা এবার একটা হাত মুঠো করে কী যেন বোঝাবার চেষ্টা করছিল—সেই সঙ্গে আরেকটা হাতের ইশারায় তার সামনে পায়ের কাছে চারদিকে মাটির ওপর কী দেখাচ্ছিল। একটুও বুঝতে পারলাম না।

রিকশোওলা বলল, বুঝলেন না? পথের পাশে ওইসব জায়গাগুলো দেখতে পাচ্ছেন?

অবাক হলাম। হ্যাঁ।

ব্যাটা সব সময় ওখানে বসে কাঠি দিয়ে মাটি খোঁড়ে। আস্ত শুওর।

কেন? মাটি খোঁড়ে কেন?

কে জানে কেন। পাগল ছাগলের কাণ্ড।

সে বুঝলাম। কিন্তু আমাকে কী চাচ্ছে ও?

রিকশোওলা প্যাডেলে চাপ দিয়ে বলল, প্রথম প্রথম বুঝতাম না বাবু, এখন বুঝতে পারি। ও একটা খুরপি দিয়ে মাটি খুঁড়বে বলছে। তার মানে, ও মালীর কাজ জানে। মালীর কাজ চায় কোথাও। বুঝলেন?

সে তো ভালোই।…ওকে আমি কাছে ডাকলাম।

এবং এভাবেই সে আমার বাড়ি চলে এল। সামনে একটুখানি জমিতে সে মালীর কাজ করতে থাকল দিনের পর দিন। সে কথা বলে না। বলতে পারে না। কিন্তু তার নিষ্ঠার শেষ নেই। আমার ছেলেমেয়েদের সে ভালোবাসে। তাদের ঘোড়া হয়ে পিঠে বয়। তাদের সঙ্গে খেলাধুলোও করে। দৌড়ে বল কুড়িয়ে আনে। কখনও সখনও সংসারের ফাইফরমাসও খাটে। জানতে পারছিলাম, সে পাগল নয়—বোবা। এবং ভীষণ দুঃস্থ। হয়তো বেকারদায় পড়ে বিনাদোষে কোন বড়লোকের বাগানের মালীর কাজটা তার চলে গিয়েছিল।

তারপর একদিন দেখি, আমাদের বাড়িটা যেন ওই লোকটির হাসির মতন আশ্চর্য সরল একটি হাসিকে ফুটিয়ে তুলছে। সামনের জমিতে ফুল ফুটেছে নানা রঙের। একফালি ফুলবাগিচা এসে বাড়িটাকে যেন উদ্দেশ্যময় করে তুলেছে। আর সে মাঝে মাঝে ফুলের গাছের নিচে থেকে মাথা তুলে হঠাৎ দাঁড়ায়। চার পাশটা দেখে নেয়। কী ভাবে। আবার হাঁটু মুড়ে বসে নিজের কাজ করে যায়। কখনও সে বাগিচা থেকে একটু দূরে সরে এসে কী লক্ষ্য করে। ভ্রূ কুঁচকে কী ভাবে। মাথা দোলায়। বড় অদ্ভুত তার আচরণ। আমি কিছু বুঝতে পারিনি।

কিন্তু তার এই কাজের মধ্যে দিয়ে আমার একটা আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটছিল চুপিচুপি। জানালার বাইরে বাগানটুকুর দিকে তাকালেই হঠাৎ আমার মনে হচ্ছিল, জীবনে এতগুলো দিন যেন অকারণ ব্যস্ততায় কাটিয়ে দিয়েছি···এবার অবকাশের দিকে মাঝে মাঝে চোখ মেলা দরকার। এত বেশি কেজো মানুষ হবার সত্যি কোন লাভালাভ ছিল কি? এত ছুটোপুটি ট্রেন ধরার জন্যে নাকে মুখে ভাত গুঁজে দৌড়নো, ফাইলপত্তর ঘাঁটাঘাঁটি, বার বার নানা অছিলায় বড় সায়েব ছোট সায়েবের মুখ দেখে আসা—যেন 'এইতো স্যার, বান্দা সব সময় আপনার সেবার জন্য তৈরি' বলার প্রাণপণ প্রয়াস, দারুণ ধরনের দাসমনস্কতা, বাড়ি ফেরার ট্রেন ধরার জন্যে আধঘণ্টা আগেই লিফটে মরণঝাঁপ—সব কুৎসিত মনে হতে লাগল। এক সার্বভৌম সত্তা আমার কেজো মানসিকতার বস্তা ফুঁড়ে গজিয়ে উঠছিল দিনে দিনে—রাজার মতো দাম্ভিক তার আচরণ। সে এক ঋজু বৃক্ষের উদ্যমে আকাশভেদী। চাকরকে সে ঘৃণা করে।

হঠাৎ দেখেছি বুগানভেলিয়ার লাল ফুলের ঝাঁক, হঠাৎ মনে হয়েছে আমি কোনখানে এক সাম্রাজ্যের অধীশ্বর! ওই সবুজ পপি চারার ঝাঁকে সম্ভাবিত নক্ষত্রের প্রতীক দেখেছি—যে নক্ষত্র আকাশের কোন প্রান্তে জন্মের অপেক্ষায় ছটফট করছে। প্যান্সির সরু ডালের ডগায় হরিদ্বর্ণ প্রস্ফুটন দেখে মনে হয়েছে, কেন আজ আমার ছুটি নেই? ছুটি—হ্যাঁ, এই ছোট দু অক্ষরের শব্দটি কিন্তু এক বিশালতা বা পরিব্যাপ্তির দরজা খোলার ঘণ্টাধ্বনি। একেকটি প্রস্ফুটন এবং একেকটি নতুন নতুন দরজা খুলে যাওয়া। প্রতিদিন এর ফলে আমাকে নিপুণভাবে দাড়ি কামাতে হয়। সব সময় থাকতে ইচ্ছে করে পরিপাটি ফিটফাট

ফুলবাবুটি। দেহের মাংস সুগন্ধে ঢেকে রাখতে ব্যস্ত হই। স্নো-ক্রীম পাউডার পেস্টের খরচ বেড়ে যায়। স্ত্রী বলেন, তুমি বড় সুন্দর হচ্ছ দিনে দিনে। ব্যাপার কী? কোথাও লুকিয়ে প্রেমট্রেম করছ না তো?···আমি শুধু হাসি। কখনও বলি,—তার উদ্দেশ্যে নয়, নিজেকেই বলি—জীবনের বড় মায়া।

জীবন। হ্যাঁ, জীবনের দিকে চোখ দুটো ঘুরে গিয়েছিল। সেই বোবা লোকটার কাছে দাঁড়িয়ে যখন দেখতাম, ভিজে মাটি থেকে বীজ ফাটিয়ে সূর্যোদয়ের মতো অঙ্কুরোদ্গম, মন ভরে যেত সৃষ্টির বিহ্বলতায়। তারপর আস্তে আস্তে তার রঙ সবুজ হয়েছে, নরম ডগা বাড়িয়ে দিয়েছে সে আকাশের দিকে, শিশুর মতন তার সরলতা এবং নিষ্পাপ ক্ষুধা, তার তৃষ্ণার ধ্যান পৃথিবীর গভীরে, তারপর চিরোল পাতার উদ্ভব, তার ছোট্ট ব্যাপ্তির আকুলতা···এসব কী অসাধারণ অবিশ্বাস্য অলৌকিক প্রত্যক্ষ করছি আমি! কোথায় ছিল এরা? কেমন করে এল? কেন এল?···লোকটা হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে হেসেছে —আঙুল তুলে দেখিয়েছে যেন সেই অলৌকিককে। আমার প্রশ্নময় বিস্ময়কে তার মূকত্ব যেন একটা লম্বা উঁচু দেয়াল দিয়ে রুখেছে। আমার মনে হয়েছে, কেন এল এই প্রাণ, কোথা থেকে এল—কোথায় বা সেই পরিব্যাপ্ত প্রাণময়তার বহতা ধারা—সবই ওর জানা। ও বোবা, তাই সে রহস্য প্রকাশ করতে পারছে না। জীবনের মূল যা কিছু, সবই ও এতদিন ধরে খুঁজে খুঁজে শেষ করে ফেলেছে যেন। তাই প্রকৃতি ওর কথা বলার ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছেন।

আমার ভিতরের পরিবর্তন বাইরে প্রকট হচ্ছিল। খুব ঢিলেঢালা আলসে এবং বেশ খানিকটা ভোগী হয়ে পড়ছিলাম। আপিসে লেট হত। ফাইলের কাজ জমে যেত। মাইনে কাটা যাচ্ছিল। তবু বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে— আসতে বা যেতে দূর থেকে বাগানটা দেখে আমার মনে হত আমি সুখী। আমার ছেলেমেয়েদের মনে হত আরও সুন্দর আরও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। আমার স্ত্রীকে ওই বাগানের ধারে দেখলে মনে হত পরীদের কেউ না কেউ এসে গেছে আজ।

সেই লোকটাকে আমি আমার জীবনের অচ্ছেদ্য সত্তা ধরে নিচ্ছিলাম। ওকে এত ভাল লাগছিল। ওকে সুখে স্বচ্ছন্দে রাখবার চেষ্টা করছিলাম যথাসাধ্য! ভাল জামাকাপড় জুতো ভাল খাবারদাবার—এমনকি সিগ্রেটও কিনে দিতাম। কিন্তু ও ছুঁত না পোষাক-আসাক জুতো সিগ্রেট ভাল খাবার-দাবার। শুধু হাসত। আর বেছে নিত নিতান্ত একটা গামছা আর গেঞ্জি। ফুলগাছের

সীমানার বাইরে সে বড় একটা থাকতে চাইত না। শুধু রাত্রিবেলাটা সে তার খাটিয়াটা বাইরের বারান্দায় পেতে ঘুমোত কিংবা ঘুমোত না। কারণ, কতবার গভীর রাত্রে বাইরে তার নড়াচড়ার শব্দ শুনেছি। কতবার জ্যোৎস্নায় কিংবা অন্ধকারে তার বিশাল ঢ্যাঙা দেহটা নড়তে দেখেছি বেড়ার ধারে। সে কি বীজ থেকে অঙ্কুরোদ্গম কিংবা ফুলের প্রস্ফুটন লক্ষ্য করতে চাইত? আমারই মতো?

আমারও ঘুম ভেঙেছে হঠাৎ মধ্যরাতে। জানালা দিয়ে হাওয়া এসেছে। তাই, ঘরের ভিতরটা মউমউ করছে হাসনুহানা কি রজনীগন্ধার মিঠে গন্ধে। এতক্ষণ ঘুম আসেনি। হয়ত গভীর সুখে হয়ত বা গভীর বিস্ময়ে।

হঠাৎ একদিন আমাব ছোট ছেলে মিঠু দৌড়ে এসে বলল, বাবা বাবা। দেখে যাও—একটা গাছের পাতা শুকিয়ে যাচ্ছে।

বেরিয়ে দেখি, সত্যি তাই। এত বড হাসনুহানার ঝাডটা, পাতাগুলো মিইয়ে গেছে। দৌড়ে গিয়ে কাছে দাঁড়ালাম। কোন রোগে ধরেছে? লোকটা নিজের মনে কাজ করছিল। একটা গোলাপেব গোড়া খুবপি দিয়ে কোপাচ্ছিল। তার কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে ব্যাপারটা দেখালাম। সে একবার তাকাল মাত্র গাছটার দিকে। ফের মাটি কোপাতে থাকল। দুঃখে আমার মনটা অস্থির। তার সামনে গিয়ে ধমক দিয়ে বললাম, গাছটার কী হয়েছে দেখবে, না কী?

জবাবে মুখ তুলে একবার দেখে নিল আমাকে। ঠোঁটের কোণটা একটু কুঁচকে গেল। কেমন সূক্ষ্ম একটু হাসি যেন। ফেব সে খুরপি চালাল ঘাসের গোড়ায়।

পরদিন দেখি, প্রকাণ্ড বুগানভেলিয়া হেলে পডেছে—মিয়নো পাতা। রাগে দুঃখে অস্থির হয়ে গোড়াটা লক্ষ্য করলাম। মৃদু টান দিতেই ব্যাপারটা টের পাওয়া গেল। কে মূলের দিকটা নিপুণভাবে মাটির ভিতরে কেটে দিয়েছে।

নির্ঘাত কোন প্রতিবেশী পরশ্রীকাতর মানুষের কীর্তি। কারণ, আমার তো কোন শত্রু আছে বলে মেনে নিতে পারছি না।

মালীকে ডেকে দেখালাম। সে শুধু আমার দিকে তাকাল। ঠোঁটের কোণে সেই কুঞ্চনটা দেখতে পেলাম এবার। তারপর সে যখন খুরপি হাতে নিয়ে এগোচ্ছে, বললাম, তোমার কোন দুঃখ হচ্ছে না? রাগ হচ্ছে না?

বোবা মালী গ্রাহ্যই করল না কিছু।

তার পরদিন আমার সবচেয়ে প্রিয় মালতী লতাটার মৃত্যু হল।

পরের দিন গেল কামিনীচারাটা।

তারপর প্রতিটি সকাল মানেই একেকটি দুঃসংবাদ। একেকটি ভয়ংকর বিনাশ। একটি করে নিদারুণ দুঃখ।

তাকিয়ে দেখি, সাজানো বাগান শেষ হয়ে গেছে প্রায়। নষ্ট সৌন্দর্যের হাটে যে প্রজাপতিটা অভ্যাসের বশে উড়ে আসছে, তাকে বড় অলীক লাগে। আশ্চর্য, বোবা মালীর কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। সে আগের মতো ইশারায় বীজ বা কলম আনতে বলে না নার্সারি থেকে। কী যেন ভাবে। আস্তে আস্তে হেঁটে বেড়ায় শ্মশানের মাঝখানে, ঠোঁটের কোণে সেই সরু কাঁপনটা লক্ষ্য করে চমকে উঠি।

সেরাতে জেগে আছি কড়া পাহারায়। শত্রুকে আজ হাতে নাতে ধরবই ধরব। মধ্যরাত পেরোল। চাঁদ উঠল দিগন্তে। ক্ষয়ের চাঁদ। আবছা জ্যোৎস্না। হঠাৎ একটা নড়াচড়া চোখে পড়ল। চুপিচুপি বেরিয়ে গেলাম। বাগানে কে একজন কিছু করছে। টর্চ জ্বাললাম। চমকে উঠলাম। শরীর শিউরে উঠল! শেষ গাছটির তলায় ঘাসকাটা লম্বা ছুরি ফুঁড়ে বসে আছে আমার সেই বোবা মালীটা!

পরক্ষণে সে মুখ ফেরাল এদিকে। বড় বড় দাঁতের ও হাসি তো মানুষের নয়। আসলে ওটা হাসিই নয়। দিনের সেই সরল হাসির এ এক বিকৃত দর্পণবিম্ব।

চিৎকার করে উঠলাম, শয়তান!

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল সে। তারপর আমাকে একটুও গ্রাহ্য না করে বেড়া ডিঙিয়ে বেশ আস্তেসুস্থে পা ফেলে জ্যোৎস্নাময় দুর্গমতায় মিশে গেল।

একটা পিস্তল ও ডুমুর গাছ

বোকা আমাকে দেখে দাঁড়িয়ে গেল। বলল, ছিরুদা যে গো! কখন এলে?

বললাম, রাত্তিরে। তুমি কেমন আছ, বোকা?

খুব ভাল না, খুব খারাপও না। বলে বোকা এসে বারান্দার ধারে পা ঝুলিয়ে বসল।

ওর মধ্যে একটা রূপান্তর চোখে পড়ল এবার। দুবছর আগেও গ্রামে এসে ওকে হাসিখুশি দেখেছি ছোটবেলার মতোই। এখন দেখছিলাম পোড়খাওয়া চেহারা, বসা চোখ, ঠেলেওঠা চোয়াল আর নাক। ওর পরনে আঁটোসাঁটো ছাইরঙা প্যান্ট, নীলচে হাতকাটা গেঞ্জি, পায়ে রবারের দুফিতের স্যাণ্ডেল। তাছাড়া ওর চোখের চাউনিতে শীতলতা, পাতা পড়ে না। কণ্ঠস্বরও মৃদু। ওর হাতে একটা গামছা, সেটা ছোট্ট পুঁটুলির মতো জড়ানো। জিগ্যেস করলাম, অসুখ হয়েছিল নাকি?

বোকা আস্তে মাথাটা নাড়ল।

গামছায় কী?

পিস্তল।

অন্তত আধমিনিট লেগে গেল শব্দটা বুঝতে। তারপর হেসে ফেললাম। 'পিস্তল' নিয়ে কোথায় গিয়েছিলে এখন?

টার্গেট প্র্যাকটিস করতে যাচ্ছি।

আরও হেসে বললাম, কোথায় টার্গেট প্র্যাকটিস করবে?

বোকা ঘুরে পেছনদিকের ছোট্ট পানাপুকুরটা দেখিয়ে বলল, ঘাটের মাথায় ডুমুর গাছটা দেখছ, ওখানে।

আমাদের বাড়ির এদিকটায় মাঠ। এই চৈত্রে ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের দরুন চোখে আঠার মতো মেখে যায় বিশাল একটা সবুজরঙের কোমলতা। বারান্দার উত্তরে পানাপুকুরের দিকটা সমসময় নিঝুম নিরিবিলি হয়ে থাকে। পুকুরের তলায় ঠেকেছে জলটা। তাই ঘাটটাও স্মৃতিচিহ্নে পরিণত। তার মাথায় ওই ডুমুরগাছ, বয়সে ঠাকুর্দারও ঠাকুর্দার মতো প্রাচীন এবং যথেষ্ট স্থিতপ্রজ্ঞ তার চেহারা। ঠাকুর্দা ছিলেন রেলের চাকুরে। ছুটিতে এসে এই বারান্দায় বসে বলতেন, এখানটাতেই যত শান্তি। ঘাটে বসে থাকোমণি বেওয়া, সম্ভ্রান্ত ঘরের যুবতী ছিলেন তিনি, একটা ছোট্ট পেতলের ঘটি মাজতে সকালকে দুপুর এবং দুপুরকে বিকেল করে ছাড়তেন এবং আমাকে দেখামাত্র ঠাকুর্দা চোখ পাকিয়ে বলতেন, খেল গে যাও। সুতরাং আজও ওই ডুমুরগাছটার দিকে তাকালে হাস্যমুখী থাকোমণির দর্শন পাই, যিনি ঠাকুর্দার শান্তি।

বোকার কথাগুলোকে বারকতক টিপে-টুপে পরীক্ষা করে দেখে আবার হ্যা হ্যা করে হাসতে থাকলাম। তখন বোকা আলতো হাতে গামছার মোচড় ফাঁক করল। তারপর সত্যিসত্যি বেরিয়ে পড়ল অবিশ্বাস্য একটা পিস্তল।

আমার হাসি থেমে গেল। বোকা পিস্তলটার দিকে তাকিয়ে বলল. ওখানে মাসির বাড়ি গিয়েছিলাম। পদ্মার বর্ডারে। তেরশো টাকায় কিনে এনেছি। বর্ডার এরিয়াতে মুড়ি-মুড়কির মতো বিক্রি হচ্ছে।

বলো কী?

বোকা একটু হাসল। গাঁসুদ্ধ শত্রু। বাঁচতে তো হবে।

হিম হয়ে বললাম, কেন? কী করেছ তুমি?

কিছু শোননি? বোকা একটু চুপ করে থেকে ফের বলল, গতবছর বাবাকে নদীর ধারে বোম মেরে মারল। মাসতিনেক আগে দাদাকে স্ট্যাব করে মারল। এবার টার্গেট আমি। ব্যাঙামিস্তির বলেছে, পোদো ঘোষের বংশ ফিনিশ করবে।.

মিস্তিরদের সঙ্গে ঘোষেদের বিবাদের কথা আবছা শুনে আসছি ছোটবেলা থেকে। গ্রামে তো এসব ব্যাপার ঘটেই থাকে। কখনও ওনিয়ে মাথা ঘামাইনি। কিন্তু বোকার বাবা ও দাদাকে খুন করা হয়েছে, এবং বোকার হাতে পিস্তল— উদ্বিগ্ন হয়ে বললুম, বিবাদটা কী নিয়ে?

বোকা বলল, জানি না। বাবা জানত হয়তো।

নিশ্চয় জমিজমা নিয়ে?

বোকা মাথা নাড়ল। নাঃ! তাহলে তো আমি জানতে পারতাম। বলে স কিছুক্ষণ পিস্তলটার নকশাকাটা বাঁট থেকে ময়লা খুঁটে ফেলার চেষ্টা করতে াকল। তারপর মুখ তুলে একটু হাসল।···প্রথমে ঠিক করেছিলাম রিভলবার কনব। কিন্তু ভেবে দেখলাম রিভলবারে মোটে ছটা গুলি থাকে। তাতে জনকে ফিনিশ করতে পারব। কিন্তু লোক তো আরও বেশি। পিস্তলে াঠারোটা পর্যন্ত গুলি থাকে। পঁচিশ ফুট থেকেও গুলি ছোঁড়া যায়। একবার িগার টানছ, গুলি বেরিয়ে যাচ্ছে, আবার একটা গুলি এসে জায়গামতো বসছে। ত সুবিধে তাহলে ভাখো ছিরুদা!

পিস্তলটা দেখে আমার ভীষণ লোভ হচ্ছিল। গা শিরশির করছিল উত্তেজনায়। জীবনে এই প্রথম হাতের নাগালে একটা সত্যিকার পিস্তল দেখছি। ইচ্ছে করলে ওটা হাতে নিতেও পারি। হাতে নিলেই যেন বা এই সসাগরা ধরিত্রী আমার পদানত হবে। আসলে ক্ষমতার উৎস তো এইরকম ইস্পাতের নল। যদিও এই নলটা খুব ছোট, আমার মতো মানুষের পক্ষে একটা ছোট্ট পৃথিবীর শাসন ক্ষমতাই যথেষ্ট। আমার চোখে নিশ্চয়ই প্রচুর বিহ্বলতা এসে গেছিল। কৈ, গুলি দেখি। বলে চেয়ার থেকে একটু ঝুঁকে গেলাম।

বোকা বলল, দেখাচ্ছি। প্যাণ্টের পকেটে ঢোকানো যায় না তাই গামছায় জড়িয়ে রাখি। তবে গুলি পকেটে রাখা যায়। এই ছাখো।

সে পা টানটান করে পকেট থেকে একটা গুলি বের করে দেখাল। ক্ষুদে রকেটের মাথার মতো ছুঁচলো গড়নের গুলি বোকা আমার হাতে দিচ্ছিল নিলাম না। বললাম, থাক।

বোকা গুলি পকেটে ঢুকিয়ে বলল, পরশু মাঠে বোরোধানে জল খাওয়া ছিলাম। তখন ওরা বোম নিয়ে তাড়া করেছিল। পিস্তলটা এখনও তং প্র্যাকটিস হয়নি। তাই রিস্ক না নিয়ে পালিয়ে এসেছিলাম। তুমি এখ কয়েকদিন আছ তো ছিরুদা ?

না। কালই যেতে হবে।

বোকা উঠে দাঁড়াল।···থাকলে দেখতে পেতে। শিগগির একটা কি হয়ে যাবে এস্পার-ওস্পার। বলে সে হাল্কা পায়ে পুকুরপাড়ে গিয়ে উঠল কালকাসুন্দে আর নিশিন্দাঝোপের ভেতর দিয়ে ওপাশে তাকে ডুমুরতলা ঘাটের দিকে যেতে দেখছিলাম।

উৎকণ্ঠা এবং আগ্রহে তাকিয়ে রইলাম। বোকা ডুমুরগাছটার তলায় গি সিগারেট ধরাল। তার হাতে একটা সত্যিকার পিস্তল, অথচ আমার সাম সিগারেট টানেনি—একথা ভেবে আমার খুব ভাল লাগল ওকে। বোকা, তু জিতে যাও। ওদের ফিনিশ করে তুমি বেঁচে থাকো। মনে মনে ক্রমাগ ওকে বলতে থাকলাম। একটুতেই পেণ্টুল খসে পড়া, নাকে ছিকনিঝর তুলতুলে পুতুলের মতো ঘোষ বাড়ির সেই ছেলেটা, যে সবসময় খিটখিট ক হাসত, ঘুমিয়ে থাকলে আমার চুল টেনে দিয়ে পালাত, এই ঘাসজমিটায়— আমাদের এই বিপর্যস্ত বাগানে বিকেলে তাকে ডিগবাজি খেতে দেখেছি, একটা ছাগল ছানার মতো! ঘোষগিন্নি চেরা গলায় হাঁক দিতেন, অনিল রে, অনিল! ছেলেটা এসে লুটিয়ে পড়ত ঠাকুর্দার এই শান্তির ঘরে এবং ফিসফিসি বলত, বোলো না যেন ছিরুদা! মা মারবে!

সেই ছেলেটা পিস্তল নিয়ে লক্ষ্যভেদ করতে চায় নেহাতই বেঁচেবর্তে থাকা জন্য। আমার কষ্ট হচ্ছিল। বোকা, তুমি গুলি চালাও, আমি দেখি। ও ডুমুরগাছটা হোক তোমার শত্রুর প্রতীক। তুমি ওকে এফোঁড় ওফোঁড় ক ফ্যালো। ঝাঁঝরা করে দাও ওকে!

গাছেরা বুঝি সব বোঝে। মনে হল, বিতপ্রাজ্ঞ বৃদ্ধ ডুমুর ঝিঁঝিঁ

হাসছে। আর বাপ, বুক পেতে দাঁড়িয়ে আছি। হাত প্র্যাকটিস করে নে যত খুশি।

ডুমুরগাছটাকেও আমার খুব ভাল লেগে গেল। সে বোকাকে বাঁচতে সাহায্য করার জন্য তৈরি। গ্রামীণ বৃক্ষদের এই স্বভাব। ছায়া দেয়। ফল দেয়। সারাদিন অক্সিজেন দেয়। বুক পেতে টার্গেট হয়। নাও বোকা, এবার গুলি ছোঁড়ো, আমি দেখি।

বোকা গাছটার দিকে তাকিয়ে সিগারেট টানছে তো টানছেই। আমি অস্থির। একটু পরে হঠাৎ দেখি, বোকা হনহন করে এগিয়ে নিশিন্দাজঙ্গলে ঢুকল। তারপর আর তাকে দেখতে পেলাম না।

তারপরই দাদা এসে গেল। ব্যস্তভাবে চাপা গলায় বলে উঠল, অ্যাই ছিরু! ভেতরে এসে বস শিগগির! আঃ, চলে আয় না!

দাদা আমাকে টেনে ঘরে ঢুকিয়ে এদিকের দরজা বন্ধ করে দিল। ফিসফিস করে বলল, পুলিশ ডেকে এনেছে ব্যাঙাদা। বোকা ডুমুরতলায় রোজ পিস্তলের গুলি ছোঁড়ে। বুঝলি না? হাত প্র্যাকটিস। তাই তাহের দারোগাকে নিয়ে এসেছে। ওই দ্যাখ!

জানালা দিয়ে দেখলাম, একদঙ্গল পুলিশ এসে ডুমুরতলায় দাঁড়াল। কিছু ভিড়ও জমছে। ব্যাঙা মিত্তির ডুমুরগাছটা দেখিয়ে কিছু বলছে। তারপর দেখলাম, দারোগাসায়েব গাছটার দিকে ঝুঁকে গেলেন। আঙুল দিয়ে গুঁড়িতে সম্ভবত গুলির দাগগুলো ঠাহর করতে থাকলেন। বুঝলুম, রীতিমতো একটা তদন্ত হবেই।

দাদা এবার জানালাটাও বন্ধ করে দিল। ভয়পাওয়া গলায় বলল, এ ঘরে থাকিসনে। ভেতরে চলে আয়। আমরা বাবা গ্রামের সাতে-পাঁচে থাকি না। তাহের দারোগা জিগ্যেস করলে বলব, গুলি-ফুলির শব্দ-টব্দ আমরা শুনিনি।...

বিকেলে আবার ঠাকুর্দার সেই শান্তিস্থলে চেয়ার পেতে বসে আছি, রাম মোহান্তের মেয়ে ঠুমরি এসে হাজির। আমার ছেলেবেলায় মোহান্ত কাঁধে খোল ঝুলিয়ে রোজ ভোরবেলা গাঁ চক্কর দিত। এতটুকু ফ্রকপরা মেয়েটা বাজাত খঞ্জনি। বাবা-মেয়ের গানের কলি এখনও খঞ্জনির হৃদয়ভেদী ধ্বনিসমেত। সেই ঠুমরি! কানের ভেতর সেঁটে আছে খোলের শব্দ। বললাম, ঠুমরি, তুমি কেমন আছ?

ঠুমরি আমার কথায় কানই করল না। চঞ্চল চাউনিতে এদিক ওদিক দেখতে দেখতে আনমনে বলল, বোকাদাকে দেখেছ গো ছিকুদা?

না তো! কেন?

ঠুমরি বলল, ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। ভীষণ দরকার। বাড়িতেও পাচ্ছি না। ভাবলাম ডুমুরতলায় আছে নাকি। সত্যি দ্যাখোনি ওকে ছিকুদা?

ঠুমরি চলে গেলে বউদি এল গল্প করতে। হাতে দুকাপ চা। ধরিয়ে দিয়ে বলল, ঠুমরির গলা শুনলাম যেন। কৈ সে?

চলে গেল। বোকাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

বউদি চটুল হাসল। অ্যাদ্দিন এলে ডুমুরতলায় দুজনের যুগলমিলন দেখতে পেতে। আজকাল তো লাজ-লজ্জার বালাই নেই মানুষের। বউদি গলা চেপে বলল ফের, প্রকাশ্যে ডুমুরতলায় ওরা যা করে, দেখলে ভাবতে, কোথায় লাগে সিনেমার সিন! আমরা ঘরে বসেই দুবেলা সিনেমা দেখেছি, বুঝলে তো ঠাকুরপো?

বুঝলাম। কিন্তু বোকা তো বরাবর গোবেচারা ছেলে ছিল।

বউদি চোখ পাকিয়ে বলল, থামো! নামে বোকা, ভেতরে যা আছে তা আছে।

আছেটা কী শুনি?

বউদি গম্ভীর হয়ে বলল, বোকা ভীষণ ডেঞ্জারাস ছেলে। হাসিমুখে মানুষ খুন করতে পারে, জানো?

করেছে কি?

করেনি, এবার করবে। হাতে পিস্তল পেয়েছে। প্র্যাকটিস করছে রোজ। বলে বউদি বালিকার মতো চঞ্চল পায়ে শূন্য বাগানের ঘাসে টহল দিতে গেল এবং হাতে চায়ের কাপ। আর মেয়েরা এমন যে, যেখানে হাঁটে চারপাশে জেগে ওঠে ফুলের বন। প্রজাপতি ওড়ে। কোকিল-টোকিল খুব চ্যাচায়। এসবের ফলে বোকা, তার পিস্তল ও ডুমুরগাছটাকে ভুলে গেলাম সে-বেলার মতো।

সেরাতে ঘুম ভেঙে গেল প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে। ধুড়মুড় করে উঠে বসলাম। কোথাও মুহুর্মুহু বোমা ফাটছে এবং আবছা হল্লার শব্দ। বাইরে হুঁশিয়ারি শোনা গেল, বেরুসনে ছিকু। রোজ রাতে এইরকম। চুপচাপ শুয়ে থাক। আমরা কারুর পাঁচ-সাতে নেই!

বিস্ফোরণের শব্দ ক্রমশ থেমে এল। তারপরও কুকুরগুলো কতক্ষণ ধরে ডাকল। শেষদিকে শুধু একটা কুকুর ডাকতে ডাকতে গলা ভেঙে ফেলল। তার ডাকে প্রশ্ন ছিল। কিন্তু জবাব দেবার কেউ নেই।

সকালে শুনলাম বোকাদের বাড়িতে হামলা হয়েছিল। বোকাকে 'ফিনিশ' করেছে। গাঁয়ে পুলিসের ক্যাম্প বসছে। তাহেরদারোগা ব্যাঙা মিস্তিরিকে নিয়ে গেছেন। দাদার মতে, ওবেলা তাঁকে রেখে যাবেন দারোগাসায়েব। কেস লেখা হবে ডাকাতির।...

বোকার পিস্তল বোকাকে বাঁচাতে পারেনি। পরপর আঠারোটা গুলি ছোঁড়া যায়, তবুও। অবাক হয়ে বারান্দার সেই অংশটুকু দেখছিলাম, যেখানে কালই সকালে বোকা বসেছিল। তারপর মুখ তুলে দেখলাম পানাপুকুরের ঘাটের মাথায় ডুমুরগাছটাকে। সেই স্থিতপ্রজ্ঞ বৃদ্ধ বৃক্ষ নির্বিকার। বুড়ো, তুমি ব্যর্থ হয়েছ। বুক পেতে দিয়েছিলে, তবু কাজে লাগল না। আসলে দিনকাল খারাপ। তুমি কী করবে বলো?

গাছটাকে কাছ থেকে দেখতে গেলাম।

গিয়েই দেখতে পেলাম ঠুমরিকে। থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। লাল চোখ, ফুলো-ফুলো গাল, মেয়েটা তাকিয়ে আছে গাছটার দিকে।

ক্রুদ্ধ প্রফেট যিশু ডুমুরগাছকে অভিশাপ দিয়েছিলেন, তুমি বন্ধ্যা হও।

রামলোচন মোহান্তের মেয়ে তাকে অভিশাপ দিল, তুমি মরো! তুমি মরো! তুমি মরো!

তারপর দুহাতে মুখ ঢেকে হিঁপিয়ে হিঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। ডুমুরগাছটা কি শিউরে উঠল? একটা হাওয়া এল মাঠ থেকে। একটা কাঠবেড়ালি পড়ি কী-মরি করে গাছটা থেকে ঝাঁপ দিয়ে পালিয়ে গেল। আর্তনাদ করে উঠল এক মাছরাঙা পাখি। আর দেখলাম, গুঁড়ির ওপর অসংখ্য ক্ষতচিহ্ন চোখ হয়ে যাচ্ছে—অসংখ্য ভিজে চোখ দিয়ে বৃদ্ধ বৃক্ষ মোহান্তের মেয়েকে দেখছে। বৃক্ষেরা এত অসহায়!

তক্ষুনি সরে এলাম। কান্নাটান্না আমার একেবারে সয় না।......

আরেক জন্মের জন্য

ছুটি নিয়ে গিয়েছিলুম প্রতাপগড়। ছোটনাগপুর পাহাড়ের একটেরে এই হিলস্টেশন স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যের জন্যে প্রসিদ্ধ। সরকারের পর্যটন দপ্তরের কিছু কটেজ আছে। কিন্তু অত পয়সা কোথায়? আমার বন্ধু শিবনাথের মামার বাড়ি ওখানে। মামা-মামীর ছেলেপুলে নেই। একতালা সেকেলে একটা মস্তো বাড়ির মালিক। অনেকগুলো ঘর আছে। একটা ঘর পাওয়া এমনিতেই সহজ ছিল। তাতে ভাগ্নের বন্ধু। অতএব বিনিপয়সায় শুধু ঘর নয়, খাওয়াদাওয়াও জুটে গেল। স্নেহের অতিথি হয়ে থাকবার সুযোগ পেলুম।

আমি অবশ্যি এভাবে পরের ঘাড়ে চেপে বসার পক্ষপাতী নই। ভীষণ বাধে। কিন্তু ওঁরা ছাড়বেন না। অতএব আর ও নিয়ে মাথা ঘামালুম না।

নতুন কোন জায়গায় গেলে আমার বরাবর অভ্যেস, পায়ে হেঁটে ঘুরি। এভাবেই জায়গাটা পুরোপুরি নাড়ি নক্ষত্রসুদ্ধ চেনা হয়ে যায়। কতকিছু জানাও যায়। সেভাবেই জানতে পারলুম, নদীর ধারে একটা ভাঙাচোরা বাড়িতে সেকালের বাঙালী বিপ্লবীরা এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। বাড়িটা তখন ছিল এক মুসলমান ব্যবসায়ীর। কলকাতায় ব্যবসা, কিন্তু ভেতরে ভেতরে ভদ্রলোক ছিলেন কট্টর ইংরেজ বিরোধী এবং বিপ্লবীদের সমর্থক। পরে এই বাড়িতেই বিপ্লবীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়েছিল। তিনজন বিপ্লবী মারা যান। আর বাড়ির মালিকও সে রাতে উপস্থিত ছিলেন। সাংঘাতিক আহত হন। তারপর তাঁকে কালাপানিতে নির্বাসনে পাঠানো হয়। আর ফেরেন নি।

শিবনাথের মামা ব্রজেশ্বর আমাকে কথায় কথায় বিপ্লবীদের ওই কাহিনী বলেছিলেন। কিন্তু বাড়িটা খুঁজে বের করেছিলুম আমি নিজে। বিহার সরকার ওখানে একটা শহীদস্তম্ভ করে দিয়েছেন। বাড়িটা অবশ্য একটা জঙ্গুলে ঢিবি হয়ে গেছে এখন। শুধু নদীর দিকে মার্বেলপাথরে বাঁধানো ঘাটের খানিকটা টিকে আছে। মার্বেলগুলো নেই—তলার লাইমকংক্রিট অটুট রয়েছে।

ওই তিন বিপ্লবীর একজন মহিলা, হেমাঙ্গিনী দাশগুপ্তা। শহীদস্তম্ভের সামনে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণের জন্যে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলুম। মাত্র চব্বিশ বছর

বয়সে হেমাঙ্গিনী পুলিশের গুলিতে মারা যান। ভাবা যায় না উনিশশো আঠারো সালে এক বাঙালী যুবতী পিস্তল চালিয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন—এত দূরে বিহারের এক নির্জন পাহাড়ী এলাকার বাগানবাড়িতে। কিন্তু তার চেয়েও অবাক কথা—এই শহীদস্তম্ভে লেখা তাঁর নাম!

শহীদস্তম্ভে সেই মুসলমান ভদ্রলোকের নামও রয়েছে। ফরিদউদ্দীন খান। জন্ম ও মৃত্যুর বছর খোদাই করা আছে। হিসেব করে বয়স পেলুম বত্রিশ বছর। স্বাধীনতা আন্দোলনের সেই যুগে কতসব কাণ্ড ঘটেছে, ভাবলে এখন অবাক লাগে!

এখানে ফরিদউদ্দীনের বাড়ি—অর্থাৎ নদীর ধারে এমন একটা বাড়ি যখন ছিল, তখন নিশ্চয় ভদ্রলোক এখানকারই বাসিন্দা ছিলেন। আমার মাথায় কিছু ঢুকলে সহজে বেরোয় না। খোঁজ নিতে শুরু করলুম।

প্রতাপগড়ে মুসলিম এলাকায় ঘুরে ঘুরে হয়রান হলুম। কিন্তু কেউ কিছু বলতে পারল না। হোটেল, দোকান, রাস্তার লোক—কেউ না। ফরিদউদ্দীন কেন, ওই বাড়ি কিংবা শহীদস্তম্ভ সম্পর্কেও সবাই অদ্ভুত নির্বিকার। এর একটাই কারণ হতে পারে, এরা স্বাধীনতার পরের যুগে এখানে এসে জুটেছে। তার আগে তো এখানে জাঁদরেল সাহেবসুবোরা থাকতেন। নিছক বেড়াবার জায়গা ছিল প্রতাপগড়—এবং সেই সুবাদে কিছু দোকানপাট নিশ্চয় গড়ে উঠেছিল।

কদিন পরে এক সন্ধ্যায় রিকশোয় চেপেছি। অনেক ঘুরে ক্লান্ত, তাই পায়ে হেঁটে ব্রজেশ্বরের বাড়িতে ফেরার সাধ্য আর ছিল না। নদীর পাড় বরাবর সুন্দর পীচের পথ। ফরিদউদ্দীনের বাড়ির পাশ দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ রিকশোওলা মুখ ঘুরিয়ে কেমন হাসল।—ওই ঢিবিটা কিসের জানেন কি স্যার?

আনমনে বললুম—হ্যাঁ, শুনেছি।

রিকশোওলা গতি কমিয়ে বলল—সবই নসিব স্যার। ওই বাড়িটা ছিল আমার নানার। ওই যে দেখছেন গভমেণ্ট থাম বানিয়ে দিয়েছে—ওতে ভি আমার নানার নাম লিখা আছে।

শুনে চমকে উঠলুম। ব্যস্ত হয়ে বললুম—রোখো, রোখো।

—কি হল স্যার? কিছু ফেলে এসেছেন নাকি?

—না এখানেই রোখো।

রিকশো দাঁড়াল। বললুম—আমি তোমাকেই কদিন ধরে খুঁজছিলাম।

চলো, রিকশো এখানে রেখে আমরা ওই বেঞ্চে গিয়ে বসি। অনেক কথা আছে তোমার সঙ্গে।

সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার—কিন্তু রাস্তার ধারে আলো জ্বলে উঠেছে। সেই আলোয় রিকশোওলাকে দেখে নিলুম। রোগা ঢ্যাঙা আর একটু কুঁজো এই লোকটার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি মনে হচ্ছিল। তামাটে রঙ গায়ের। খাড়া নাক, দুভাগ করা মাকুন্দে চিবুক, পাতলা একটুখানি ছুঁচলো গোঁফ আছে। খালিগায়ে ও রিকশো টানে। পরনে ছেঁড়া খাকি ফুলপ্যাণ্ট হাঁটু অব্দি গুটোনো। কোমরে বুঝি একটা ছেঁড়া নোংরা কামিজ জড়ানো রয়েছে। কানে আধপোড়া সিগারেট গোঁজা। পায়ে টায়ারের স্যাণ্ডেল। ফরিদউদ্দীনের নাতি—তার মানে, মেয়ের ছেলে এই লোকটা।

সন্দিগ্ধভাবে ও বলল—কিছু গলতি হয়েছে স্যার?

—না না। এসো বসো এখানে। সিগারেট নাও।

মুখের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে একটু ইতস্তত করে সে আমার পাশে—খানিকটা দূরত্ব রেখে বসল। সিগারেটটা ওকে ধরিয়ে দিলে দেখলুম আড়ষ্টতা বা বিস্ময় কাটিয়ে উঠেছে। আরামে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে বলল—জী হাঁ। আমি ওই ফরিদউদ্দীনের নাতি। নসীবের গুণে শয়তানের চাক্কা ঠেলে খাচ্ছি। এই তো দুনিয়ায় খোদার আইন স্যার। আমির ফকির হয়ে যায়। তবে এও ঠিক, আমার বাবা ওনার শ্বশুর ফরিদউদ্দীনের মতন আমির ছিল না! মক্তবের মৌলুবী ছিল! মাসে তিন টাকা মাইনে পেত! তার ছেলে এই মকবুল খানের মাথায় বিদ্যে ঢোকেনি! তাই রিকশো টেনে খাচ্ছে!

বললুম—ফরিদউদ্দীনের কথা আমি জানতে চাই, মকবুল।

মকবুল রিকশোওলা আবার হাসল!—নানাকে আমি দেখিনি, নানিকে দেখেছি। তাও বুড়ি অবস্থায়। শুনেছি, নানাকে কালাপানি পাঠিয়ে সরকার ওনার বাড়ি বাজেয়াপ্ত করেছিল! নানি কী আর করে! আমার মায়ের বয়স তখন চার পাঁচ বছর। মেয়েকে কোলে নিয়ে নানি রহিমা বেগম স্টেশানের ধারে পিপুলতলায় ঝোপড়ি বানিয়ে থাকতে লাগল। বাঁচতে তো হবে। নানিরও তখন বয়স কম। ইচ্ছে করলে সাদি করতে পারত! কে জানে কেন করেনি! ঝোপড়িতে থাকত আর মেঠাই বানিয়ে বেচত। একদিন স্টেশানে এসে নামল আমার বাবা আকবর খান মৌলুবী। এখানে মক্তব খুলেছে সবে। মসজিদে আজান দেওয়া আর নামাজ পড়ানোর কাজও

পেয়েছে। পেয়ে ট্রেন থেকে নেমেছে। ভেটা পেয়েছিল ওনার। পাক্ষি তো খালি খালি খাওয়া যায় না। এক পয়সার মিঠাই খেল। রহিমা বেগমের সঙ্গে আলাপ হল। আমার মায়ের তখন বিয়ের বয়স হয়েছে। আকবর খানও, স্যার, তখন বিশ বাইশ বছরের ছেলে। তারপর কী হল বুঝতেই পারছেন। নানির মনে ধরেছিল ছোকরা মৌলুবীকে। মেয়ে আয়েশার সঙ্গে সাদি দিয়ে জামাই করে নিল···।

শুনে বললুম—তুমি কি তোমার নানার কথা কিছুই জানো না মকবুল !

মকবুল একটু চুপ করে থেকে বলল—যা জানি, তা মায়ের কাছে শোনা, স্যার ! সে এক কিস্‌সা। আমিও বিশ্বাস করি না—আপনিও করবেন না।

—তা হোক, তুমি বলো।

মকবুল খিক খিক করে হাসল। বলল—গতবছর এক বাঙালীবাবু এসে ছিলেন, ঠিক আপনারই মতো। কেতাব লিখবেন। বাঙালীবাবুদের—মানে ওই নামে যাদের নাম লেখা আছে, তারা কীভাবে এখানে মারা গেল, এইসব খোঁজখবর নিচ্ছিলেন। তো আমার সঙ্গেও ভি আলাপ হল। যা জানি, সব বললুম। শুনলেন বটে—কিন্তু মুখ দেখে বুঝলুম, বিশ্বাস হয়নি।

—আমি কেতাব লিখব না, মকবুল ! এমনি জানতে ইচ্ছে করছে।

—কেন ? বলে মকবুল সিগারেটটা ঘষটে নেভাল। অন্ধকারে গুঁজে রাখল।

—কী ? বলবে না ?

—বলছি।

এক মিনিট চুপ করে থাকার পর মকবুলের মুখের রেখা কেমন যেন বিকৃত হয়ে উঠল। তারপর একটু কেসে সে বলল—আমার নানা খুব সরল মানুষ ছিলেন। কলকাতায় ওনার শিশিবোতলের বড় ব্যবসা ছিল। ওনার বাবার আমলের ব্যবসা। নানিও ওখানে থাকত। চিৎপুর—না টেরেটি বাজার আছে, সেখানে। একদিন হল কি, আপনাদের এক বাঙালী ছোকরা দৌড়ে এসে ওনার বাসায় ঢুকে পড়ল। কী ? না পুলিশ তাড়া করেছে। কোথায় কোন সায়েবকে গুলি মেরে পালাচ্ছিল নাকি। তো নানি তখন কচি বউ। ভয়ে ভয়ে সারা। দোকান বাসার নিচের তলায়। খবর পাঠালেন নানাকে। নানা এসে কী সব কথাবার্তা হল। বোরখা পরিয়ে শালী সাজিয়ে রাখলেন। পুলিশ এল, চলে গেল। ব্যাস, ওই নানার মনে বিষ ঢুকল।·········

মকবুল দম নিয়ে ফের বলতে থাকল—তারপর থেকে নানা ওই জঙ্গি-

বাজদের দলের সঙ্গে জড়িয়ে গেল। প্রতাপগড়ে নানার বাবা এই বাড়িটা এক সায়েবের কাছে কিনেছিল। এই বাড়িতে তারপর বাঙালী পিস্তলওয়ালা বাবুরা এসে কখনও কখনও লুকিয়ে থাকে। তাদের সেবাযত্ন করার জন্যে নানিকে এখানে পাঠিয়েছিল নানা। কিন্তু নানির বরাবর এটা অপছন্দ ছিল। পুরুষমানুষগুলোকে সইতে পারতেন, কিন্তু ওই ঔরত পিস্তলওয়ালীকে দেখলে মনে মনে গুমরে মরতেন।

—কেন?

—কেন? মকবুল হাসল। মেয়েমানুষের মনের ব্যাপার স্যাপার ওই রকম, স্যার। তবে……

—তবে?

—পিস্তলওয়ালী ছোকরি ফরিদ খাঁয়ের সঙ্গে একরাতে ওই নদীর ঘাটে—যে ঘাটটা দেখছেন স্যার, ওই যে!

—হ্যাঁ, বলো।

—ঘাটে বসে কথা বলছিল। নানি এসে ঝগড়া বাধিয়ে দিলেন।

—বল কী! তারপর?

—সেই থেকে নানার সঙ্গে নানির খুব মনান্তর শুরু হল। কেউ কাকেও সইতে পারে না। শেষ অব্দি নানিই একদিন পুলিশে খবর দিলে। হামলা করল রাতের আঁধারে। তখন বিজলী বাতি ছিল না। খুব লড়াই হল। পিস্তলওয়ালী ছোকরিও মারা পড়ল। নানাকেও ধরল। আবার কী? ঔরতের মনে হিংসে ঢুকলে স্বামীর ভালমন্দ দেখে না।

—একটু চুপ করে থাকার পর বললুম—কিন্তু তোমার নানির ভুল হতেও পারে!

মকবুল হাসল। —ভুল, স্যার, মেয়েরা ওসব টের পায়। নিশ্চয় কিছু হয়েছিল নানা আর সেই ছোকরির মধ্যে। তা না হলে অমন সাদাসিদে মানুষটা, কোন সাতেপাঁচে যে থাকত না—ধর্ম নিয়েই থাকত ছোটবেলা থেকে, নামাজ রোজা, কোরান শরিফ পড়া আর ব্যবসা ছাড়া কিছু বুঝত না যে—সে কেন ওই ঝুটঝামেলায় জড়াতে যাবে, বলুন?

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে এবার বললুম—তুমি ভুল বলনি মকবুল।

মকবুল বলল,—হ্যাঁ স্যার। তাছাড়া কোন মানে হয় না এর। নানা ইংরেজি স্কুলেও পাস দেয়নি। মক্তবে পড়া মানুষ। একসময়ে সায়েবদের

নাকি নেমন্তন্ন করে খাওয়াত এই বাড়িতে। সে হঠাৎ সায়েব মারার ব্যাপারে অমন মদত দিতে যাবে কেন? বলুন!

উঠে দাঁড়ালুম।—চলো, মকবুল। ফেরা যাক্।

অনেক রাত অব্দি টেবিল ল্যাম্পের সামনে বসে আছি। ব্রজেশ্বরের বাড়িতে ফিরে কিছুক্ষণ গল্প করেছি অন্যদিনের মতো। কিন্তু সারাক্ষণ অন্যমনস্ক। ব্রজেশ্বর বলেছেন—শরীর খারাপ নাকি অমনি?

—হ্যাঁ মামাবাবু। বড় টায়ার্ড।

—তাহলে ঝটপট শুয়ে পড়ো। ওগো, আমাদের খাইয়ে দাও।

আটটার মধ্যে খাওয়া শেষ করে ঘরে ঢুকেছি। তারপর দরজা বন্ধ করে টেবিল বাতি জ্বেলেছি। ব্যাগ থেকে একটা ষাট বছরের পুরনো জীর্ণ বই বের করেছি। বইয়ের পাতায় পাতায় লেখা ছোট্ট হরফে কালির লেখা—অস্পষ্ট, বিবর্ণ, আবার খুঁটিয়ে পড়ছি। থাকগে, যে জন্যে প্রতাপগড়ে আসা, তা চুকে গেল। আমি এতদিনে খুঁজে পেলুম লোকটাকে।

কিন্তু মোটেও জানতুম না বিহার সরকার হেমাঙ্গিনী এবং তাঁর সঙ্গীদের নামে এখানে একটা শহীদস্তম্ভ করে দিয়েছেন। শুধু এটুকু জানতুম, আমার বাবার এক পিসিমা হেমাঙ্গিনী দাশগুপ্তা বিহারে কোথায় ইংরেজ পুলিশের গুলিতে নিহত হন ১৯:৮ সালে। তাঁর লাশ ওখানেই পোড়ানো হয়। আত্মীয়রা ভয়ে কেউ যাননি।

হেমাঙ্গিনী যে প্রথম বাজে উপন্যাস 'অনন্তপুরের গুপ্তকথা' পড়তেন, সেটা আবিষ্কার করি দুমাস আগে। বাবার পুরনো বইয়ের মধ্যে এই বইটা দৈবাৎ পেয়ে যাই। হেমাঙ্গিনীর নাম লেখা আছে গোড়ার দিকে। পরে গোয়েন্দাগিরি নেশায় পেয়ে বসে। বইয়ের মধ্যে অনেক অক্ষরের মাথায় ফুটকি দেওয়া আছে সবগুলো মিলিয়ে আমি অবাক হয়েছিলুম। ওতে একটা গুপ্ত মেসেজ রয়েছে। 'পুলিশ কমিশনার ম্যাক্সওয়েল পাটনায় বদলি হয়েছে। কলকাতায় যে সুযোগ পাই নাই, তাহা পাটনায় পাইব। স্মরজিৎ মহীতোষ এবং তুমি পাটনা যাইবে। কাজ সারিয়া প্রতাপগড়ে যাইবে। সাবধান সরাসরি কলিকাতায় ফিরিবে না। প্রতাপগড়ে দেখা করিব।' প্রেরকের নাম নেই। বোঝা যায়, দলের নেতা এই মেসেজ বইয়ের সাহায্যে হেমাঙ্গিনীকে পাঠিয়ে ছিলেন।

কিন্তু ওই মেসেজ নয়, আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল বইয়ের পাতায় হেমাঙ্গিনীর লেখা কথাগুলো। সাধু ও চলতি ভাষায় মেশামেশি!

'……আমি কি জাতিস্মর? কেন ওকে চিনিতে পারিলাম?'……'আমার মনের জোর কমিয়া যাইতেছে। জন্মান্তরের দৃশ্য দেখিতে পাইতেছি। অদ্ভুত সব দৃশ্য।……'ও আজ আমার দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে ছিল। এই প্রথম। বলিল, আপনাকে চেনা লাগে কেন বলুন তো? আমি অবাক। শিউরে উঠেছিলাম।'……'ওর দ্বিধা অনেক কেটেছে। স্পষ্ট করে বলছে—আমার সঙ্গে জীবন দেবে। বলিলাম—তোমার সংসার? ও শুধু হাসিল।'…… জন্মান্তর আবছাভাবে মানিতাম। জানিতাম না আমার জীবনে তা সত্য হবে। নিজের মনকে বাগ মানাইতে পারি না।'…… 'ধর্ম মানুষের পথের কাঁটা। ধর্ম কেন আসিল পৃথিবীতে?'……'ঈশ্বরের কোন ধর্ম?'…… মহীতোষদা শুনিয়া হাসিলেন। বলিলেন বুড়ি, তুই ধর্ম নিয়া মাথা ঘামাস কেন?'……'ঈশ্বর! এ কি আমার পাপ? খুব কষ্ট পাচ্ছি।'……'বিশ্বাস করি, আবার জন্ম লইব। কিন্তু ও কি জন্ম লইবে? ওদের শাস্ত্র কী বলে জানি না। যদি বলে—না, এই জন্মেই শেষ। অসম্ভব। তা হয় না। তাহা হইলে দেখামাত্র কেন পরস্পরকে চিনিতে পারিলাম?'……

বইটা বুজিয়ে রেখে বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়লুম। কিন্তু হেমাঙ্গিনী কিছুতেই ঘুমোতে দিলেন না।

প্রকৃতির করতলে

সেচ দফতরের বাংলোর লনে দাঁড়িয়ে রোদের আরাম নিচ্ছিলুম। রাতে হঠাৎ বৃষ্টি এসে শীতটা বাড়িয়ে দিয়েছে। কাল এই লনের ঘাসগুলোকে পাঁশুটে দেখেছি। এখন সকালের রোদে দেখি ঝকঝকে সবুজ হয়ে উঠেছে। গাছপালা ঝোপঝাড়েও চেকনাই ভাব। ধোঁয়াটে নীল সেই ঘুম-ঘুম আচ্ছন্নতা কেটে গেছে প্রকৃতির শরীর থেকে। তাকালে ভেতরে অনেক দূর অব্দি দেখা যায় এখন। আমার মতো প্রকৃতিবাদীর পক্ষে এইসব অভিজ্ঞতা বরাবর রোমাঞ্চকর।

তৃতীয় সিগারেটের টুকরো আঙুলের ডগা থেকে টুস করার ভঙ্গীতে নিচের

খালে ছুঁড়ে ফেলার পরই একটা ফুটফুটে সাদা প্রজাপতি নীল কচুরিপানার ফুলগুলো ডিঙিয়ে ব্যস্তভাবে এসে পড়ল। আমার হাঁটুর কাছে ঘুরঘুর করে সেটা পেছনের দিকে কিচেনের বারান্দায় চলে গেল এবং চৌকিদারের বউয়ের ঝুলন্ত ডুরে শাড়িতে বসল। আমার মনে যত লাম্পট্যই থাক, বউটি আর তত যুবতী নয়। মাতৃভাবে আক্রান্ত এই মধ্যবয়সিনী নারী আমাকে অসংখ্যবার বাবা বলেছে। তবে মুর্গি রান্নায় তার যতটা খ্যাতি শুনেছিলুম, ততটা সত্যি নয়। আমার যৎসামান্য নৃতাত্ত্বিক জ্ঞানগম্যি অনুসারে তার এথনোলজিকাল ডাটা তথাকথিত অষ্ট্রিক গোত্রের সঙ্গে মিলে যায়। দু'তিন পুরুষ আগেও যাদের উৎকৃষ্ট রন্ধনপদ্ধতি ছিল স্রেফ রোস্ট্।

কথাটা এসে পড়ছে এজন্যে যে, যাঁদের আতিথ্যে আমি এখানে আছি, তাঁদের মুখপাত্র পশুপতিবাবুর সঙ্গে গতরাতে এলাকার পুরাতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক এবং নৃতাত্ত্বিক বিষয়ে জব্বর আলোচনা হয়েছে। এখন প্রায় আটটা বাজে। আর আধঘন্টার মধ্যে উনি এসে পড়বেন। বেশ স্বচ্ছন্দ ও সদানন্দ এই মানুষটি। সব সময় রসসিক্ত। মাথায় টাক ও মুখে প্রচুর দাড়ি আছে। বেঁটে নাদুসনুদুস চেহারা। কাল বিকেলের সাহিত্যসভায় সভাপতির ভাষণ পয়ারছন্দে পাঠ করে খুব সাড়া জাগিয়েছিলেন। গ্রাম থেকে এতদূরে বাংলো বলে চৌকিদার পরিবারের রান্নাই চলবে বলেছিলাম।

প্রজাপতিটা বসেই থাকল। নিচে একটা বালতির কিনারায় এবার একটা কাক এসে সাবধানে বসল এবং ঠোঁট ডুবিয়ে জল খেল। কেউ তাড়াল না তাকে। একঝাঁক চড়ুই এসে বেড়া ঘিরে চ্যাচামেচি জুড়ে দিলে কাকটা উড়ে গেল। শীতে কাকেরা কেন কে জানে খুব জেল্লা দেয়। কাকটা খাল পেরিয়ে জঙ্গলের গলা ঘেঁষে এগোচ্ছিল। কোথায় বসে দেখা যাক। ওপারে ওই জঙ্গলটাই নাকি কাঁকরগড়া রাজবাড়ি। এই খালটা আসলে পুরনো আমলের পরিখা। আমার সামনে একটা নড়বড়ে কাঠের সাঁকো দেখতে পাচ্ছি। সাঁকোর পরে একফালি রাস্তা ভেতরে ঢুকে গেছে। তার দুধারে বর্মী বাঁশের ঝোপ। কাঠবেড়ালি দৌড়চ্ছে। তাকে দেখতে গিয়ে কাকটাকে হারিয়ে ফেললাম। সঙ্গে সঙ্গে আবিষ্কার করে শিউরে উঠলাম, কাকটা নিঃসঙ্গ ছিল! এমন হওয়ার কথা নয়। কাকেরা দল বেঁধেই তো থাকে!

কারুর প্রতীক্ষায় থাকার সময় আমার এসব অভ্যাস আছে। খুঁটিয়ে এটা ওটা দেখতে দেখতে সময় দিব্যি কেটে যায়। কাঠবেড়ালিটা এখন কেয়াঝোপের

পারে গিয়ে বসেছে। চুলদাড়িওলা সান্তাক্লজের মতো একলার কেয়া। দেখলে দারুণ হাসিখুশি লাগে। তাদের পেছনে একটা মন্দিরের ছুঁচলো ডগা দেখা যাচ্ছে। শুনেছি প্রায় চারশো একর রাজবাড়ির এলাকায় আট-দশটা শিবমন্দির আছে। বারোটা ছোট বড় দীঘি আছে। পশুপতির আসার প্রতীক্ষা শুধু। সব দেখে আসা যাবে। মহাকালের ব্যাপার-স্যাপার।

আর রাণী কৃষ্ণভামিনীর প্রাসাদও। পশুপতিবাবুর লেখা একটা বই আছে 'কঙ্কগড়ের ইতিহাস'। ডিমাই ষোলপেজী দু' ফর্মার বই। নিজের প্রেসেই ছাপানো। মূল্য আড়াই টাকা মাত্র। আউট অফ প্রিন্ট বইটার একটা মলাটছেঁড়া খণ্ড আমাকে উপহার দিয়েছেন। রাতেই পড়ে ফেলেছি। শেষ করার পর হঠাৎ বৃষ্টিটা এল। অদ্ভুতভাবে মনে হচ্ছিল, মোগলরা এসে পড়েছে এবং হাতি-ঘোড়ার হুলুস্থুল চলেছে। রাণী কৃষ্ণভামিনীর কামানগুলো অকেজো হয়ে গেল বৃষ্টিতে। বারুদ ভিজে কাদা। শেষরাতে ঘুম ও স্বপ্নের মাঝামাঝি একটা চাপা শ্বাসপ্রশ্বাসক্লিষ্ট বিলাপ শুনলুম। একবার মনে হল রাণী কৃষ্ণভামিনী, একবার মনে হল চৌকিদারের বউ। ওর গলায় মাদুলি দেখেছি। নিশ্চয় হাঁপের অসুখ আছে। কিন্তু ঘুমটা কেটে গেলে আর কিছু শুনতে পাইনি। অভ্যাসবশে একবার ছোট-বাইরে করার দরকার হল। তার একটু পরে রাতের অবস্থা দেখতে জানলা খুলেছিলুম। কনকনে ঠাণ্ডা এসে জড়িয়ে ধরেছিল। কিন্তু বাইরে আর বৃষ্টি নেই। মনে হল, জ্যোৎস্না ফুটেছে। রাজবাড়ির জঙ্গলে একবার একঝলক টর্চের আলো দেখেছিলুম যেন। চোখের ভুল কিনা এখনও বুঝতে পারছি না। তবে ভীষণভাবে বিশ্বাস করতে সাধ যায়। ওখানে ভূত থাকা স্বাভাবিক। এবং এখানে ভূত থাকার প্রয়োজনও আছে।

জানলা বন্ধ করার মুহূর্তে রাজবাড়ির জঙ্গলে একটা ক্ষীণ গোঙানির মতো শব্দ শুনেছিলুম। নিশ্চয় সাপের মুখে পড়া ব্যাঙের আর্তনাদ। আর পশুপতি বলেছিলেন, ওখানে অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যাপার আপনার চোখে পড়বে। ভড়কাবেন না।

কেয়াঝোপের ওপাশে শিবমন্দিরটার চূড়ায় ত্রিশূল আছে। আমাকে হতভম্ব করে দিয়ে সেই নিঃসঙ্গ অর্থাৎ দলত্যাগী ও বিদ্রোহী কাকটা ত্রিশূলে এসে বসে পড়ল। তারপরই বিশ্রী ঘটনা ঘটে গেল।

আমার অনুমান ভুল হয়নি। কাকটা দলত্যাগীই বটে। বিরাট একটা ঝাঁক জঙ্গলের ওপরদিকটা কালো করে প্রচণ্ড হইচই করতে করতে ওকে ঘিরে

ফেলেছে। খুব হুলুস্থুল শুরু হয়ে গেছে। খোলামেলা ঘাসে ঢাকা মাটি, ঝোপঝাড় ও মন্দিরের মাথা জুড়ে কালো কালো স্পন্দনশীল ছোপ এবং কানে তালা ধরার অবস্থা, এত দূরে থেকেও। সত্যি, কাক বড় নচ্ছার পাখি। ওরা ইতিহাসের সেই বর্গী বা মোগলদের মতো হঠকারী। ওদের অবাধ উপদ্রব নিসর্গ বিষিয়ে দিচ্ছে।

কিন্তু তার চেয়েও অদ্ভুত ঘটনা ঘটতে বাকি ছিল।

হঠাৎ দেখি, কালো কালো স্পন্দনশীল ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়ল একটি মেয়ে। তার এক হাতে সাজির মতো কী একটা আছে। খালি হাতটা কপালের ওপর এবং সাজিসুদ্ধু হাতটা এদিকে ওদিকে জোরে নাড়াচ্ছে। আমি চমকে উঠলুম। কাকের হিংস্রতার একটা ঘটনাই আমার জানা। আলিপুর চিড়িয়াখানায় সেবার একটা হরিণকে ঠুকরে মেরে ফেলেছিল একঝাঁক রাগী কাক।

মেয়েটি বার-দুই আছাড়ও খেল এবং উঠে দাঁড়াল কোনরকমে। তারপর ফের তেমনি হাত নেড়ে আত্মরক্ষায় ব্যস্ত হল। আমার পক্ষে ভারি অস্বস্তিকর অবস্থা। আমি কাঁকরগড়ার সাহিত্যসভার প্রধান অতিথি এবং দু'একটা দিনের জন্যে এই বাংলোয় প্রকৃতি-ট্রকৃতির মধ্যে আদর খাচ্ছি। আমার পক্ষে দৌড়ে কাক তাড়াতে যাওয়া উচিত হবে কি না ভেবেই পেলুম না। অথচ বার বার চিড়িয়াখানার সেই হরিণটার কথা মনে আসছে।

শেষঅব্দি পুরুষোচিত সিভালরির আবেগ নিয়েই নড়বড়ে কাঠের সাঁকো পেরিয়ে গেলুম। আন্দাজ একশো গজ দূরে ব্যাপারটা ঘটছে। কাক তাড়ানোর জন্যে তেমন কিছু খুঁজে পাচ্ছি না। ইটের টুকরো আছে অজস্র। কিন্তু সবই মাটিতে পোঁতা। একটা শুকনো ডালও পড়ে নেই। বিপদের সময় যা হয়।

কাছাকাছি যেতে না যেতে কাকগুলোর কী হল, নিজে থেকেই উড়ে চলে গেল। ক্রমশ জঙ্গলের মাথায় দূরের দিকে তাদের ডাক মিলিয়ে গেল। মন্দিরের পাশে গিয়ে দেখলুম, মেয়েটি আমার দিকে পেছন ঘুরে শাড়ি ঠিকঠাক করে নিচ্ছে। সাজিটা পায়ের কাছে রাখা। ফোঁস ফোঁস শব্দ শুনতে পাচ্ছি। ঠুকরে রক্ত বের করেছে নাকি খুঁজছি। পাতাচাপের ঘাসের মতো ফিকে গায়ের রঙ, বেণীবাঁধা চুল ঝুলছে কোমর অব্দি, মেয়েটি কে হতে পারে? সাজিতে একটাও ফুল নেই। ঘাসের ওপর অনেকগুলো জবা ছড়িয়ে আছে। দেখতে পেলাম, মন্দিরের ওপাশে কয়েকটা জবাগাছ আছে। ফুলে ভেঙে পড়ছে।

চুল থেকে খড়কুটো মাকড়সার জাল ঝেড়ে ফেলে সে সাজিটা তুলে নিল।

তখনও আমার দিকে পেছন ফেরা। আমি কি বলব, ভেবে ঠিক করার আগেই সে বলল, কাকটা মারা গেল নাকি দেখুন তো!

দুটো কারণে চমক খেলুম। ওর মাথার পেছনে চোখ থাকায় এবং দলত্যাগী কাকটাকে বাঁচাতে গিয়েছিল ভেবে। ওর গলার স্বর কেমন খ্যানখেনে, ঈষৎ চেরা। রোগা বলেই এমন হতে পারে। তবে মোটামুটি আন্দাজ করছি, বয়স ষোল-সতেরোর বেশি হতেই পারে না। কাকটা মন্দিরের গায়ে একটা ঝোপের তলায় চিত হয়ে পড়ে আছে দেখতে পেলুম। কষায় রক্ত। নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে গেছে। কাছে গিয়ে জুতোর ডগায় নেড়ে দেখে বললাম, মারা গেছে। তুমি কি ওটাকে বাঁচাতে গিয়েছিলে?

সে কথার জবাব দিল না। বলল, আপনি কলকাতা থেকে এসেছেন?

হ্যাঁ। তুমি···

আপনি কাল মিটিং করেছেন! শুনতে যাব ভেবেছিলাম।

গেলে না কেন?

কাজ ছিল।···এখনও সে উল্টোদিকে ঘুরে আছে। মুখের একটা পাশ, গালের অংশ ও কান দেখতে পাচ্ছি। কানে সোনার রিঙে রোদ ঠিকরে পড়ছে। মুখটা আকাশে তোলা। এমন করে কথা বলছে কেন সে? ফের বলল, আপনি ইরিগেশানে আছেন?

হ্যাঁ। তুমি কোথায় থাকো?

রাজবাড়িতে।

আমি কয়েক পা এগোলাম। বুঝতে পেরে সে আরও ঘুরে দাঁড়াল। ব্যাপারটা অদ্ভুত। বললাম, নাম কী তোমার?

অপরূপা।

বাবার নাম?

ফের অন্য কথা বলল।···চৌকিদারের বউ বলছিল আপনি আজ থাকবেন। কাল সকালের বাসে কলকাতা চলে যাবেন।

বাবার নাম বললে না কিন্তু!

কাকেও জিজ্ঞেস করবেন, বলবে। আমি যাই।

শোন, শোন!

কী বলবেন বলুন। দেরি হয়ে গেল।

ফুল তুলছ কি পুজোর জন্যে?

হুঁউ।

কিন্তু তোমার সাজিতে তো ফুল নেই। সব পড়ে গেছে।

সে ঝটপট সাজিটা তুলে হাতড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে আমি জানলুম, মেয়েটি অন্ধ। আমার মনটা তখুনি বদলে গেল। ছটফটে উজ্জ্বল এমন মেয়েটা অন্ধ! কাকের ঝাঁকের মধ্যে পড়াটা এতক্ষণে একশো করুণা বা মায়ামমতায় ভিজে আমাকে আড়ষ্ট করে ফেলল। ডাকলাম, অপরূপা! তোমাকে ফুল তুলে দিই, এস। না, না। অমন লজ্জা করে আর ঘুরে দাঁড়াতে হবে না। আমি তোমার দাদার মতো।

এবার অপরূপা ঘুরল। একটু হাসল।

সঙ্গে সঙ্গে চমক খেলুম আবার। এমন সৌন্দর্য ও বিকৃতির অদ্ভুত সহাবস্থান কখনও দেখিনি।

অন্ধদের প্রতি চক্ষুষ্মানদের আতঙ্কমিশ্রিত করুণা নিশ্চয় আছে। কিন্তু এই ছিপছিপে পলকাগড়নের গৌরবর্ণ সুশ্রী মেয়েটিকে এতক্ষণ কঙ্কগড় রাজবাড়ির বিশাল এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে থাকা প্রাচীন কীর্তির মধ্যে একটা চাপা অর্কেস্ট্রার মূর্তিমতী সঙ্গীত বলে মনে হচ্ছিল এবং সেই সঙ্গীত হঠাৎ যেন থেমে গেল। চারপাশে গভীর স্তব্ধতা ছমছম করতে থাকল। মনে হল, যে-প্রকৃতি এমন অত্যদ্ভুত ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটাতে পারে, তাকে বিশ্বাস করা যায় না। এখন যেন তার মধ্যে কি এক ষড়যন্ত্র চলেছে। আমাকে ঢেকে ফেলার জন্য বুঝিবা প্রকৃতি হাত উপুড় করছে, তার বিশাল সবুজ হাতের কালো ছায়া নামছে।

অপরূপার বয়স পনের-ষোলর কম বা বেশি নয়। এই নির্জন জঙ্গলের পরিবেশে তাকে ফুল পেড়ে দেওয়া আমার পক্ষে উচিত হবে কি না, এটাই সমস্যা। বিশেষ করে আমি এক সজ্জন ও গণ্যমান্য অতিথি। হাজার হলেও এটা গ্রামাঞ্চল। কে কি ভেবে বসতে পারে, বলা যায় না।

অপরূপা বলল, কই! দিন না ফুল পেড়ে?

আমি ভীষণ বেঁচে গেলুম। ঝোপের ওদিক থেকে পশুপতিবাবুর গলা ভেসে এল—কী রে টেঁপি! ওখানে কি করছিস? যা—বাড়ি যা বলছি। তোকে খুঁজছে ছাখ্‌ গে ম্যানেজারবাবু।

অমনি অপরূপা কেমন অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। আড়ষ্টভাবে হেসে মন্দিরের পাশে জবাগাছগুলোর দিকে তরতর করে এগিয়ে গেল। বুঝলুম, রাজবাড়ি এলাকার প্রতি ইঞ্চি মাটি তার চেনা।

পশুপতি এসে বললেন, একটু দেরি হয়ে গেল। কিছু মনে করবেন না। আসুন।

একটা পায়েচলা সরু রাস্তায় গিয়ে পেছন ফিরে দেখি, অপরূপা ফুল তুলছে অভ্যস্ত ভঙ্গিতে। আমাকে ঘুরতে দেখে পশুপতি একটু হেসে বললেন, মেয়েটা কী বলছিল ?

—কিছু না। বেচারী একঝাঁক কাকের পাল্লায় পড়েছিল। দৌড়ে এসে কাকগুলোকে তাড়ালুম।

—তাই বুঝি! পশুপতি সকৌতুকে হাসতে থাকলেন। তবে ওকে যতটা নিরীহ ভাবছেন, ততটা মোটেও না। ভয়ানক ধূর্ত। আর তেমনি হাড়ে-হাড়ে খচরামি বুদ্ধিও আছে।

চমকে উঠলুম—সে কী!

—হ্যাঁ। ওর কীর্তিকথা পরে বলব'খন।…বলে পশুপতি চুপ করে গেলেন।

একটা পুকুরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলুম। ঘন পদ্মবনে জলটা ঢাকা। ভাঙা-চোরা পাথুরে ঘাট আছে। দুধারে স্তম্ভের ওপর দুটো যক্ষীমূর্তি। আগাছায় ঘিরে রেখেছে। মূর্তি দুটো ভাল করে দেখার জন্য দাঁড়িয়ে অন্যমনস্কভাবে বললুম—আচ্ছা পশুপতিবাবু, মেয়েটি রাজবাড়ির কোনও কর্মচারীর মেয়ে বুঝি ?

পশুপতি গলার ভেতর জবাব দিলেন, না। তারপর একটু কেশে ফের বললেন, বলতে গেলে সেও এক ইতিহাস। পরে বিস্তারিত বলব। রাজা-বাহাদুরের প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর এক কেলেঙ্কারি হয়েছিল। উনি রাজবাড়িরই এক আশ্রিতা বিধবাকে হঠাৎ বিয়ে করে বসেন। নিম্নবর্ণের মেয়ে। তারপর ওই টেঁপি—মানে অপরূপার জন্ম। আর বলবেন না। বড়ঘরের এমন বিস্তর কেলেঙ্কারি তো থাকেই।

অবাক হয়ে বললুম, তাহলে ও রীতিমত রাজকন্যা বলুন!

পশুপতি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হো হো করে হাসলেন ফের। তারপর বললেন, তা বলতে আপত্তি কী? তবে সর্বনেশে রাজকন্যা মশাই!

—কেন বলুন তো?

—মায়ের লাইন ধরতে দেরি করেনি। এই বয়েসেই…বলে চুপ করে গেলেন হঠাৎ।

সামনে এক ভদ্রলোক আসছিলেন। বেশ রাশভারি চেহারা। আমাদের

দেখে বললেন, কী হে পশুপতি, বেড়াতে বেরিয়েছ ওঁকে নিয়ে? হ্যাঁ, সব দেখাও-টেখাও। তবে দেখার মতো আর কীই বা আছে! বারোভূতে লুটে শেষ করে ফেলেছে!

ভদ্রলোক চলে গেলে পশুপতি বললেন, উনিই এখন এস্টেটের ম্যানেজার। খুব জাঁদরেল লোক। উনি না থাকলে রাজাবাহাদুরকে এখন পথে বসতে হত। জঙ্গল সাফ করিয়ে উনিই ভাগচাষ করাচ্ছেন। পুকুরগুলো নিজের ব্যবস্থা করেছেন। খুব মাছটাছ হয়। এসব থেকেই এখন রাজবাহাদুরের ভরণপোষণ চলেছে। প্রথম পক্ষের দুই ছেলে এক মেয়ে। তারা সব বাইরে—কেউ কলকাতা, কেউ আমেরিকায় আছে। আর কাউকে তো পিতৃদর্শনে আসতে দেখি না। আসলে সেই কেলেঙ্কারির পর চটে গেছে ওরা। তবে রাজা-বাহাদুর মারা গেলে দেখবেন, এসে সম্পত্তির ভাগ চাইবে। কিন্তু ততদিনে ম্যানেজার অহিভূষণ কি আর কিছু আস্ত রাখবেন?

পশুপতি গম্ভীর হয়ে গেলেন হঠাৎ। সামনে একটু তাকাতে গাছপালার মধ্যে একটা উঁচু মন্দিরের চূড়া দেখা যাচ্ছিল। মন্দিরটা বিশাল বলে মনে হল। জিজ্ঞেস করলুম, ওটা কিসের মন্দির পশুপতিবাবু?'

পশুপতি বললেন, ওখানেই যাচ্ছি আমরা।

মন্দিরের ফটকের সামনে এসে পশুপতি বললেন, এবার একটু কষ্ট দেব। দয়া করে জুতোটা…

ধর্মস্থানে ঢুকতে গেলে এটাই নিয়ম কে না জানে! আসলে ভদ্রলোক বড্ড বিনয়ী। কাল আসা অব্দি দেখছি, কন্যাকর্তার মতো আমার আগে আগে কোমর ভেঙে হাত নাড়তে নাড়তে কেবলই পিছু হটে এগোচ্ছেন। এটা পুরনো আমলের দিশি প্রথা। তবে আমি কোনও বিরাট লোক নই। নিতান্ত এক লেখক। এবং যদি না জানতে পারতাম, এই পশুপতি পুরকায়স্থের লেখা সাড়ে তিনশো পাতার একটি অপ্রকাশিত উপন্যাস আছে, তাহলে ভাবতুম এই বিনয় আমূল ভণ্ডামি। অর্থাৎ মন্ত্রীটন্ত্রী এলেও উনি এমন করে থাকেন ধরে নিতুম। কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। উনি সাহিত্যগত প্রাণ মানুষ।

সামনে ঝুঁকে জুতো খুলতে খুলতে ফের গলার ভেতর বললেন, তবে যাই বলুন—ব্যাপারটার কোনও যুক্তি খুঁজে পাই নে।

ফটকের মাথায় নহবতখানা দেখছিলুম। জুটো প্রকাণ্ড ঢোল দু পাশে রাখা আছে। লোকজন নেই। দেখলেই মনে হবে, হঠাৎ ঢোল ফেলে প্রাণভয়ে পালিয়ে গেছে। আমার মাথায় তখন ইতিহাস ঢুকে আছে। মোগল সৈন্যদের কোলাহল শুনতে পাচ্ছি পরিখার ওপারে। বললুম, কিসের যুক্তি পশুপতিবাবু?

এই জুতো খোলার। পশুপতি খিক করে হাসলেন। ভগবানের ঘরে ঢুকতে জামাকাপড় খুলতে হবে না, আর কিচ্ছু না, কেবল পায়ের জুতো! কেন বলুন তো? চামড়া কি অপবিত্র জিনিস?

হয় তো তাই।

মাথা নাড়লেন পশুপতি। কেন? কোমরে চামড়ার বেল্ট পরেও তো লোকেরা ঢোকে। তার বেলা? বলবেন, জুতোয় নোংরা লেগে থাকে তাই! তাহলে খালি পায়ে যারা ঘোরে, তারা তো স্যার, পা ধুয়ে ঢোকে না।

অগত্যা বললুম, পুরনো প্রথা আর কী!

পশুপতি তাঁর বিনয় ক্ষণিকের জন্যে ভুলে তর্কের সুরে বললেন, কেন এ প্রথা? এর জাস্টিফিকেশন কী? জুতোকে কেন নিকৃষ্ট অপবিত্র মনে করা হয়? ভেবে দেখুন, জুতো ভদ্রলোকের পক্ষে একটা এসেনসিয়াল বস্তু!

তখনও আমরা ফটকের তলায় দাঁড়িয়ে। এবার টের পেলুম, পশুপতির উপন্যাস-প্রতিভার নিটোল এবং না-ফোটা ডিমের চেকনাই ভাবটি ভাবুকতারই। ঈষৎ উদ্বিগ্নও হলুম। এই জনহীন বিশাল জঙ্গুলে এলাকার নৈসর্গিক সুখ-শান্তি পণ্ড করে উনি হয়তো ডিমটি ফাটাতে চাইবেন। এ বিষয়ে আমার মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা আছে। সেবার এমনি এক সাহিত্যসভা করতে গিয়ে এক ভদ্রলোকের বাড়ি অতি চমৎকার খাওয়াদাওয়ার পর যা ঘটেছিল তা ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন। পান চিবুতে চিবুতে তিনি ডেকেছিলেন—কেষ্ট! হেরিকেনটা জ্বেলে দে। বাড়িতে বিদ্যুতের আলো। হারিকেন কী হবে বুঝতে পারিনি। জিজ্ঞেস করলে বলেছিলেন—আমরা এবার পুকুরপাড়ে যাব। তারপর হেঁকে বলেছিলেন—কেষ্টা! খাটের তলা থেকে ট্রাঙ্কটা বের কর্ তো বাবা। তখন রাত প্রায় দশটা। বিকট আওয়াজ করে ট্রাঙ্ক বেরুল। সেটা মাথায় নিয়ে এবং হাতে হারিকেন ঝুলিয়ে কেষ্ট চলেছে আগে। মধ্যিখানে আমি, পেছনে উনি। বগলে মাদুর, হাতে পানজর্দার কৌটো আর দু বাক্স সিগারেট। তারপর পুকুরপাড়ে বসে ট্রাঙ্ক খোলা হলে বেরুল সচিত্র হিটলারবধ মহাকাব্যের পাণ্ডুলিপি। সচিত্র কেন, সেটা জিজ্ঞেস করব কী, আমি লেজ তুলে পালিয়ে যাবার ইচ্ছায় ওপরকার অনন্ত নক্ষত্রবীথির মধ্যে চু মেরে ফোকর খুঁজছিলুম।…

তা পশুপতি কতদূর এগোবেন জানি নে, আপাতত উনি জুতো থেকে শুরু করেছেন। আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে ফের বললেন, আমার ক্ষুদ্র ধারণা—এতে জাতিবর্ণভেদের একটা জঘন্য প্রকাশ ঘটেছে।

তাই বুঝি!

পশুপতি রহস্যময় হেসে এতক্ষণে পা বাড়ালেন উঠোনে। গলা চেপে বললেন, বুঝলেন না? মুচি! মুচি জুতো বানায়। মুচির হাতের কাজ বলেই জুতো অপবিত্র। অথচ ধুলোময়লা থেকে পা বাঁচাতে জুতো চাই-ই।

বলতে যাচ্ছিলুম, এও তো হতে পারে—জুতো তৈরির জন্যেই মুচিকে হীন গণ্য করা হয়—কিন্তু মুখ খুললাম না। প্রকৃতি-অধ্যুষিত নির্জন জায়গা, বিশেষ করে এমন এক ঐতিহাসিক মাটিতে দাঁড়িয়ে কী এক অসহায় ভাব আমাকে পেয়ে বসে, যা শান্তি বলে ভুল হতে পারে। চুপচাপ থাকাই ভাল মনে হয়।

পশুপতি হনহন করে এগিয়ে মন্দিরের বারান্দায় উঠলেন এবং প্রণাম করলেন। তারপর ঘুরে আমাকে ডাকলেন, আসুন! বিগ্রহ দেখবেন না?

বললুম, থাক। ওই তো দেখতে পাচ্ছি।

পীড়াপীড়ি করলেন না, নেমে এলেন পশুপতি। একটু হেসে বললেন, অন্যায় হল হয়তো। আপনাদের ধর্মে বাধা আছে বটে!

বলতে পারতুম, আমি ধার্মিক-টার্মিক নই—আসলে যা দেখতে চেয়েছিলাম তা স্থাপত্য। পুরনো স্থাপত্য। বললাম না। তার বদলে বললাম, বাধা অন্য পক্ষেই থাকা স্বাভাবিক। আমি কিনা যবন। অশুচিতার প্রশ্ন উঠবে।

পশুপতি হাসির চোটে নির্জন মন্দির গমগম করে উঠল। পাগল, পাগল! আপনাদের মতো ইনটেলেকচুয়াল মনীষীদের আবার জাত! তবে নিজেকে যবন বললেন, এটা কিন্তু ভুল। যবন তো ইউনান কথা থেকে এসেছে। ইউনান হল গ্রীস। গ্রীকদের যবন বলা হত।…

এই রে! আবার শুরু হল। পাশ কাটাতে চেয়ে বললুম, এই মন্দিরটার বয়স পাঁচশো বছর বলছিলেন না? কোন্ রাণীর তৈরি যেন?

রাণী কৃষ্ণভামিনীর। মোগল পিরিয়ডের শুরুতে। পশুপতি গাইডের গলায় বললেন। চলুন, রাজাবাহাদুরের সঙ্গে দেখা করে এসে আপনাকে ওনার প্রাসাদ দেখাব। এখন সব জঙ্গলে ঢেকে গেছে। তবে পাথরে তৈরি বাড়ি তো! দিব্যি খাড়া আছে। ঘরগুলো এখনও ব্যবহার করা যায়। আমরা চেষ্টা করেছিলাম, বাড়িটা কলেজ করা যায় নাকি। রাজাবাহাদুর দিলেন না। মধ্যে

একটা প্রপোজাল এসেছিল সরকারী পুরাতত্ত্ব দফতর থেকে—মিউজিয়াম করার জন্যে। তাতেও রাজাবাহাদুর গা করেননি। এদিকে বাড়িটা খামোকা পড়ে আছে। আসলে ওনার ভয়, রাজবাড়ির সীমানায় বাইরের লোকেরা ঢুকে বসলেই পুরোটা ক্রমে হাতছাড়া হয়ে যাবে। জানেন? সামনের একটা ঘরে আমরা লাইব্রেরি করতে চেয়েছিলাম—জাস্ট অস্থায়ী ভাবে, দেননি! সেটা ফ্লাডের বছর। লাইব্রেরি ঘরটা ভেঙে গিয়েছিল।

আমার চোখ ঘুরছিল চারদিকে। উঠোনের কোণায় ইঁদারার পাশে বড় একটা জবাগাছ। ঢ্যাঙা রাগী চেহারার একটা লোক আমাদের আড়চোখে দেখতে দেখতে ফুল পাড়ছে। হাতে সাজি ঝুলছে। নিশ্চয় পুরুত। দু'পাশে সারবন্দী একতলা ঘর। ঘরগুলোতে কয়েকটি পরিবার বাস করার চিহ্ন ছড়ানো। কিন্তু লোকজন দেখতে পাচ্ছি না। জলভরা একটা বালতির কিনারায় বসে একটা কাক ঠোঁট ডুবিয়ে জল খেল। একঝাঁক চড়ুই এসে একটা তোলা উনুন ঘিরে বসে পড়ল। দড়িতে ছেঁড়াখোঁড়া শাড়ি ঝুলছে। তার ওপর একটা প্রজাপতি। মন্দিরের পাশের ঘরে যা সাড়াশব্দ। কমিউনিটি উনুনের খানিকটা দেখা যাচ্ছে। মেঝেয় বড় বড় থালায় তরকারি কুটে রেখেছে। আন্দাজ করলাম, ভোগটোগের আয়োজন চলছে।

আর কী? চলুন!...বলে পশুপতি পা বাড়ালেন।

এই সময় ফটক দিয়ে একবোঝা শুকনো বাঁশ আর কাঠ নিয়ে একটা লোক ঢুকল। পশুপতি বললেন, মুকুন্দ যে! কেমন আছ? আর তো তোমায় দেখিটেখি না বিশেষ!

লোকটার মুখে স্বাভাবিক হাসি ফুটতে দেখলুম না। কেমন বেজার ভাব। বোঝাটা সেখানেই নামিয়ে ভারি গলায় বলল, দেখে আর কী করবেন মাইতি মশাই! দেখেও না-দেখা হয়ে থাকবেন। আমি চক্ষুশূল।

পশুপতি জিভ কেটে বললেন, আহা, তোমায় তো কেউ দোষী করেনি বাপু! তোমার ক্ষতিও কি কেউ করেছে? তোমার ভাগ্নে হারামজাদা অমন, তা তুমি কী করবে?

মুকুন্দ বলল, ভাগ্নের দোষ থাকতে পারে। তাকে আমি ধোয়া তুলসীপাতা বলছি না। তবে তালি খালি এক হাতে বাজে না—সেটা কেউ তো বলছেন না! অন্যপক্ষে যদি সায় না-ই থাকত, তাহলে কীভাবে সে অতখানি এগোলো বলুন? তাছাড়া ব্যাপারটা একদিনের নয়, সেই এতটুকুন থেকে দুজনে...

আমার দিকে তাকিয়ে সে থামল। পশুপতি মুচকি হেসে বললেন, যাক সে বাপু! তুমি বেঁচে গেছ। যদ্দিন ছিল, তোমারও তো নানান হাঙ্গামায় জড়িয়েছে। থানাপুলিস কত রকম! দুষ্টু গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল।

মুকুন্দ কী বলতে যাচ্ছিল, পশুপতি বললেন, আসুন। ওদিকে দেরি হয়ে যাবে। রাজাবাহাদুরের সঙ্গে নটায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট। ওনার টাইম-জ্ঞান খুব টনটনে।

ফটকের সামনে জুতো পরতে পরতে দেখলুম, মুকুন্দ আমার দিকে তাকিয়ে আছে। দৃষ্টিতে কী যেন কথা টলটল করছে। পা বাড়িয়ে পশুপতি চাপা গলায় বললেন, সে এক কেলেঙ্কারি। পরে বলব'খন।

আরেকবার ঘুরেও দেখি, মুকুন্দ একই ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। আমাকেই দেখছে যেন। কেন? একটু অস্বস্তি হল। বললাম, লোকটা কে পশুপতিবাবু?

মন্দির-স্টাফ। কয়েক পুরুষ ধরে আছে বলেই রাজাবাহাদুর ছাঁটাই করেন নি। পশুপতি জানালেন। মাসে গোটা তিরিশ টাকা পায়। একবেলা ভোগ হয়। তার ভাগও পায়। ছেলেপুলে নেই বলে এক গুণধর ভাগ্নেকে এনে রেখেছিল। পরে সব বলব'খন।

ঘড়ি দেখে নিলুম। কাঁটায় কাঁটায় নটা। মার্চের এই সকালটা এখনও স্বচ্ছ হয়ে ওঠেনি। রাতের বৃষ্টির পর ভোরে বনের মাথায় একটু কুয়াশা জমেছিল। এখন সেটুকুও সরে গেছে। চারদিকে গাছপালা ঝোপঝাড়। বাঁশবন আছে। টুকরো টুকরো চষা ক্ষেত আছে। আর আছে ছোট বড় অনেকগুলো পুকুর। পশুপতি অবশ্য দীঘি বলছিলেন। প্রায় চারশো একর জমি নিয়ে রাজবাড়ি এলাকা একটা দ্বীপের মতো। চারদিকে চওড়া ও গভীর পরিখা আছে। মাঝে মাঝে ছোটখাটো ধ্বংসস্তূপ। কয়েকটা শিবমন্দির আছে। অজস্র ইঁদারা আছে। অব্যবহার্য সবই। ঘাসের জঙ্গলে মরচেধরা লোহার কামান পড়ে আছে। এক সময় নাকি সবই ছিল সাজানোগোছানো। ফুলের বাগান ছিল অজস্র। এখন আর কিছুই মানুষের হাতে নেই। প্রকৃতি যা খুশি করছে।

একটা খালের ওপর সাঁকো দেখলুম কাঠের। সাঁকোর গড়নেও পুরনো আভিজাত্যের ছাপ। জানি এই আভিজাত্য কাদের রক্ত শুষে গড়ে উঠেছিল—কিন্তু এসব মুহূর্তে মানুষের সৌন্দর্যবোধ ও কারিগরী দক্ষতাই চোখের সামনে বড় হয়ে ধরা দেয়। সেই সব প্রাচীন দক্ষ স্থপতি আর ছুতার মিস্ত্রীদের মুখ ভেসে উঠছিল।

দোতলা প্রকাণ্ড বাড়িটা নতুন রাজপ্রাসাদ। নির্মাণকাল মোটে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ। গেটের ভেতর দিয়ে ঢোকার পর দেখি, বারান্দায় সেই রাশভারি ম্যানেজার ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন।

আমাদের দেখে বললেন, রাজাবাহাদুরের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল নাকি? তা তখন তো কিছু বললে না হে পশুপতি! এ বেলা তো দেখার চান্স আর নেই!

পশুপতি বললেন, সে কী? নটায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছিলেন উনি নিজেই?

অহিভূষণ তেতো মুখে চাপা গলায় বললেন, খামখেয়ালী ব্যাপার। এইমাত্র এসে শুনলুম, হরিবন্ধুকে বলতে বলেছেন—শরীর খুব খারাপ। এ বেলা দেখা হবে না। শুনে আমার খারাপ লাগল। আফটার অল একজন সাহিত্যিক দেখা করতে আসছেন! তিনিই বা কী ভাববেন? বরাবর···

কথা কেড়ে বললুম, কিচ্ছু ভাবব না। শরীর খারাপ যখন। ঠিক আছে, আমরা আসি।

—তা কি হয়? অন্তত একটু চা-ফা খেয়ে যান। আসুন।

গোঁ ধরে বললুম, না। থাক।

আমার আচরণে কি অভদ্রতা প্রকাশ পাচ্ছিল? কে জানে! এভাবে যেন প্রত্যাখ্যাত হওয়ারই অপমান আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছিল। গতিক দেখে পশুপতি আমার সঙ্গ ধরলেন।

কিছুটা তফাতে গিয়ে পশুপতি বললেন, সব বদমাইসী ওই অহিভূষণের, বুঝলেন? ওই ব্যাটাই অ্যাপয়েন্টমেন্ট নষ্ট করেছে। রাজাবাহাদুর কক্ষনো কথা না রাখার পাত্র নন। অসম্ভব ভদ্রলোক সে ব্যাপারে। আমি বুঝতে পারছি, পাছে রাজাবাহাদুর নিজের দুঃখদুর্দশার কথা ফাঁস করে বসেন বাইরের লোককে—তাই অহিভূষণই অ্যাপয়েন্টমেন্ট বানচাল করে দিয়েছে। তার চেয়ে চলুন রাণী কৃষ্ণভামিনীর প্রাসাদটা দেখে আসবেন। না—না, ভেরি ইন্টারেস্টিং প্লেস! ঐতিহাসিক কাণ্ডকারখানা স্বচক্ষে দেখতে পাবেন।

অগত্যা বললুম, চলুন তাহলে।

পাথরের এই বিশাল প্রাসাদের তিনপাশে বন জঙ্গল, শুধু পূর্বদিকটা ফাঁকা। কারণ ওদিকে মস্ত একটা দীঘি আছে। পাড় থেকে সোজা উঠে গেছে

প্রাসাদের পাঁচিল। কিন্তু একটা অংশ ধসে পড়েছে। বাকি ঘরগুলোও প্রায় ভেঙে পড়ার মুখে। ভেতরে ঢুকতে ভয় করছিল। কিন্তু পশুপতি আশ্বাস দিয়ে বললেন, না, না। দক্ষিণ অংশটা পুরো অক্ষত। এদিকটায় আমরা লাইব্রেরি করতে চেয়েছিলুম। দেখলেই বুঝবেন।

ভাঙা বারান্দা সাবধানে পেরিয়ে কপাটহীন দরজায় পা বাড়াতে বুক কাঁপল। কিন্তু পশুপতি নাছোড়বান্দা। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলুম তাঁর পেছনে পেছনে। সিঁড়িতে চামচিকের নাদি, মাকড়সার জাল, নোংরা যথেষ্ট। ওপরের একটা ঘরে ঢুকে মনে হল, এটা আদতে একটা দুর্গ।

কোনও ঘরেরই কপাট-জানলা নেই। সব ভেঙেচুরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। একখানে পশুপতি মোগল সৈন্যদের কামানের দাগ দেখাচ্ছিলেন, হঠাৎ পাশের ঘরে কোথায় পায়ের শব্দ হল। পশুপতি হেঁড়ে গলায় কে রে বলার সঙ্গে সঙ্গে মনে হল ওদিকে কে ধুপধাপ করে দৌড়ে পালিয়ে গেল। পশুপতি হেসে বললেন, শেয়াল-টেয়াল হবে! তবে বাঘ হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। জানেন একবার একটা বাঘ···

কথা বলতে বলতে হঠাৎ ওঁর দৃষ্টিতে সন্দেহ ফুটে উঠল। পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন দ্রুত। পেছন পেছন গিয়ে উঁকি দিলুম। দেখলুম কোণার দিকে একটা ছেঁড়াখোঁড়া মাদুর পাতা রয়েছে। একটা বালিশও আছে। বালিশের পাশে একটা কাপড়ের ময়লা ব্যাগ। মেঝেয় পোড়া সিগারেটের আর দেশলাই-কাঠির টুকরো অজস্র। পশুপতি তীব্রদৃষ্টে দেখতে দেখতে আপন মনে বললেন —কী কাণ্ড!

—কী ব্যাপার পশুপতিবাবু?

—হারামজাদা ছেলেটা এখানেই লুকিয়ে থাকে দেখছি! নির্ঘাত এবার মারা পড়বে অহিভূষণের হাতে। অত মার খেয়েও লজ্জা হয়নি মশাই, ফের এসেছে মরতে!

—কে?

—ওই যে মুকুন্দকে দেখলেন, তার ভাগ্নে সতু।

—কী করেছিল সতু?

পশুপতি ফ্যাচ করে হেসে বললেন, ওই নিয়েই তো উপন্যাস লিখছি। আপনাকে খানিকটা শোনাব। কেমন হয়েছে বলবেন। আসলে 'সেই'-এর [illegible]

[illegible] কথা [illegible]! [illegible]

রাজপ্রাসাদের কেলেঙ্কারির শেষ নেই। এখন কবরে ঢুকে বসে আছে মশাই, তবু স্বভাব।

পশুপতিবাবুর হেঁয়ালিতে বিরক্ত হয়ে বললুম, খুলে বলুন না মশাই!

পশুপতি হাসলেন।—বুঝলেন না? মুকুন্দর ভায়ে এই সতু আপনার রাজকন্যা টেঁপির সঙ্গে প্রেম করছিল। একদিন দুপুরবেলা বৃষ্টির সময় এই প্রাসাদে ছুটিতে এসে জুটেছে। তারপর পড়বি তো পড়, একেবারে অহিভূষণের চোখে। আর ব্যস—বাকিটা বুঝেই নিন!

বুঝলুম। সেই মুকুন্দের কথাগুলো মনে পড়ল। ছেলেটাকে দেখতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু পশুপতি ফের ইতিহাসে গিয়ে ঢুকলেন।—এই দেখুন আরেকটা গোলার দাগ।…

দুপুরে খাওয়ার পর সেচ দফতরের বাংলোয় একটু জিরিয়ে নিচ্ছি। উত্তরে জানলাটা খোলা আছে। উপুড় হয়ে খালের ওপারে রাজবাড়ির এলাকাটা দেখতে দেখতে চোখে পড়ল, অপরূপা আঁচলের আড়ালে কিছু লুকিয়ে নিয়ে চুপি চুপি ঝোপ-জঙ্গল ভেঙে গুড়ি মেরে এগোচ্ছে।

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলুম। একটু পরে সে দীঘির পাড়ে ফাঁকা জায়গায় গিয়ে একটু দাঁড়াল। তারপর সাঁৎ করে বনবেড়ালির মত রাণী কৃষ্ণভামিনীর প্রাসাদে গিয়ে ঢুকে পড়ল।

বুঝতে পারলুম অপরূপা অভিসারে গেল। চাপা উত্তেজনা জেগেছিল আমার মধ্যে। এবং একটু অস্বস্তিকর আতঙ্কও। কতক্ষণ তীব্রদৃষ্টে এদিকে ওদিকে লোক খুঁজলুম—কেউ ব্যাপারটা আমার মতো লক্ষ্য করছে না তো?

প্রায় মিনিট কুড়ি পরে অপরূপা তেমনি দ্রুত বেরিয়ে এল। তারপর ঝোপের মধ্যে হারিয়ে গেল। বেশ কিছুক্ষণ পরে তাকে ফের দেখতে পেলুম এই বাংলোর নিচের খালের পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারপর সে দিব্যি তরতর করে খালে নামল। এতক্ষণে দেখলুম, সে একটা এঁটো এনামেলের টিফিন কৌটা ধুচ্ছে। প্রেমিকের জন্যে খাবার নিয়ে গিয়েছিল তাহলে!

একবার ভাবলুম, বেরিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে কথা বলি। পরে মনে হল, এতে তাকে অকারণ ভয় পাইয়ে দেওয়া ছাড়া আর কিছু হবে না। কী দরকার?

অপরূপা টিফিন-কৌটোটা কাপড়ের ভেতর লুকিয়ে নিয়ে [illegible]

মতোই পাড়ে উঠল এবং চঞ্চলভাবে ঝোপজঙ্গলের ভেতর হাঁটতে থাকল। একটু পরে তাকে আর দেখতে পেলুম না।

তিনটে নাগাদ পশুপতি এলেন ব্যস্তভাবে। বললেন, আজ আপনার যাওয়া হচ্ছে না। না, কোনও ওজর-আপত্তি চলবে না। সন্ধ্যেবেলা শিশু সঙ্ঘ থিয়েটার করবে। ওরা এক্ষুনি আসবে আপনাকে রিকোয়েস্ট করতে। কিন্তু ভেরি সরি স্যার, আমি ওদের অগ্রদূত হয়ে কথাটা জানিয়ে গেলুম। আমাকে হঠাৎ একবার শহরে যেতে হচ্ছে। মামার একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। সামান্যই। সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু না গিয়ে উপায় নেই। আমি সন্ধ্যে সাতটার বাসেই ফিরব।

পশুপতি চলে যাবার পর একদল ছেলেমেয়ে এল। তাদের নেমন্তন্ন নিলুম। কিছুক্ষণ গল্পসল্প করে তারা চলে গেল। চৌকিদার চা আনল। বিকেল গড়িয়ে যাচ্ছে। লনে বসে চা খাচ্ছি, হঠাৎ রাণী কৃষ্ণভামিনীর বাড়ির দিকে চোখ পড়ল।

বনভূমির শীর্ষে এখন হালকা রোদ, নিচে ঘন ধূসরতা। তার মধ্যে অপরূপাকে, চলতে দেখলুম। সেই দীঘির পোড়ো ঘাটে যক্ষীমূর্তির পাশে সে কয়েক মিনিট চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর পাড় ঘুরে হনহন করে এগোল। ধ্বংসস্তূপের মধ্যে সে অদৃশ্য হলে আমার একটু মজা করার ইচ্ছা হল। কাঠের সাঁকো পেরিয়ে সরু রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে দীঘির ঘাটে গেলুম।

সবে যক্ষীমূর্তির কাছে পৌঁছেছি, আচমকা পাথরের ভাঙা প্রাসাদ থেকে অপরূপাকে ছিটকে বেরিয়ে আসতে দেখলুম। সে আছাড় খেয়ে পড়ল একবার। তারপর হন্তদন্ত হয়ে উঠল। তার মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলুম। সেই সুন্দর মুখে এখন বীভৎস একটা বিকৃতির ছাপ। ঠোঁট কাঁপছে। গলার ভেতর চাপা কি একটা শব্দ উঠছে—অব্যক্ত গোঙানির মতো।

আমি প্রায় চেঁচিয়ে উঠলুম, অপরূপা! অপরূপা! কী হয়েছে?

অপরূপা চমকে উঠল। তারপর তাড়া-খাওয়া প্রাণীর মতো দৌড়ে পালাতে চেষ্টা করল এবং একটা কেয়াঝোপে ধাক্কা খেল। কাঁটায় কাপড় জড়িয়ে গেল। টানাটানিতে তার শরীর অনাবৃত হয়ে যাচ্ছে, একটা প্রচণ্ড ছটফটানি যেন রূপ নিয়েছে। দৌড়ে গিয়ে তাকে ঝোপ থেকে মুক্ত করে বললুম, কী হয়েছে অপরূপা?

সে আমাকে ধাক্কা দিয়ে ছিটকে সরে গেল এবং দিশেহারার মত ঝোপজঙ্গল ভেঙে চলতে শুরু করল। হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম।

নিশ্চয় কিছু আতঙ্কের ব্যাপার ঘটেছে। কিন্তু কী তা [illegible]

পারলুম না। একবার ভাবলুম, বাড়িটার ভেতরে ঢুকে দেখে আসি, আবার ভাবলুম…

হ্যাঁ, সেই সন্ধ্যার পরিবেশে এই নির্জন জঙ্গুলে জায়গা আর ওই পোড়ো 'ক্ষুধিত পাষাণ' আমাকে হঠাৎ ভীষণ ভয় পাইয়ে দিল। ভূত আমি কখনও দেখিনি। বিশ্বাসও করি নে। অথচ মনে হল, অপরূপা নিশ্চয় ভূতের ভয় পেয়েছে। আর সেই ভয়টা আমার অবচেতনা থেকে উঠে এসে মগজে ঢুকল।

রাণী কৃষ্ণভামিনীর ক্ষতবিক্ষত প্রাসাদ অসংখ্য কালো চোখ দিয়ে আমাকে যেন দেখছে। দরজা-জানলার ফোকরগুলো বিভীষিকার মুখব্যাদান যেন। ওর ভেতর ঢোকার সাহস হল না। এক মুহূর্ত দেরি না করে পালিয়ে এলুম খালের দিকে। এসময় আমাকে কেউ দেখলে ভাবত, লোকটা নিশ্চয় পাগল হয়ে গেছে।

রাতে শিশু সঙ্ঘের অনুষ্ঠানে গিয়ে পশুপতির সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তাঁকে জনান্তিকে ব্যাপারটা বলেছিলুম। উনি হাসতে হাসতে বলেছিলেন, ওই বাড়িটার বদনাম যথেষ্ট আছে। সতু ছেলেটা গোঁয়ারগোবিন্দ বলেই ওখানে লুকিয়ে আছে। মনে হচ্ছে, টেঁপি গিয়ে ওকে দেখতে পায়নি বলেই অমন ভয় পেয়ে পালিয়েছে। অমন ভয় আরও অনেকে পায়। সন্ধ্যাবেলা একাদোকা তাই কেউ ও বাড়ির আনাচেকানাচে পা বাড়ায় না। না ঢুকে ভালই করেছেন।

সকাল দশটায় আমার বাস। ফেরার তাড়ায় খুব সকাল সকাল উঠেছিলুম। লনে দাঁড়িয়ে দেখলুম, রাজবাড়ি এলাকায় সামান্য দূরে একদল লোক কী যেন করছে। চৌকিদারকে জিজ্ঞেস করলে সে বলল, পুরনো ইঁদারা বুজিয়ে দিচ্ছে স্যার। অনেক ইঁদারা আছে দেখবেন রাজবাড়িতে। মাঝে মাঝে গরুছাগল পড়ে যায়। কাচ্চাবাচ্চারাও খেলতে গিয়ে পড়ে যায়। ম্যানেজারবাবু তাই ইঁদারাগুলো একটার পর একটা বুজিয়ে দিচ্ছেন।

কিছুক্ষণ পরে লোকগুলো চলে গেল। আনমনে খাল পেরিয়ে রাজবাড়িতে গেলুম। বিদায় জানাবার ইচ্ছেয় ইতিহাসের এই গোরস্থানের শিয়রে যেন দাঁড়িয়ে রইলুম। আমার চারপাশে প্রকৃতিকে বড় বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল। সেই বুজিয়ে দেওয়া ইঁদারাটা দেখতে পেলুম। ওপরে ঘাসের চাপড়া দিয়ে চমৎকার কাজ করে গেছে ওরা। প্রকৃতি যা দেরিতে করেন, মানুষ তা দ্রুত করে ফেলে। ইতিহাস এভাবেই প্রকৃতির করতলে ঢাকা পড়ে যায়। চাপা পড়ে থাকে সব পাপ-পুণ্য, প্রেম ও বিবাদ, সুখ ও দুঃখ।…

একটু পরে দেখি, অপরূপা হনহন করে আসছে। সে ইঁদারাটার কাছে এসে দাঁড়াল। পা বাড়িয়ে ঘাসের চাপড়াগুলো এখানে ওখানে ছুঁয়ে পরখ করল। তারপর বসে পড়ল উবু হয়ে। দুটো হাত বাড়িয়ে ঘাসে রাখল। অবাক হয়ে দেখলুম, অন্ধ মেয়েটার ঠোঁট কাপছে। নিঃশব্দে কাঁদছে। কেন কাঁদছে? সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে হেঁয়ালি মনে হচ্ছিল। জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছি, পশুপতির ডাক শুনলুম, চলে আসুন স্যার। বাসের সময় হয়ে এল।

পশুপতিবাবুর গলা পাওয়া মাত্র অপরূপা দ্রুত উঠে হনহন করে চলে গেল।

বাংলোর দিকে হাঁটতে হাঁটতে এতক্ষণে আমার গায়ে কাঁটা দিল। রক্ত হিম হয়ে গেল। উরু দুটো ভারি বোধ হল। কী সর্বনাশ! তাহলে কি আমি আসলে একটা গোপন হত্যাকাণ্ডের ঘটনাই দেখলুম রাজবাড়িতে? পশুপতিকে বললে হেসে উড়িয়ে দেবেন বলে চেপে গেলুম। কাল সন্ধ্যায় অপরূপা কী দেখে ভয় পেয়েছিল, বুঝতে পেরেছি।

বানকুড়ো

যৌগাঁয়ের শেতলের মেয়ে আলোপুরী ভোরবেলা বান কুড়োতে বেরিয়েছিল।

সারাবছর পক্ষীর মতো মাঠ কুড়িয়ে শস্যদানা খুঁটে খেয়ে তার মতো মেয়েদেব বেঁচে থাকা। তারা মাঠকুড়ুনী। বানবন্যার সময় তারা বান কুড়োতে যায়। হাঁস-মুরগী ইস্তেক একটা ছাগলও বরাতে থাকলে মিলে যায়। নয়তো কাঠ বাঁশ খড, দু-একটা এনামেলেব হাঁড়িকুড়ি তৈজসপত্তর, ভেসেযাওয়া গেরস্থালির বিবিধ জিনিস। চাই কি কদাচিৎ বাকসোপেঁটরা—যার ভেতর কাপড-চোপড় গয়নাগাঁটি টাকাকড়িও থাকে।

সে কপাল করে আলোপুরী আসেনি। কারণ, সত্যি-সত্যি তার কপালটাই পোড়া। ছোটবেলায় জ্বলন্ত উনুনে পড়ে ওই অবস্থা। তখন হয়তো ভাল নাম একটা ছিল। আলুপোড়া হয়েছিল বলে পাডার লোকে আলুপুড়ী নাম চালু করে দেয়। সেই মেয়ে 'বেরং ওদরের' গঞ্জনায় দু-দুটো পুরুষ ত্যাগ করে এবং তৃতীয়টির মাথা খেয়ে এখন রাঁড়। ক্ষেতমজুর বাপের বাড়িতে মাঠকুড়ুনী হয়ে কাটাচ্ছে। তাদের সমাজে সাঙা বা আবার বিয়ের প্রচলন থাকলেও সে হয়তো নিজের বেরং ওদরের কথা সমঝেই আর ওদিকে পা বাড়ায়নি।

কপালের ওই পোড়াটুকু পাতি করে চুল বাঁধলে লুকোনো যায় এবং তার নিটোল আঁটোসাটো গড়ন, কিছু কিঞ্চিৎ লাবণ্য এখনও বিস্তর মাঠচরা পুরুষের পক্ষে লোভনীয়। মৌগাঁয়ের ভোটারলিস্ট রিচেকিংয়ে পঞ্চায়েত অফিসার অবাক হয়ে বলেছিলেন, আলোপুরী বলছ? লেখা আছে তো আলুপুড়ী! শেতলের মেয়ে প্রচণ্ড আপত্তি জানিয়ে বলেছিল, ভুল লেকেছে মুখপোড়ারা। লেকুন আলোপুরী। গাঁওয়ালারা হেসে খুন। আসলে হয়েছিল কী, ফ্যামিলি প্ল্যানিংয়ের ছোকরা ডাক্তারের পছন্দ হয়নি নামটা। তেনারই কীর্তি! তবে এই গুহ্য কথাটি পাড়ার জনাকতক বাদে আর কেউই জানে না। নিজের বৃহৎ উদর সম্পর্কে শঙ্কা-ঘেন্না-লজ্জা যে মেয়ের এবং যে কিনা পুরুষের পাশে আর এজীবনে শোবে না বলেই পণ করেছে, জঠরের 'ছেলেধরা নামক প্রকোষ্ঠের দরজা সিল করানোতে তার আপত্তি কিসের? দালালবাবুদেরও দুপয়সা হল, তারও হল। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে শাড়ি-ব্লাউজ কিনল, শখতো মরেনি রাঁড়মেয়ের। বাকি টাকায় ছাগল, এক দঙ্গল হাঁস-মুরগী। শেতলের ভাঙা হাট কলকলিয়ে উঠেছিল। শীতল তখন মেয়ের পাধোয়া জল খেতেও রাজি।

বছর যেতে যেতে আবার যে-কে সেই অবস্থা হল। আলোপুরী জানে, এই বেয়ৎ ওদরের হাত থেকে তার বাঁচোয়া নেই। পিথিমীসুদ্ধু গিলে না খেলে খিদে মিটবে না। এখন বুড়ো বাপের সঙ্গে বনিবনা নেই। উঠোনের কোনায় পাটকাঠির ঘর করেছে। দীঘির পাড় থেকে কোঙাপাতা এনে চাল বানিয়েছে। কাঁকড়া গুগলি চিংড়ী শাকপাতা পা ছড়িয়ে বসে কচরমচর করে 'ভুজোন' করে। তারপর ঢেকুর তুলে আঁচল বিছিয়ে শোয়।

শেষ রাতে একটা স্বপ্ন হয়েছিল।

এই মৌগাঁ হল ভাঙাদেশ। তার দক্ষিণ তল্লাটি পুরোটাই নাবাল। লোকে বলে ডুবোদেশ। সেখানে বান-বন্যা হলে সব ভাসানো জল এসে মৌগাঁয়ের পা ধুয়ে কলকলায়। পাটক্ষেতের বুক ডুবিয়ে ফেনার পুঞ্জ দোলে ছলছলাৎ। হিড়িক পড়ে যায় ভাঙাদেশে। কারুর সর্বনাশ, কারুর পৌষ মাস। বান কুড়োনোর চাপা ব্যস্ততা চলে রাতবিরেতে। গুপুর-গাপুর ফিসফিস চক্রান্ত। ফেলে আসা গেরস্থালি লুঠতে তালডোঙা ভাসিয়ে বেরিয়ে পড়ে অনেকে। তাদের সবাই যে চোর-ডাকাত তাও নয়। এ এক চিরকালের রেওয়াজ এদেশে।

আর সেই হিড়িকে গরীব-গুরবো কাঠকুড়ুনীরাও চনমন হয়ে ওঠে। কিন্তু তাদের এত বড় বাড় বাড়ার সাহস নেই, জোরও নেই। অগত্যা চুপিচুপি কিংবা ধান দেখার ছলে খালপারী মাঠের ঘুরে, পাটক্ষেতের আনাচে-কানাচে ঘুর

বেড়ায়। হাস-মুরগি, ইস্তেক একটা ছাগল ভাঙা চালের ওপর, নয়তো কাঠখড় বাঁশ, এনামেলের হাঁড়ি, যা পায়। আবার রাতে থাকলে বাকসো-পেঁটরাও।…

আলোপুরীর শেষরাতে একটা সিন্দুকের স্বপ্ন হয়েছিল।

ভাঙাদেশেও সেই বাপপিতেমোর আমল-থেকে শোনা সিন্দুক, যার ভেতর থাকে নাকি সাত রাজার ধন। বানের জলে ভেসে আসে। যে পায়, সে রাজা হয়ে যায়। আলোপুরী আঁকুপাঁকু সাঁতার কাটছে। দম আটকে যাচ্ছে। এই ছোঁয় ওই ছোঁয়, কিংবদন্তীর সিন্দুক ভেসে যায়। তারপর আলোপুরী এ কী দেখল, সিন্দুক নয়—এ যে মড়া। পুরুষ মানুষের মড়া ভাসছে। চন্দনের গন্ধ ছড়াচ্ছে। আর সেই মড়াপুরুষ হাসছে, বেরৎ মাছের মতো তরতরিয়ে চলেছে। আলোপুরী ডুকরে কাঁদে। কোন দুঃখে কাঁদে কে জানে।

কাঁদতে কাঁদতে ঘুম ভেঙে আলোপুরী কয়েক দণ্ড নিঃসাড়। তখনও নাকে চন্দনের গন্ধ ভুর-ভুর করে এসে লাগে।

মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল তার। বাইরে টিপটিপানি চলেছে সেই সন্ধে থেকে। আকাশ মেঘে ঢাকা। সেই সন্ধেয় খবর শুনে এসেছিল, ডুবোদেশে বানবন্যার ডুগডুগি বাজিয়ে বাবুরা নুটিশ জারি করেছেন। এতক্ষণ সেখানে পিথিমী জলতল। অতএব হুড়মুড় করে বেরিয়ে পড়েছিল আলোপুরী। সঙ্গে নিয়েছিল ডগায় আঁকসবাঁধা কঞ্চি, আর একটা হেঁসো। বান কুড়োতে গেলে ও-দুটো নিতেই হয় সঙ্গে।

ধাপবন্দী মাঠে টিপ-টিপ বিষ্টি আর হাওয়ায় শিকারী ভুড়শেয়ালীর মতো দেখাচ্ছিল তাকে। তার মনে তখনও চন্দনের গন্ধটা ভুরভুর করছে।…

পাটক্ষেত্রে কোমর জল। হাওয়ার চোটে পাটগুলো জড়াজড়ি হয়ে গেছে। এখানে-ওখানে বনচড়ুইয়ের ঝাঁক-ঝুপসি হয়ে বসে আছে। মানুষ দেখেও ফর-ফরায় না। কতরকম পোকামাকড় মনমরা হয়ে ঝিমোচ্ছে। সাবধানে চারপাশ দেখে নিয়ে আলোপুরী হেঁসোর কোপ চালায়। পাট কেটে-কেটে পথ সাফ করে। মালিক দেখলেই তাকে ডুবিয়ে মারবে। কিন্তু এই দুর্যোগে এত ভোরবেলায় এদিকটায় মানুষজন আসেনি। বানকুড়ুনীরা সম্ভবত রেলব্রিজের ওদিকে গেছে ভেসে যাওয়া কাঠগোলার মতো মতো কাঠ মিলতে পারে। আলোপুরীর জাত বলে এদিকটাই পছন্দ। গত বানে সে এইসব পাটক্ষেতে ঢুকে

তিনটে হাঁস পেয়েছিল। একটুকরো আস্ত খড়বাঁশের চাল পেয়েছিল। সে চঞ্চল চোখে খোঁজে। পাটক্ষেতের ভেতর এখন আবছা আঁধার ভয়টা শুধু সাপের। তবে চোখে পড়লে সে কোপ ঝাড়তে দেরি করবে না। মৌগাঁয়ের মাঠে সে অনেক সাপ কেটেছে এই ছোট্ট ধারাল হেঁসোয়। একবার একটা নম্পটে পুরুষকেও কুপিয়ে ছিল। আলোপুরীর মনে বড় গিদের, সে রাঁড় বটে—খানকি নয়। এবার পাটক্ষেত ফুরোচ্ছে জলও বাড়ছে। বড় বড় ফেনার চাপ নিয়ে জল দুলছে। বুকের জল চিবুক নেড়ে মস্করা করছে। গালে দিচ্ছে ঠোনা। তারপর আর এগোনা যায় না। সামনে অপার উত্তরঙ্গ জল, যেন সমুন্দর। কলকলানিতে কান পাতা দায়। হাওয়ার ঝাপটানি আর বিষ্টির খোঁচায় আলোপুরীর চোখ খুলতে কষ্ট।

তারপর ডাইনে তাকাতেই তার বুকের মধ্যিখানে একচিক্কুর ঝিলিক খেলে যায়। নুয়েপড়া পাটের ঝাঁকে কী একটা কালোপনা আটকে আছে। একটু-একটু ঘুরছে দুলছে। ওটা কি সিন্দুক, স্বপ্নের সিন্দুক? আলোপুরীরে তোর কপাল কি খুলল তবে ছারকপালীরে? তার মনে এই রকম কথার বুজকুড়ি ওঠে। আর সে কাঁপন্ত হাতে কঞ্চির আঁকসি বাড়ায়। হেই গো! এ যে দেখি সেরেৎ মাটির গামলা। ওপরে একখানা কুলো চাপানো। সে আশায় লোভে চনমন করে এবং টানে। পাটগাছেরা বাধা দেয়। আলোপুরী মরীয়া হয়ে টানে। ওদিকে জলটা ডুব-সাঁতার।

হাওয়া শনশনাচ্ছে। বিষ্টি টিপটিপোচ্ছে। কলকলাচ্ছে বান-বন্যার জল। চাপ-চাপ ফেনার গোটা এসে নরম আদর দিচ্ছে। আলোপুরী নিঃসাড়। কত জন্ম কত বছর সে এই মেহনত করছে, বুঝতে পারে না। হেই রে বিধাতা. আলোপুরী কি বুড়ি হয়ে যাবে এই করতে করতে? এখানেই কি সে মড়া হয়ে ঢেউয়ে ভেসে আঘাটা-কুঘাটায় বুকে শকুন নিয়ে বেড়াবে? চোয়াল আঁটো করে আলোপুরী টানে। হেঁসোর কোপে পাট কেটে তছনছ করে। আর এতক্ষণে মেঘের খানিকটা গলানো সোনার ছোপ নিয়ে মৃদু জলজল করতে থাকে এবং জলে তার প্রতিফলন। আড়ালে সূর্য ওঠে।

তারপর গামলাটা হাতের নাগালে পায় আলোপুরী। কাঁপন্ত হাতে সরিয়েই সে থ।

গয়না না, গাঁটি না, টাকা নয় পয়সা নয়। কাপড় না চোপড় না। 'চাল ডাল খাদ্যও নয়। কোন আবাগীর বেটি তার কোলের পুঁতকে ভাসিয়ে দিয়েছে

ন্যাকড়ায় জড়িয়ে। বাছা আমার ঢুলুনি খেয়ে সুখে ঘুমোচ্ছে। ঠোঁট দুখানি মাই চুষছে চুকচুক করে। আলোপুরী কোনদিন মা ছিল না, তার 'ছেলেঘরা' বাবুরা সিল করে দিয়েছেন, তবু সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে।...

বানকুড়োতে গিয়ে কে কী পেয়েছে, চাপাচুপো রাখলেও থাকে না। চাউর হয়ে যায়। মৌগাঁয়ের কুনাইপাড়ার মাঠকুড়ানীরা বরাবর যা পায়, পেয়েছে। মেঘার তিন মেয়ে অরি গোরি ভবি এবারও বাঁশ কাঠ খড়ের পাঁজা তুলেছে উঠোনে। অশ্বিনীর বউ নির্মলাও একটা গামলা পেয়েছে বটে তবে ছিল ধাড়ী মুরগি আর একদঙ্গল ক্ষুদে ছানা। হাটুর বোন মেনকা এনেছে একটা হাঁস। দলে গোটা পাঁচেক ছিল। একটা ধরতে পেরেছে বাকিগুলো ধরতে গিয়ে হাটু হদ্দ হয়েছে। শেষে ফিরে বলল, শালা কাপাসীর মেয়েগুলোর জ্বালায় আর পারা যায় না। তিনকোশ ভেঙে মৌগাঁয়ের মাঠে এসেছে বানকুড়োতে। শোনা গেল, হারু তিওর একটা আস্ত বলদ পেয়েছে। তবে চেপে দেওয়া কঠিনই হবে। শিগগির ডুবোদেশের লোকেরা তল্লাসে বেরুবে। তখন কাঠ বাঁশ খড় বা হাঁড়িকুড়ি বলো, হাঁস-মুরগি বলো কে কার সেটা তো গায়ে নাম লেখা থাকে না। কিন্তু বলদ অন্য জিনিস। এই বলদের গায়ে নাকি তিনটে পোড়ের দাগ আছে। দেগেছিল নিশ্চয় অলিপুরের গো-বদ্যি মৈদুদ্দি। সে সাক্ষী হবে। এইসব ফিসফিস চুপকথার ফাঁকে শেতলের মেয়ে আলোপুরীর গামলাটা নিয়ে দিনকতক কথাবার্তা হল। শেতল বার বার বলে, ইলিপের বাবুদিগে দিয়ে আয় বাছা! অন্যেরাও বলে। আলোপুরীর নিজে বেরং ওদরের কথা ভেবে দোনামনা করে। কিন্তু তার কী একটা ঘটে গেছে যেন! হেই গো, যার ছেলেঘরা বন্ধ, এবং এ জীবনে যাকে কেউ মা বলে ডাকবে না, তার ই কী যন্ত্রণা দেখ দিকি! ওই দেখ মাচানে লতাপাতা, ও দেখ আমড়া গাছটি, সবাই ফলটা আরটা দিয়ে মরে হেজে যাবে। আলোপুরী কী হবে বলে সেই ভেবে বুকের কোণায় চিনচিন করে বেথা বাজে। আর ওটা চ্যাঁ করে কাঁদলেই আলোপুরী চনমনিয়ে সুর ধরে বলে, ও আমার বানকুড়ো রে! ও আমার স্বপন দেখা সেন্দুকের ধোন রে!

আরও দিনকতক পরে খুরিতে করে ছাগলের দুধ খাওয়াচ্ছে দু ঠ্যাং ছড়িয়ে এবং হাঁটুর কাছে সেই ছোট্ট বালিশ (গামলাতেই ছিল), পেটে কাতুকুতু দিয়ে

হাসাচ্ছেও, হেন সময়ে শেতল এক কুটুম নিয়ে বাড়ি ঢোকে। অই গো আলো, এই ছ্যাখ তোর বানকুড়োর বাপ।

আলোপুরী অচেনা পুরুষ দেখে কপালের পোড়াটা চুলে ঢাকছিল। হঠাৎ বজ্রপাত। চেরা গলায় চেঁচিয়ে বলে, কে?

লোকটা আধবুড়ো। পোড়-খাওয়া চেহারা। দেখেই বোঝা যায়, খুব নাকানি-চোবানি খেয়েছিল। গামছার খুঁটে চোখ মুছে বানকুড়োকে দেখে বলে, হ্যাঁ। এই বটে। সেই গামলাটা কই?

শেতল গামলা বের করে আনে। আলোপুরী কটমটিয়ে তাকায় লোকটার দিকে। সে গামলা দেখে হেসে-কেঁদে বলতে থাকে, ত্যাখন অনেকটা রাত। সবাছ বললে আর কী। বেরিয়ে পড়ি। উঠোনে জল ঢুকেছে। কিন্তু নোবটা কী? মাথায় হুলুস্থুলুস মা-মরা খোকাটাকে হাসপাতাল থেকে এনে অব্দি সমিস্তে ছেল। ত্যাখন আরও সমিস্তে। তো হঠাৎ এই গামলাটা চোখে পড়ল। বিষ্টি বাঁচাতে কুলোখানাও চাপালাম। তারপর ঠেলতে ঠেলতে ভাঙাদেশের দিকে রওনা দিলাম। পথে তোড়ের মুখে ছাড়াছাড়ি। রাতটাও বেবম আঁধার।

শেতল বলে, বসো। বসো। গুড়জল খেয়ে গোস্থ হও বাছা! তারপর শুনব।

লোকটা আলোপুরীর পাশে বসে ছেলের দিকে তাকায়। আলোপুরী অসচেতন হাতে ঘোমটা টানে, কিন্তু সে রাঁড় মেয়ে। লোকটা হলুদ দাঁত বের করে বলে, মায়ের মন বলেই বাঁচিয়েছে। পুরুষ মানুষ হলে লাথি মেরে ডুবিয়ে দিত। কী দিয়ে এ নোন শুধি, এমন ক্ষ্যামতা নেই। কত জায়গায় ঢুঁড়ে-ঢুঁড়ে শেষে……

শেতল কথা কেড়ে বলে, বাবার নামধাম বেত্তান্ত?

নাম? শুনলে হাসবে লোক। সে দুঃখেও হা-হা করে হাসে। মা বাবুবাড়ি ধান ভেনে ঝিগিরি করে মানুষ করেছিল। পাত কুড়িয়ে খেতাম বলে নাম দিলে পাতকুড়ো।

ভাল, ভাল। বানকুড়োর বাবা পাতকুড়ো। শেতল খুশি হয়ে বলে। তা তোমরা কাদের বাছা।

পাতকুড়ো বলে, তা মনে হচ্ছে তোমাদের বটি।

শেতল আরও খুশি হয়ে বিড়ি বের করে বলে, তাইলে আর কথা কী? তাহলে তো কথাই নেই।

আর ফের অসচেতন বিহ্বলতায় আলোপুরীর মাথায় ঘোমটাটা আরও একটু বেড়ে যায়। সে হেঁট হয়। বানকুড়োটার চোখে কাজল। এতক্ষণ প্যাটপ্যাট করে আকাশ দেখতে দেখতে হাসে। হেই গো, কী স্বপ্ন দেখছিল আলোপুরী—সেই স্বপ্নের চন্দনের গন্ধ এখন মনের ভেতর ভুরভুর।